উৎসারিত আলো

সমরেশ মজুমদার

উৎসারিত আলো

সমরেশ মজুমদার

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪
তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৪

© সমরেশ মজুমদার

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-389-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

UTSARITO ALO
[Novel]
by
Samaresh Majumder

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২০০.০০

উৎসারিত আলো

এই লেখকের অন্যান্য বই

অগ্নিরথ
অনেকেই একা
অসুখলতার ফুল
আট কুঠুরি নয় দরজা
আত্মপক্ষ
আত্মীয়স্বজন
আবাস
আমাকে চাই
আশ্চর্য কথা হয়ে গেছে
উজান গঙ্গা
এত রক্ত কেন
ওরা এবং ওদের মায়েরা
কষ্ট কষ্ট সুখ
কালবেলা
কালপুরুষ
কুলকুণ্ডলিনী
কেউ কেউ একা
ছায়াবৃতা
ছায়ার শরীর
জনযাজক
জন্মদাগ
জলের নীচে প্রথম প্রেম
জ্যোৎস্নায় বর্ষার মেঘ
ঠিকানা ভারতবর্ষ
দশটি উপন্যাস
দায়বন্ধন
দিন যায় রাত যায়
দৌড়
বড় পাপ হে
বিনিসুতোয়
বুনো হাঁস
মনের মতো মন
মানুষের মা
মেঘ ছিল, বৃষ্টিও
মুদ্রাভঙ্গ
মৌষলকাল
রক্তধারায় টান
শরণাগত
শ্রদ্ধাঞ্জলি
সাতকাহন (অখণ্ড)
সুধারাণী ও নবীন সন্ন্যাসী
হরিণবাড়ি
হিরে বসানো
সোনার ফুল

শেষবার আকাশ থেকে জল নেমেছিল সেই ফাল্গুন মাসে যখন গাছে গাছে লাল ফুল ফুটছিল। তারপর একসময় বাতাসে গরম মিশল। একটু একটু করে মাটি ফাটতে লাগল। বড় কিছু গাছ, যাদের জান খুব কঠিন, তাদের ছাড়া সব পাতার, ঘাসের রং বদলে গেল। প্রথমে পোড়া পোড়া তারপর ঝরে গেল। গরমে সারা পৃথিবী এখন ল্যাংটো। যে ক'টা কুয়ো বিশ মাইলের মধ্যে আছে তার জল নেমে গেছে কাদায়। বালতি ঘষটে ঘষটে ওপরে তুললে ঘোলা জল যতটা না দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি কাদা। তাই ছেঁকে ছেঁকে যা পাওয়া যায় তার জন্যে রোজ এখানে মারপিট হচ্ছে। ভোর হওয়ার আগে মেয়েরা কলসি মাথায় বেরিয়ে যাচ্ছে। মাইল পাঁচেক হাঁটলে যে নদী বর্ষায় ভয় দেখায় তার বুক এখন শুকনো। সোমরা গানটা ভাল বেঁধেছে। ভরাবর্ষার এক বাচ্চার মায়ের বুক, এই গরমে বিশ্ব নাতিপুতির ঠাকুমা। শুধু হাড় আর হাড়। বুক খুঁজতে খুঁজতে চোখ কানা।

তা সেই নদীতে যেটুকু জল যা কিনা পায়ের পাতাও ডোবায় না তাতে চিকচিক করে ব্যাঙাচি। সেই ব্যাঙাচি সরিয়ে কলসিতে জল ভরার আগে শেষ হয়ে যায় জল। মেয়েগুলো তখন বালি খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে যখন ভেজা বালি বের হয় তখন মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে। খবর রটে যায় নদীর নীচে জল আছে। সেই জল খুঁজে বের করার সঠিক সময় হল রাতের বেলা। তাই সন্ধে পার হলেই নদীর বুকে এখন কাঠ জ্বলে। ছোট ছোট আগুন ছড়িয়ে থাকে নদীর বুকে। অন্ধকারে দৃশ্যটি দেখে সোমরার মনে হয় আকাশের তারাগুলোর বেশ কয়েকটা

নেমে এসে নদীর বুকে জুড়ে বসেছে। মাঝরাতে জল দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ'খানেক উল্লসিত কণ্ঠ চরাচর কাঁপিয়ে দিল। বিরাট যুদ্ধের পর প্রকৃতি যেন পদানত। তিরতির করে আসা জল অপূর্ব দক্ষতায় চলে যাচ্ছে কলসির পেটে। সেই জলে কলসি যখন প্রায় ভরে উঠেছে তখন পুবের আকাশ লাল। আবার বালি চাপা দিয়ে গর্তগুলোকে সারাদিনের তাপের আড়ালে রেখে কলসি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া। তখন পায়ের তলা পুড়ছে, গায়ের চামড়া আরও কালো হচ্ছে কিন্তু মাথায় রাখা কলসিটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে দুই হাত। একবিন্দু জল যে রক্তের চেয়ে দামি। এই জলেই সারাদিনের প্রয়োজন মেটাতে হবে।

স্নান করার বিলাসিতা কেউ ভাবতে পারে না। শরীরে রোগ গজাচ্ছে। চুলকাতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। মাথায় জট পড়ছে মেয়েদের। কিন্তু এসব কিছু না। পোষা গোরু ছাগল অথবা মুরগির কী হবে? জলের অভাবে ওরা নেতিয়ে পড়েছে। পোড়া ঘাসে রস নেই। যতই খাও জিভ সিক্ত হয় না। কুয়োর তলানির কাদা ধরা হচ্ছে ওদের সামনে। তাই চাটছে ওরা। কাদায় জলের স্বাদ বোধহয় পাচ্ছে জন্তুগুলো। দু'-চারটে মরলেও বাকিদের জন্যে বরাদ্দ হচ্ছে কলসিতে বয়ে আনা পরিষ্কার জল থেকে এক ভাঁড়। সেটুকুতে তারা যেন স্বর্গসুখ পাচ্ছে। গোরুর মাংস খাওয়ার চল নেই এই গ্রামে। কারণ বর্ষা নামলে গোরু ছাড়া জমি চাষ করা যায় না। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। নিজের বিকলাঙ্গ শিশুর চেয়ে তাই একটা শক্তসোমত্থ গোরু অনেক মূল্যবান।

জমানো মকাই শেষ হয়ে গিয়েছে। গমের গুঁড়ো সেদ্ধ করে নুন দিয়ে গলায় দু'বেলা ঢালতে হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য। যেসব গাছের পাতা সেদ্ধ করে পেট ভরানো যেত তারা এখন শুকিয়ে খসে গিয়েছে। সেই ভোর থেকেই মাটি এমন গরম হয়ে যায় যে পা রাখাই মুশকিল। আবার মাটির ঘর হলেও ভরদুপুরে

সেখানে থাকলে জ্বলতে হয়। তাই মাঠে বাঁশ পুঁতে তার ওপর ছাউনি ফেলে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেলা বাড়তেই নারীপুরুষ ওই ছাউনিগুলোর নীচে জড়ো হয়। একটু-আধটু হাওয়া তো মাঝে মাঝে বয়ে যায়। হোক গরমের হল্‌কা তবু তো হাওয়া। কেউ একজন বলেছিল ঝড় উঠলে কি এই ছাউনি থাকবে? সঙ্গে সঙ্গে জবাব ছুটে এসেছিল, ঝড় উঠলে ছাউনির দরকার কী? ঝড় মানেই ঠান্ডা হাওয়া, ঝড়ের পর তো বৃষ্টি। আঃ।

রাতভোর জল খুঁজে মেয়েরা আজ ফিরে এসে জানাল তাদের কলসি ভরেনি। এভাবে চললে দু'দিন পরে নদীর নীচে জল পাওয়া যাবে না। ভোর হয়েছে মাত্র ঘণ্টা তিনেক, এর মধ্যেই মাঠ জ্বলছে, রোদ কাঁপছে তিরতির করে। ছাউনির নীচে পুরো গ্রামটা শুয়ে-বসে ছিল চুপচাপ। গরম বলে ছেলেদের বড় সুবিধে হয়েছে পোশাকের ব্যাপারে। এক কাপড়ের নেংটি পরলেই চলে যায়। সেই নেংটি কাচা হয়েছিল গেল ফাল্গুনে। এখন কাপড়ের রং কী ছিল তা বোঝা যায় না। মেয়েরা বুকের ওপর বাঁধন বেঁধে হাঁটু পর্যন্ত সায়া পরে থাকে এখন। ঘাম জমে জমে সেগুলো থেকেও গন্ধ বের হচ্ছে।

সোমরার বয়স একুশ। না খেয়ে খেয়ে শরীর জীর্ণ হয়ে যায়নি অবোধ্য কারণে। তার পেশি এখনও শক্ত। ওই বর্ষা থেকে ফাল্গুন সে চুটিয়ে খায়, যেখান থেকে যা পারে। প্রথম দিন যদি আধঘণ্টা বৃষ্টি হয় তা হলে তো কথাই নেই। যেসব ডোবা শুকিয়ে গিয়েছে, মাটি ফেটে পাথর হয়ে গেছে, সেগুলোয় জল পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে যায় নীচে। এক দিনের বৃষ্টিতে পাথর হয়ে থাকা মাটি নরম না হলেও হঠাৎ দেখা যায় কোনও কোনও জায়গা নড়ছে। পুরো শুকনোর সময়টায় মাটির নীচে চলে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকা ব্যাঙগুলোর শরীরে জল লাগলেই তারা বোধহয় ঘুম ভেঙে যাওয়ায়

আত্মহারা হয়ে ছটফটিয়ে লুকোনো জায়গা থেকে ওপরে উঠে আসে। বৃষ্টির জলে লাফিয়ে চিৎকার শুরু করে। সোমরারা বসে থাকে ওই সময়ের জন্যে। খপ খপ করে সোমরাদের হাতের মুঠো তুলে নেয় ওদের। একটু বড় সাইজের পেলে শুকনো মুখগুলোয় খুশি চলকে ওঠে। গোটা কুড়ি-বাইশকে ধরার পর হঠাৎ সব চুপচাপ। ততক্ষণে বৃষ্টিও ধরে গেছে। সোমরার মনে হয় ব্যাঙগুলো মাটির তলায় যখন বুঝতে পারে এখন ওপরে উঠলে মৃত্যু নিশ্চিত, তাই আর একটা বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করে ওরা।

কিন্তু সেই বৃষ্টি কবে আসবে? ততদিন কীভাবে বাঁচবে ওরা? দুটো বুড়ো আর একটা বুড়ি গতকাল থেকে কথা বলছে না। মাটিতে শুয়ে আছে অসাড় হয়ে। আজ সকালে মেয়েরা জল নিয়ে ফিরলে তাদের মুখে একটু দেওয়া হয়েছিল। সবাই দেখেছে, জিভ একটু নড়লেও পুরো জল পেটে গেল না। তখন থেকেই চাপা কান্না কাঁদছে ওদের নিকটজন। এক বুড়ো উপদেশ দিল এখন না কাঁদতে। যে যাবে তাকে তো আটকানো যাবে না। কিন্তু এই গরমে শরীর যখন শুকিয়ে গিয়েছে তখন কাঁদলে চোখ থেকে যে জল বেরুবে তার ফল হবে মারাত্মক। ওই জল মানে রক্ত। শরীরের রক্ত বের হয়ে গেলে মানুষ বাঁচে না। তাই এখন কেউ কেঁদো না। যখন ভগবান আকাশ থেকে জল দেবেন, মাটি যাবে ভিজে, গাছেরা পাতায় ভরে যাবে তখন যে চলে গেছে তার কথা ভেবে কেঁদো। মন হালকা হবে।

মাইল সাতেক দূরে ছোট্ট একটা বাজার যেখানে অন্যসময় মানুষজন কেনাবেচা করে। কয়েকটা দোকান, বেশির ভাগই চাল ডাল মশলার, সস্তার কাপড়ের। ফাল্গুনে সেখানে মেলাও হয়। পাশে একটা থান আছে। বাবার থান। সেখানে বছরে একবার পুজো হয়, মেলা বসে। সারাদিনে একটা বাস আসে শহর থেকে, দুপুরে এসে তখনই চলে যায়। কিন্তু গরমের সময় সেটাও আসা বন্ধ করে। সেই বাসটাকে দেখতে মানুষজন ভিড়

করে আসত প্রথমদিকে। সোমরারাও গিয়েছে। যে লোকটা বাস চালিয়ে আসত তার পরনে খাকি হাফপ্যান্ট আর শার্ট। মুখে সবসময় বিড়ি জ্বলত। আর একটা লোক নামত বাস থেকে। একই পোশাকে। তবে তার হাতে একটা ব্যাগ থাকত। ওরা দু'জন নিজেদের মধ্যেই কথা বলত। বাস ছাড়ার সময় চেঁচিয়ে বলত, লাস্ট বাস। লাস্ট বাস। দু'-একজন মানুষ উঠত অথবা উঠত না, বাসটা চলে যেত। সোমরার মনে হত সে যদি বাস চালানোর কাজটা শিখতে পারত!

আজ রোদ মরে এলে সোমরা ঠিক করল বাজারে যাবে। সেখানকার লোকজন নিশ্চয়ই ভালভাবে বেঁচে আছে। সেটা কীরকম, সেখানে গিয়ে বাঁচা যায় কিনা জেনে আসা দরকার। কথাটা শুনে দুখন ওঁরাও আর মাংরা ওঁরাও ওর সঙ্গী হতে চাইল। এতটা রাস্তা একা যাওয়ার চেয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে হাঁটা ভাল। সোমরারা রওনা হয়ে গেল।

কিছুদূর যাওয়ার পর মাংরা মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করল, 'এ্যাই, তুই আসছিস কেন?'

বাকি দু'জন দেখল এতোয়াকে। ওদের পেছন পেছন আসছিল এতক্ষণ। এখন মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সোমরা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোকে কি আমরা ডেকেছি? যা, ফিরে যা।'

এতোয়া জবাব দিল না। ওই রকম গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দুখন বলল, 'ছেড়ে দে, বেচারা হয়তো আজ সারাদিন জলই খায়নি। অ্যাই তোর খিদে পেয়েছে?'

মাথা নাড়ল এতোয়া, হ্যাঁ।

মাংরা বলল, 'কার খিদে পায়নি? এ্যাঁ?'

সোমরা বলল, 'আচ্ছা, আসুক। বাজারে যদি কিছু খেতে পায়। বাপ-মা নেই, বুধুয়াচাচা ভাল বলে ওকে রেখেছে। এত কষ্টের মধ্যেই পরের ছেলেকে একবেলা খাবার দিচ্ছে। অ্যাই,

তুই বাজার পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবি? পড়ে গেলে আমরা কিন্তু দাঁড়াব না।'

এতোয়া চুপচাপ তাকিয়ে থাকল, তার মুখ থেকে শব্দ বের হল না। পাঁচ-ছয় বছরের লিকলিকে কালো শরীরটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দুখন বলল, 'চল। ও ঠিক যেতে পারবে। ওর জান অনেক শক্ত; নইলে বাপ-মা মরে গেল বাজে পুড়ে আর ও পুড়ল না।'

মাটি ফাটা কিন্তু সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। অসাবধানে পায়ের আঙুল ফাঁকের মধ্যে পড়লে মুচড়ে যেতে পারে। তা ছাড়া সাপের ভয় আছে। সাপগুলো ওই ফাঁক হয়ে থাকা মাটিতে শুয়ে থাকে পোকামাকড়ের আশায়, যেই সূর্য পশ্চিমে ঢলে যায়। মাঝে মাঝে বুনো ঝোপ যার পাতা ঝরে গেছে, কাঁটা গাছের পাশ দিয়ে ওদের যেতে হচ্ছে। রোদ পড়ে গেছে কিন্তু ছায়া এখনও বেশ গরম। হাঁটতে হাঁটতে সোমরা পেছন ফিরে দেখছিল। ছেলেটা এখনও আসছে।

হঠাৎ দুখন বাপরে বলে চেঁচিয়ে তিন পা পিছিয়ে এল। ও-ই হাঁটছিল আগে। এতক্ষণে ওরা দেখতে পেয়েছে সাপটাকে। মাটি থেকে অন্তত চার হাত উঁচুতে ফণা তুলে গজরাচ্ছে। যেমন মোটা তেমনই কালো। মাংরা ফিসফিস করে বলল, 'কালসাপ। একবার ছোবল মারলে গোরু সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়।'

চাপা গলায় সোমরা জিজ্ঞাসা করল, 'কী করব? দৌড়াব?'

দুখন একই স্বরে বলল, 'না না। ছুটে গিয়ে ছোবল মারবে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।'

সাপটা এখন একটু দুলছে। ওর সরু জিভ বারংবার বেরিয়ে আসছে। প্রায় লেজের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছ ভারী শরীরটাকে। চট করে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে এল। এবার শব্দ বেরুচ্ছে মুখ থেকে। সোমরা বুঝতে পারছিল আর একটু এগোলেই ছোবলের নাগালে চলে যাবে ওরা।

হঠাৎ চোখে পড়ল ছেলেটাকে। এতোয়া খানিকটা দূর দিয়ে

ঘুরে চলে গেছে সাপের পেছনে। তারপর সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে— সাপটার পেছন দিকে। এদিকে চোখ থাকায় এতোয়া ওর দৃষ্টির বাইরে। তিনজনেরই দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মাথা ফিরিয়ে তাকালেই সাপটা ছোবল মারবে এতোয়াকে। ও এগিয়ে যাচ্ছে কেন? কী করতে চাইছে।

আচমকা দৌড়ে এসে সাপের লেজটাকে দুই হাতের মুঠোয় ধরে ঘোরাতে লাগল এতোয়া। অত ভারী সাপকে ঘোরালে ও নিজেও ঘুরতে বাধ্য হচ্ছিল। সাপের মুখটা বারংবার শুকনো মাটিতে আছড়ে পড়ছিল। প্রাণপণে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করতে করতে নেতিয়ে পড়ছিল সাপটা। সোমরা দেখল এতোয়ার চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। শরীরের সব শক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় টলছে এখন। শেষ পর্যন্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ছেলেটা। আর তখনই মাংরা ছুটে গিয়ে পালাতে চাওয়া সাপের লেজটা ধরে ফেলে আবার ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'আই বাপ! কী ভারী। আমি মাটিতে আছাড় মারছি তোরা পাথর মার মাথায়।'

আহত, রক্তাক্ত, সাপটাকে মেরে ফেলতে বেশি সময় লাগল না। নিশ্চিত হলে ওরা ছুটে গেল এতোয়ার কাছে। ছোট্ট বুকের খাঁচাটা উঠছে নামছে। পরনে একটা নেংটি ছাড়া কিছু নেই। সোমরা ওর শরীর কোলে নিয়ে ডাকতে লাগল। দুখন চারপাশে তাকাল। কোথাও জলের চিহ্ন নেই। তারপর উঠে গিয়ে পড়ে থাকা সাপের লেজের দিকে কোমর থেকে একটা চাকু বের করে বসিয়ে দিতেই গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। সেই রক্ত দু'হাতে নিয়ে সে চলে এল এতোয়ার কাছে। কপালে, ঘাড়ে রক্ত বুলিয়ে দিতে লাগল। মাংরা মাথার টোকা দিয়ে হাওয়া করছিল। সোমরা বলল, 'ও যদি মরে যায়! আমাদের বাঁচিয়ে ও মরে যাবে?'

মাংরা বলল, 'বাবাকে ডাক।'

এতোয়াকে মাটিতে শুইয়ে তিনজনে নতজানু হয়ে বসল।

তারপর কান বন্ধ করে চিৎকার করতে লাগল, 'বাবা হো, বাবা হো।' এই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতে মাটিতে শব্দ করতে লাগল ওরা। সাপের রক্তের শীতল স্পর্শে এতোয়ার জ্ঞান ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে লাফিয়ে উঠল ওরা। তিনজনেই এতোয়াকে কাঁধে তুলতে লাগল একের পর এক। তারপর মাটিতে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল সে এখন ভাল আছে কিনা। এতোয়া নীরবে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

এবার সাপটার কাছে গেল ওরা। এমন নধর সাপ সচরাচর দেখা যায় না। দুখন চটজলদি সাপের মাথাটাকে কেটে দূরে ছুড়ে দিল।

সোমরা জিজ্ঞাসা করল, 'এখন এটাকে নিয়ে কী করবি?'

মাংরা বলল, 'গাঁয়ে নিয়ে গেলে পনেরোজনের বেশি পেটে এটা যাবে না। ঝগড়া হবে।'

দুখন বলল, 'তা হলে? বুড়ো-বুড়ি আর বাচ্চাদের খাওয়াব।'

'কুলোবে না। তাতেও কুলোবে না।' মাংরা নিশ্চিত হয়ে মাথা নাড়ল।

'তা হলে?' সোমরার চোখ চকচক করতে লাগল।

'আগুন জ্বালার চেষ্টা করি। পুড়িয়ে নিয়ে এখানেই খেয়ে ফেলি।'

দুখন বলল, 'নুন চাই নুন। এই মাংস নুন ছাড়া খাওয়া যাবে না।'

হঠাৎ এতোয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার মুখচোখ দেখে মনে হল কিছু শুনছে। চারপাশে তাকিয়ে একটা শুকিয়ে যাওয়া গাছের ডাল থেকে ফুটখানেক ভেঙে নিল।

মাংরা জিজ্ঞাসা করল, 'কীরে?'

এতোয়া ঠোঁটে আঙুল চেপে শব্দ করতে নিষেধ করল। তারপর শুয়ে পড়ে মাটিতে কান চাপল। ওইটুকুনি ছেলের যে এত বুদ্ধি আছে তা দেখে ওরা তিনজন অবাক হয়ে গেল। উবু হয়ে এগোচ্ছে এতোয়া। হাত দশেক দূরে গিয়ে আচমকা

ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাঙা ডালটা হাতে নিয়ে। কয়েক সেকেন্ড কিছু বোঝা গেল না। তারপর ধীরে ধীরে শরীরটা এঁকেবেঁকে মাটি থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। পুরোটা প্রকাশিত হওয়ার পর লেজ দিয়ে মাটি ভাঙল প্রবল আক্রোশে। যে সাপটার শরীর ওখানে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে এটি সম্ভবত তার জোড়া। আরও স্বাস্থ্যবান এবং লম্বায় একটু বড়। দু'হাতের গাছের ডালের চাপে সাপটার মাথা নড়তে পারছে না। কিন্তু লেজটা ঘুরিয়ে ধরতে চাইছে আক্রমণকারীকে।

ওরা তিন যুবক হইহই করে ছুটে গেল এতোয়ার পাশে। দুখনের হাতের চাকু বারংবার আঘাত করতে লাগল সাপের গলায়, মাথার এপাশে। রক্ত বের হচ্ছে। প্রবল দাপটে লেজ সমানে আছড়ে যাচ্ছে সাপটা। এইসময় ফট করে শুকনো ডালটা ভেঙে যেতে সাপ মাথা তুলতে চেষ্টা করতেই দুখন তার গলা অর্ধেকটা কেটে ফেলতে পারল। মাথা বিচ্ছিন্ন করে দূরে ছুড়ে ফেলতেই ওরা একটা দৃশ্য দেখতে পেল। ওপাশের পত্রহীন গাছের ডালে কখন নিঃশব্দে এসে বসেছে তিনটে শকুন। প্রথম সাপটার মাথা আর পড়ে নেই। দ্বিতীয়টি মাটিতে পড়তেই একটি শকুন বিদ্যুৎগতিতে উড়ে এসে তুলে নিয়ে উড়ে গেল আকাশে। বাকি দু'জন গম্ভীর মুখে বসে রইল। দুটো সাপের ওজন কম নয়। এখানে ফেলে রেখে শহরে গেলে ফেরার সময় কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আর এই দুটো সাপের মাংসে বুড়ো-বুড়ি বাচ্চাদের পেটে শান্তি আসবে। কিছুক্ষণ আলোচনা করে ওরা ঠিক করল মাংরা ফিরে যাবে সাপ নিয়ে। কিন্তু ওর একার পক্ষে ওই দুটো সাপ নিয়ে বেশিদূর যাওয়া সম্ভব নয়। একটা শুকনো ডাল গাছ থেকে ভেঙে তাতে সাপদুটোকে পেঁচিয়ে দেওয়া হল। ডালের একটা দিক ধরল দুখন অন্যদিকে মাংরা। এবার আর অসুবিধে হচ্ছে না। এতোয়াকে জিজ্ঞাসা করা হল যে গাঁয়ে ফিরে যেতে চায় কিনা! এতোয়া মাথা নেড়ে না বলল। সোমরা বন্ধুদের মনে করিয়ে

দিল এতোয়ার জন্যে কিছু মাংস আলাদা করে যেন রেখে দেওয়া হয়। ও না থাকলে সাপদুটোকে ধরাই যেত না উলটে তাদের প্রাণ যেত। মাংস রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দু'জন গ্রামের দিকে হাঁটা শুরু করল সাপ নিয়ে।

বাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সোমরা লক্ষ করল এতোয়া তার খুব কাছাকাছি হাঁটছে। অর্থাৎ ছেলেটার সাহস বেড়েছে। এতদিন এই বাচ্চাটাকে সে গুরুত্ব দেয়নি। বাপ-মা মরা একটা বাচ্চা সবার দয়াদাক্ষিণ্যে বড় হচ্ছে, যারা ওকে খাবার দেয় তাদের ধান্দা আর একটু বড় হলেই বর্ষার সময় চাষের কাজে লাগাবে। বড়দের চোখের সামনে আসত না ও।

হাঁটতে হাঁটতে সোমরা জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কি আজ প্রথম সাপ ধরলি?'

মাথা নাড়ল এতোয়া, 'না। ধরেছি,' এই প্রথম কথা বলল ছেলেটা।

'ধরেছিস? বাঃ। শুনিনি তো? মাংস খেয়েছিস?'

'না।'

'তা হলে কী করেছিস সাপটাকে ধরে?'

'ছেড়ে দিয়েছি।'

দাঁড়িয়ে গেল সোমরা। ছেলেটার দিকে তাকাল। দু'বেলার খাবার যখন জুটছে না তখন সাপ ধরে কেউ কি ছেড়ে দেয়? সে বলল, 'ছেড়ে দিয়েছিস?'

'ওরা মানুষ মারার সাপ না।'

'হুঁ।' হাঁটতে লাগল সোমরা। একে দেখে বোঝাই যায় না এসব ভাবার মতো বুদ্ধি হয়েছে। আলো নিভে যাওয়ার একটু আগে দূরে বাজারের দোকানগুলো ঝাপসা চোখে পড়ল। হঠাৎ তার হাত ধরে টানল এতোয়া। হাত তুলে নিঃশব্দে থামতে বলল, ঝট করে সামনে তাকাল সোমরা। না কোনও সাপ ফণা তুলে নেই। ততক্ষণে মাটিতে কান পেতেছে ছেলেটা। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে চারপাশে তাকাল। এবারে শুধু কাঁটা ঝোপ। ওর

পক্ষে সেই ঝোপ থেকে ডাল ভাঙা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা আন্দাজ করে সোমরা অনেক চেষ্টার পর একটা লম্বা শক্ত কাঁটা ভেঙে বের করতে পারল। সেটাকে দেখে খুব খুশি হল এতোয়া। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল বাঁ দিকে। তৃতীয় ঝোপের ওপাশে পৌঁছাতেই প্রাণীটি দৌড়াতে লাগল। ওর সমস্ত শরীর ফুলিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছিল। সোমরা দেখল বেশ বড়সড় শজারু একটা গর্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গুটি গুটি।

শজারুর শরীরের কাঁটা বেশ বড় কিন্তু এতোয়ার হাতে ধরা কাঁটার চেয়ে বড় না। সে সাবধানে শজারুর পিঠে কাঁটা বসাতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। গর্ত আর বেশি দূরে নেই। এতোয়া দ্রুত ঝুরু ঝুরু বালি মাটির নীচে হাত ঢুকিয়ে স্থির হয়ে রইল। যেই শজারুটা মাটির ওপর উঠেছে অমনি সে বালির নীচ থেকে তাকে ওপরে ঠেলল। নড়বড় করতে করতে শজারুটা উলটে যেতেই এতোয়া কাঁটা বসিয়ে দিল ওর পেটে। সঙ্গে সঙ্গে শজারুটা এমন ঝটকা মারল যে তার আলোড়িত কাঁটায় রক্তাক্ত হয়ে গেল এতোয়ার হাত। আর্তনাদ করে ছিটকে গেল সে। কাঁটাগাছের কাঁটা পেটে বিঁধে থাকায় সোজা হতে পারছে না শজারু। সোমরা এগিয়ে গেল ওটাকে মারতে। অনেক চেষ্টার পর যখন শজারু মারা পড়ল তখন সে এতোয়ার দিকে তাকাল। রক্ত গড়াচ্ছে হাত থেকে। চারপাশে তাকাল সোমরা। কোথাও কোনও গাছে পাতা নেই যে ওর ক্ষতের ওপর চেপে ধরবে। সে বলল, 'মুখ দিয়ে রক্ত চোষ। শরীর থেকে বেরোতে দিস না।' বলামাত্র ক্ষতস্থান ঠোঁটে চেপে ধরল এতোয়া। নিজের রক্ত নিজেই খানিকটা গিলল সে। সোমরা বলল, 'ওতেই হবে। শুকিয়ে যাবে।'

একটু শুকনো ডালের মুখে শজারুটাকে ঝুলিয়ে হাঁটতে লাগল সোমরা। পেছনে ক্ষতে মুখ রেখে এতোয়া। ঠিক সন্ধের মুখে ওরা বাজারে ঢুকে গেল।

আজ ওখানে এসে অবাক সোমরা। দোকানগুলো বন্ধ। মানুষগুলো ভিড় করেছে বাবার থানের সামনে। বেশির ভাগই বসে আছে নির্জীব হয়ে। অর্থাৎ এখানেও খাবার নেই, জল নেই। একটা গলা শোনা গেল, 'কী নিয়ে এলি রে? শজারু?'

সোমরা দেখল বাজারের সবচেয়ে বড় দোকানদার লালমোহন তেলি এগিয়ে আসছে। লোকটার চেহারা তাদের মতো নয়। বেশ পুরুষ্ট। সে মাথা নাড়ল।

'মাটিতে নামা।'

শজারুটাকে মাটিতে ফেলল সোমরা। লালমোহন তেলি সন্তর্পণে ওর পেট টিপে দেখল। তারপর বলল, 'আয় আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

একটা বুড়ো লোককে শজারু নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে লালমোহন বলল, 'এটা তো তোর সম্পত্তি নয়। ভগবানের জীব ঘুরে বেড়াচ্ছিল তুই ওকে ধরে মেরে নিয়েছিস। কিন্তু তাই বলে তোকে আমি ফাঁকি দিতে চাই না। পাঁচ কৌটো ভাঙা গম আর আধ কৌটো নুন নিয়ে যা। পেটভরে দু'দিন খেতে পারবি।

হুকুম যখন হয়ে গিয়েছে তখন আর কিছু করার নেই। ঘরের ভাঙা গম প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। শজারুর মাংস গাঁয়ে নিয়ে গেলে সবাইকে দিয়ে খেতে হবে কিন্তু ভাঙা গমের ক্ষেত্রে সেই বাধ্যবাধকতা নেই। নিজের দোকানের পেছনে নিয়ে গিয়ে শুধু খাবারই কাপড়ে মুড়ে দিল না লালমোহন তেলি, এতোয়ার হাতের ক্ষত বেঁধে দিল কাপড়ে। বাজারের লোকজন তাদের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যে ভয় হচ্ছিল, কেড়ে না নেয়। লালমোহন তেলিকে ওরা কিছু বলতে বা করতে সাহস পায় না কিন্তু গাঁয়ের ছেলে বলে ওরা ওকে পাত্তা দেবে না। লালমোহনের দোকানের পাশেই তার বাড়ি। বাড়ির চারপাশে মাটির দেওয়াল থাকায় ভেতরটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ওরা লালমোহনের বারান্দায় বসে থাকতে থাকতেই অন্ধকার

ঘন হল। কাঠ জ্বালিয়ে আলো তৈরি করা হল। লালমোহন এবং আর একজনের বাড়িতে আলো জ্বলছে। তেলে সেই আলো জ্বলে। কাছাকাছি বসা একজন প্রৌঢ়র সঙ্গে কথা বলা শুরু করল সোমরা। এদিকেও জল শুকিয়ে গিয়েছে। লালমোহনের বাড়ির ভেতর দুটো কুয়ো আছে যা নাকি খুব গভীর। তাই সেই কুয়োতে জল পাওয়া যায়। ফসলের সময় চারভাগের একভাগ দিতে হবে এই শর্তে লালমোহন প্রতি পরিবারকে কোনও রকমে দিন চালাবার মতো জল আর এক কৌটো ভাঙা গম দেয়। ফসলের চারভাগের এক ভাগ ওকে দিয়ে দিলে সামনের বছর কী হবে কেউ জানে না। তবে এখন মরে গেলে সামনের বছর বেঁচে থাকবে না যখন তখন সবাই এখনকার কথাই ভাবছে। সোমরা কিন্তু এর মধ্যে লালমোহনের কোনও দোষ দেখতে পেল না। বিপদের সময় মানুষটা জল দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছে, বিনিময়ে তাকে কিছু দিতে হবে না!

সে এতোয়ার দিকে তাকাল। ছেলেটা বসে বসে ঢুলছে। ওকে শুইয়ে দিতেই শরীর লুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এই ছেলেকে নিয়ে গ্রামে ফিরবে কী করে সে। অন্ধকার রাতে এতটা পথ ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তার ওপর পাঁচ কৌটো গমভাঙা আর নুন সঙ্গে আছে। ভাবতে ভাবতে ঝিমুনি এসে গেল ওর। চোখের সামনে ভাঙা ফেটে যাওয়া মাঠ। এতোয়া আর সে দৌড়াচ্ছে শজারুর পেছনে। একটা শজারু মারতে পারলেই লালমোহন তেলি দেবে পাঁচ কৌটো ভাঙা গম আর আধ কৌটো নুন। কিন্তু নুন না নিয়ে সে আধ কলসি জল চাইবে। রোজ রোজ। দু'বেলা খাওয়ার সমস্যা আর থাকবে না। এইসময় প্রচণ্ড শব্দ কানে আসতেই তার ঝিমুনি কেটে গেল। এমনকী এতোয়া পর্যন্ত ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। সোমরা দেখল লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে দোকানগুলোর সামনের জায়গাটা ফাঁকা করে দিল। ততক্ষণে বেশ তীব্র আলো আকাশে ছড়িয়েছে। লালমোহন তেলি তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার

করল, 'বড় রাজা আসছে, সাহেব রাজা আসছে। কেউ মুখ খুলবে না। সবাই দূরে দূরে থাকো।'

সোমরার বিস্মিত চোখ দেখতে পেল গাড়িটাকে। সামনে রাক্ষসের চোখের মতো আলো জ্বলছে। দাঁড়ানোমাত্র আলো নিভে গেল। তিনজন মানুষ লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। ওদের একজনের পা অবধি প্যান্ট, মাথায় টুপি। বাকি দু'জনের হাফপ্যান্ট। হাফপ্যান্ট পরা লোকদুটো লম্বা প্যান্টকে নিচু গলায় কিছু বোঝাচ্ছিল। তারপর ওদের একজন চেঁচাল, 'এ লালমোহন, লালমোহন তেলি!'

লালমোহন তেলি তার বারান্দা থেকে নেমে হাতজোড় করে জবাব দিল, জি।

একজন হাফপ্যান্ট তাকে দেখিয়ে লম্বা প্যান্টকে বলল, 'দিস ইজ লালমোহন তেলি। এর কথা আপনাকে বলেছি স্যার। খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল।'

লম্বা প্যান্ট হাত বাড়াল, 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ।'

সোমরারা দেখল লালমোহন সেই হাতে হাত রাখল। তারপর নিচু গলায় কিছু বলতেই অন্যরা মাথা নেড়ে সায় দিল। লালমোহন দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল, পেছনে ওই তিন আগন্তুক। ওরা যখন বারান্দায় উঠে ঘরের ভেতর চলে গেল তখন সোমরা খুব কাছ থেকে ওদের দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল ওরা রোজ পেট-ভরতি খাবার খায় আর ওদের জলের অভাব নেই। হঠাৎ এতোয়া ফিসফিস করে বলল, 'আমার খুব ভয় লাগছে।'

সোমরা সামনের দিকে তাকাল। বাজারের সব লোক এখন শব্দওয়ালা যন্ত্রটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড কৌতূহলে দেখছে। এখানে যখন ঝরঝরে বাস আসে তখনও কৌতূহল থাকে। কিন্তু এরকম যন্ত্র ওরা আগে দ্যাখেনি। সোমরা ভাবল এখানে আর থাকার মানে হয় না। সে নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই হেঁটে যেতে পারবি তো?'

এতোয়া মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

পুঁটুলিটা নিয়ে সোমরা উঠতে যাচ্ছিল যখন, তখন ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে দুই হাত মুখের দু'পাশে এনে লালমোহন তেলি চিৎকার করল, 'ভাইসব, তোমাদের উপকার করতে এঁরা এসেছেন। তোমরা কি চাও সারা বছর পেটভরে খাবার খেতে?'

কেউ কোনও জবাব দিল না। এরকম অবাস্তব প্রশ্নের জবাব কী দেবে তাই যেন ভাবতে পারছিল না।

লালমোহন তেলি আবার চিৎকার করল, 'তোমরা কি চাও সারাবছর দু'বেলা স্নান করতে, পেট ভরে জল খেতে, সারাবছর ভেজা মাটি দেখতে?'

এবার দু'-একটি গলায় কথা শোনা গেল, 'এসব কি সত্যি?'

অন্ধকারে যেটুকু আলো জমেছিল তাতে লোক দুটোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। তবু দেখার চেষ্টা করল লালমোহন তেলি, 'এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে মিথ্যে কথা বলতে দেখেছে। হ্যাঁ কি না?'

একটু ইতস্তত করে না শব্দটি অনেকের গলায় শোনা গেল।

'এই যে অফিসাররা এসেছেন, কেন এসেছেন? আমাদের এই দেশ, যেখানেই সূর্য ওঠে সেখানকার রাজা হলেন সাহেবরা। ইংরেজ সাহেবরা। তোমরা এত কষ্ট পাচ্ছ, জল নেই, খাবার নেই, এই খবর রাজার কানে পৌঁছেছে। রাজার মন খুব বড়। তিনি তোমাদের সাহায্য করতে এঁদের এখানে পাঠিয়েছেন।'

'সেখানে জল আর খাবার অনেক?' একজন জিজ্ঞাসা করল।

'অনেক। গোটা জীবনেও যা শেষ হবে না।'

'কিন্তু আমাদের খাবার দেবে কেন?' আর একজনের প্রশ্ন।

'ঠিক। খাবার দেবে কেন? তোমাদের কাজ করতে হবে। কী কাজ? মাটি কোপাতে হবে, গাছ লাগাতে হবে, গাছ পরিষ্কার

রাখতে হবে। ব্যস। সারাদিনে কয়েক ঘণ্টার কাজ। যার বদলে খাবার পাবে, জল পাবে, ঘর পাবে।' লালমোহন বলামাত্র একজন হ্যাফপ্যান্ট পরা লোক তার কানের কাছে ফিসফিস করে কিছু বলল। লালমোহন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, আরও পাবে। রান্না করার জন্যে কাঠ, বিনা পয়সায়। তা ছাড়া নগদ চারটে পয়সা যা দিয়ে অনেক কিছু কিনতে পারবে তোমরা। উঃ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান হয়ে যাবে, মেয়েরা আরও সুন্দরী হবে। কারও কোনও কষ্ট থাকবে না।'

লালমোহন তেলির কথা শেষ হতেই চারপাশে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। সোমরা এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে যেন একটা স্বপ্নের দেশের কথা শুনছিল। সে বলে উঠল, 'এসব কি সত্যি?'

ওরা চারজন তার দিকে তাকাল। লালমোহন বলল, 'সত্যি। তুই গাঁয়ে গিয়ে সবাইকে বল। যে যে যেতে চাইবে তাদের সাতদিনের মধ্যে যেতে হবে।'

সোমরা উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'জায়গাটা কত দূরে?'

লালমোহন অতিথিদের দিকে তাকাল। আর একজন হাফপ্যান্ট বলল, 'একটা রাত তার পরের রাত কেটে সকাল। এইটুকু দূর।'

লালমোহন তেলির সঙ্গে আর এক প্রস্থ আলোচনা সেরে ওরা তিনজন গাড়িতে উঠল। দুরন্ত শব্দ করে আলো জ্বালিয়ে গাড়ি চলে গেল চোখের আড়ালে। বাজারের লোকজন চেঁচামেচি করছে। পক্ষে বিপক্ষে মত দিয়ে শোরগোল তুলছে। লালমোহন তেলি জিজ্ঞাসা করল, 'তোদের গ্রামে কত লোক আছে?'

সোমরা সংখ্যাটা জানে না। মানুষ গোনার প্রয়োজনই হয়নি কখনও। তা ছাড়া হাতের দশটা আঙুল পর্যন্ত হিসাব রাখা যায় তার পরেই তো গোলমাল।

'অনেক!'

'বুড়ো-বুড়ি কত?'

'আছে, কিন্তু কম।'

'ঠিক আছে, তুই গাঁয়ে গিয়ে বল। বলে রাজি করা। এরকম সুযোগ আর কখনও পাবি না তোরা। আমার কী। আমার বাড়িতে দু' দুটো কুয়ো আছে। জল পাতালে নেমে গেলেও আমি পাব। আমার কাছে যা খাবার আছে তাতে দু' দুটো গরমকাল দিব্যি চলে যাবে। এই যে আমি, রোজ স্নান করি, কেউ করে? তবু তোদের উপকার করতে চাই বলেই সাহেবদের আসতে বলেছিলাম।' লালমোহন তেলি উদাস গলায় বলল।

'যদি সব পাওয়া যায় তা হলে আমরা যাব।' সোমরা বলল।

'যাবি।' ওর কাঁধে হাত রাখল লালমোহন। তারপর একটু ভাবল, 'ঠিক আছে, আমি কাল ভোরবেলায় তোদের গাঁয়ে যাব। সূর্য উঠতেই ফিরতে হবে। যা গরম। তুই এক কাজ কর। আমি দুটো লোক দিচ্ছি। ওইটুকুনি ভাঙা গমে কী হবে তোদের। ওরা দু'বস্তা নিয়ে যাক। না না, দাম দিতে হবে না। তোদের ভাল হবে তাই দিচ্ছি।'

মিনিট পনেরো বাদে দুটো লোক পিঠে বস্তা নিয়ে ওদের অনুসরণ করল। লালমোহন দুটো মশাল দিয়েছিল। একটা নিভে গেলে দ্বিতীয়টা জ্বালতে হবে। এখন ফাটা মাঠে সাপ ছড়িয়ে আছে। মশালের আলো দেখলে সরে যাবে। সোমরা ডান হাতে মশাল উঁচিয়ে হাঁটছিল, তার বাঁ হাত আঁকড়ে ধরে এতোয়া। এত ভাল খবরটা প্রথমে কাকে দেবে বুঝতে পারছিল না সোমরা। বন্ধুদের না বুড়োদের? নিজের বউয়ের মুখ মনে পড়ল। রোজ রোজ এত শুকিয়ে যাচ্ছে যে বিছানা থেকে উঠলেই মাথা ঘোরে তার। সকালবেলায় আটচালায় তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসতে হয়। বাবা ওর শরীরটাকে বাইরে ভেতরে মেরে দিয়েছে বলে বাচ্চা হয়নি। হয়তো ওই নতুন জায়গায় গেলে, পেট-ভরতি জল এবং খাবার পেলে ওর শরীরটা ভাল হয়ে যাবে।

দু' দুটো বিশাল সাপ এতোয়া কী করে শিকার করেছে তা গাঁয়ের লোক সমস্ত সন্ধ্যা ধরে শুনেছে। ওইটুকু ছেলের এত বিক্রম তা যেন কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না। সাপ দুটোকে কুচি কুচি করে কেটে মাটির হাঁড়িতে জল নুন ফেলে সেদ্ধ করা হচ্ছে কাঠ জ্বালিয়ে। দুখন বারংবার বলেছে, 'দুটো বড় টুকরো যেন এতোয়ার জন্যে থাকে।'

গাঁওবুড়োর বউ সুখী রান্নার তদারকি করছিল আর দুটো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। হাত নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে। এ্যাই, দূরে যা, সরে যা।'

যাদের বলা হল তারা এক পা-ও সরল না। দেড় বছর থেকে দশ বছর জুলজুল করে তাকিয়ে থাকল হাঁড়ির দিকে। যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবার ওখানে রান্না হচ্ছে। হঠাৎ কান্না শোনা গেল আটচালার আর এক প্রান্ত থেকে। মাংরা দুখন ছুটে গেল সেদিকে। ভিড় জমেছে ইতিমধ্যেই। যে দুই বুড়ো আর এক বুড়ির অবস্থা দিনভর খারাপ ছিল তাদের একজন এইমাত্র মুক্তি পেয়ে গেল। বুড়োর ছেলে, ছেলের বউ কাঁদছিল। গাঁওবুড়ো তাদের ধমকাল, 'খবরদার কাঁদবে না। কাঁদলে শরীরের যেটুকু জল এখনও বেঁচে আছে তা বেরিয়ে যাবে। তখন যে কাঁদছে তাকেও মরতে হবে। অপেক্ষা করো। বর্ষা আসুক, বৃষ্টি নামুক, তারপর একটা দিন দেখে ওর জন্যে আমরা সবাই মিলে কাঁদব।'

যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে কান্না গিলে ফেলতে চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু চাপা গোঙানি বন্ধ করতে পারছিল না কিছুতেই।

এখন বেশ রাত। সমস্ত পৃথিবী গভীর অন্ধকারে ঢাকা। ছোটনাগপুরের এই প্রত্যন্ত গ্রামের কিছু মানুষ মরা গাছের কাঠ জ্বালিয়ে বসে আছে আটচালার বাইরে। মাথার ওপর অজস্র তারা। তাদের দিকে তাকালে মন শান্ত হয়। পায়ের তলার মাটি আর এখন তেতে নেই। মেয়ের দল কলসি নিয়ে নদীতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠে দূরের দিকে আঙুল তুলল। লকলকে আগুন এগিয়ে আসছে।

আগুনের তলায় বেশ কয়েকজন লোক যাদের ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। দুটো লোক আবার কুঁজো হয়ে আসছে। হঠাৎ মাংরা চিৎকার করে উঠল, 'সোমরা।'

চিৎকার করে সে দৌড়াল। ততক্ষণে ওরা স্পষ্ট হয়েছে।

মাংরাকে দেখতে পেয়ে এতোয়ার হাতে মশালটা দিয়ে দিল সোমরা। মাংরা জিজ্ঞাসা করল, 'এরা তোর সঙ্গে এসেছে কেন? কী নিয়ে এসেছে ওরা?'

'বলছি, সব বলছি।'

বস্তা দুটো মাটিতে নামিয়ে হাঁপাতে লাগল লোক দুটো। তারপর এতোয়ার হাত থেকে মশাল নিয়ে একটাও কথা না বলে ফিরে গেল যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে। গাঁয়ের সব মানুষ প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে ভিড় করে এসেছে। কাঠের উনুন থেকে সুখী নামিয়ে নিয়েছে হাঁড়ি। মাংস সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন তাদের নজর বস্তার দিকে।

সোমরা মুখ খুলল, 'এই দুটো বস্তা পাঠিয়েছে লালমোহন তেলি। এর মধ্যে ভাঙা গম আছে। গাঁয়ের সবাই যাতে আজ খেতে পায় তার জন্যে পাঠিয়েছে।'

সবাই উল্লসিত। শুধু দুখন জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? আমাদের খাইয়ে ওর কী লাভ?'

সোমরা বলল, 'মানুষ কি সবসময় লাভের কথা ভেবে কিছু করে? মানুষের বুকে যখন ভগবান ঢুকে পড়ে তখন সে অন্যদের উপকার করতে চায়। আজকে বাজারে একজন পুরো প্যান্ট পরা সাহেবের সঙ্গে দু'জন আধা প্যান্ট এসেছিল যন্ত্রের গাড়ি চড়ে। এই পৃথিবীর মালিক ইংরেজ সাহেবরা আমাদের এত কষ্ট দেখে ওদের পাঠিয়েছিল। ওরা আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চায় যেখানে সারাবছর জলের অভাব নেই, চারবেলা পেট ভরে খাবার পাওয়া যাবে, প্রত্যেকের ঘর হবে, কোনও কষ্ট সহ্য করতে হবে না।'

'সেই দেশ কোথায়?' দুখনের গলায় সন্দেহ।

'এক রাত, আর এক রাতের পর ভোর। বেশি দূরে নয়। সেখানে বৃষ্টি হয় বারো মাস, মাটি ফেটে যায় না, নদী শুকিয়ে যায় না।' সোমরা জানাল।

এবার মাংরা জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু ওরা আমাদের জন্যে এত করবে, আমাদের কী করতে হবে?'

'বেশি কিছু না। সারাদিনের কিছু সময় মাটি কোপাতে হবে।'

'এই গরমে?' একজন আঁতকে উঠল। 'তুই একদম বুদ্ধু। যেখানে আমাদের নিয়ে যাবে সেখানে গরম নেই।' সোমরা বলল, 'এর ওপরে প্রত্যেক মাসে নগদ চার চারটে পয়সা পাবে সবাই কাজ করার জন্যে। চার চারটে পয়সা, ভাবতে পারো তোমরা?'

আচমকা যেন সবাই একটি স্বর্গরাজ্য দেখতে পেল। ইংরেজরা ভগবান, লালমোহন দেবদূত। সেই দেবদূতের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে সোমরা। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল, আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেলল কেউ কেউ! কবে যাওয়া হবে, কীভাবে যাওয়া হবে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করতে লাগল সোমরাকে। সোমরা জানাল কাল খুব ভোরে স্বয়ং লালমোহন তেলি আসবেন এই গ্রামে। তাঁর মুখ থেকেই সব কথা জানতে পারবে সবাই। আজ এই গমভাঙা সেদ্ধ করে সবাই খেয়ে নিক।

সুখী আপত্তি করল, 'না। সব না। এক বস্তা আজ সেদ্ধ হবে, কাল অন্যটা।'

আটচালার বাইরে সমস্ত মানুষ স্বপ্ন দেখতে লাগল সেই দেশকে নিয়ে যেখানে সোমরা তাদের যেতে বলছে। সেখানকার গাছে গাছে সবুজ পাতা, কত রকমের ফল। সেই ফল খেয়েই পেট ভরে যাবে। এখানে জলই নেই তাই কেউ সাঁতার জানে না। ওখানকার নদীতে নামার আগে সাঁতার শিখতে হবে। কিন্তু তাদের যে কয়েকটা গোরু, ছাগল, মুরগি রয়েছে তাদের কি সঙ্গে নিয়ে যেতে দেবে? উত্তরটা

লালমোহন তেলি দিতে পারে।

হঠাৎ সোমরার নজর পড়ল আটচালার ভেতর। সেখানে কেউ নেই। শুধু তিনটে শরীর পাশাপাশি শুয়ে আছে। সে গাঁওবুড়োকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কেমন আছে?'

গাঁওবুড়োর খেয়াল হল, দেহগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একজন নেই।'

'কে?' সোমরা ছুটে গেল আটচালার ভেতরে। এক বৃদ্ধের শরীর প্রায়-শক্ত। বাকি দু'জনের শেষ নিশ্বাস পড়ব পড়ব করছে। দু'জনের কেউ ভোর দেখতে পাবে না। যদি কোনও মতে দশটা দিন নিশ্বাস নিতে পারত তা হলে নতুন জায়গায় গিয়ে আবার উঠে দাঁড়াত। হঠাৎ নিজের বউয়ের কথা খেয়াল হল সোমরার। আটচালায় নেই। জিজ্ঞাসা করতে দুটো মেয়ে বলল কিছুক্ষণ আগে এখানেই শুয়ে ছিল। সন্ধের পর বারবার ঘরে যেতে চাইছিল। একটা মেয়ে ছুটে গেল পেছনের মাটির ঘরে। ফিরে এসে বলল ঘরে কেউ নেই।

কাঠ আর শুকনো ডালের আগুন কমে আসছে। ইতিমধ্যে নতুন হাঁড়িতে ভাঙা গম জলের সঙ্গে মিশিয়ে উনুনে বসিয়ে দিয়েছে সুখীরা। সোমরা আটচালার বাইরে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। কোথায় গেল বউটা। যে ভাল করে হাঁটতে পারে না সে কোথায় যেতে পারে? পেচ্ছাপ-পায়খানার জন্যে মেয়েরা অন্ধকারে যায়। জল ছাড়াই যায়। ওই বাবদ জল খরচ করা বিলাসিতা। বউ সে কারণে অন্ধকারে যায়নি তো?

সে কয়েক পা অন্ধকারে এগিয়ে চিৎকার করল, 'তুই কোথায়?'

কোনও সাড়া এল না। ততক্ষণে মাংরা আর দুখন চলে এসেছে পাশে। তিনজনে তিনদিকে ঘুরতে লাগল অন্ধকারে। হঠাৎ দূরে শেয়ালদের উল্লাস শোনা যেতেই মাংরা ছুটে গেল সেদিকে। বেশ কয়েকটা শেয়াল নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করছে। মাংরার চিৎকার শুনে ভয় পেয়ে একটু সরে গেল ওরা।

তখনই মাটিতে পড়ে থাকা শরীরটাকে দেখতে পেল মাংরা। আবছা অন্ধকারের যে আলো তাতে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। মাংরার চিৎকার শোনামাত্র সোমরা এবং দুখন দৌড়ে এল। জিরজিরে রোগা শরীরেও রক্ত থাকে। শেয়ালগুলো সেই রক্ত বের করেছে। হালকা শরীরটাকে আটচালার কাছে নিয়ে এসে আঁতকে উঠল সোমরা। ক্ষতবিক্ষত শরীরে প্রাণ নেই।

মানুষগুলো পড়েছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। মেয়েরা বেরিয়ে গিয়েছে সেই মাঝরাতে জল আনতে। নদীর শুকনো বুক খুঁড়ে খুঁড়ে যেটুকু জল পাবে তা না আনলে সারাদিন শুকিয়ে মরতে হবে। মৃত্যুশোকে বসে থাকলে শরীর শুনবে না। অদ্ভুত ব্যাপার, যে দুই বৃদ্ধবৃদ্ধার শেষ নিশ্বাস পড়ো পড়ো হয়ে গিয়েছে তারা আবার নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে এখন। কিন্তু রাতেই বৃদ্ধের সঙ্গে সোমরার স্ত্রীর শেষকৃত্য করতে হয়েছে। কোনও বাহুল্য নয়, গাছের কাঠ কেটে শরীর জ্বালিয়ে ছাই করে দেওয়াই এখানকার নিয়ম। যখন শরীর পুড়ছে তখন সবাই একই সঙ্গে চিৎকার করেছে, বাবা তু লে লে। বাবা তু লে লে। আর এইসবের পর সবাই নেতিয়ে পড়েছিল আটচালার সামনে। এমন সময়, ভোর হল। আকাশ ফরসা হচ্ছে কিন্তু সূর্যের দেখা পেতে দেরি আছে। আর তখনই পাঁচটা মানুষকে দিগন্তে দেখা গেল। চারটে মানুষ একটা মানুষকে বয়ে নিয়ে আসছে। দুটো বাঁশের ওপর চেয়ার বাঁধা। তাতে আরাম করে বসে আছে লালমোহন তেলি।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে বসল। ওদের থেকে সামান্য দূরে এসে চেয়ার নামাল বাহকেরা। লালমোহন তেলি চারপাশে তাকাল। তারপর বলল, 'ইস, কী কষ্ট করে বেঁচে আছিস তোরা। জল নেই, খাবার নেই, এভাবে কেউ বাঁচতে পারে?' লালমোহন তাকাল জনতার দিকে, 'কাল যে আমার কাছে গিয়েছিল সে কোথায়?'

ভিড়ের পেছনে চুপচাপ বসেছিল সোমরা। শেয়ালে-খাওয়া বউয়ের জিরজিরে রক্তাক্ত শরীরটাকে সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। লালমোহনের প্রশ্ন শুনে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হল।

লালমোহন হাসল, 'জব্বর ছিল রে শজারুর মাংসটা। খুব নরম। তা কাল রাত্রে ভাঙা গম সেদ্ধ করে সবাইকে খাইয়েছিস?'

সোমরা মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল।

'তুই অত দূরে কেন? কাছে আয়। আমি কেন নিজে এলাম এদের বলিসনি?'

লালমোহনের প্রশ্নের জবাব দিল দুখন, 'ওর বউ রাত্রে মারা গিয়েছে।'

'তাই নাকি? আহা! মেয়েটা আর ক'দিন বাঁচতে পারলে সুখের মুখ দেখতে পেত। বাচ্চাকাচ্চা কতগুলো?' গলা নামাল লালমোহন।

'নেই।' মাংরা জবাব দিল।

'যাকগে। হ্যাঁ। তোমরা তো সব শুনেছ। ইংরেজ রাজার লোক আমাকে বলেছে যারা সুখে শান্তিতে থাকতে চায় তাদের পাঠিয়ে দিতে। আমি বলি কী এরকম সুযোগ বারবার আসবে না। এখন বলো, তোমরা যেতে রাজি আছ কি না?'

গাঁওবুড়ো বলল, 'গেলে ফিরে আসতে পারব তো?'

'যখন ইচ্ছে তখনই চলে আসতে পারবে। কিন্তু ইচ্ছে করবে না, পেট-ভরা খাবার জলের আনন্দ ছেড়ে এখানে শুকিয়ে মরতে কেউ আসতে চাইবে না।' লালমোহন বলল।

'কিন্তু এই মাটিতে আমাদের বাপ-ঠাকুরদা জন্মেছে, মরেছে। এখানে আমাদের কত স্মৃতি। এই জায়গায় ফিরে আসব না তা কি হয়?' গাঁওবুড়ো বলল।

'এসো। মরতে ইচ্ছে করলে চলে এসো।' হাসল লালমোহন।

একজন উঠে দাঁড়াল, 'আমাদের সঙ্গে কি পোষা

জানোয়ারগুলো যাবে?'

'তুমি কি পাগল?' চেঁচিয়ে বলল লালমোহন, 'কেন? ওখানে গিয়ে জানোয়ার পুষতে পারবে না? কত চাও? বিনা পয়সায় পাবে সে। এরকম মরা মরা জানোয়ার নয়। সব তাগড়াই তাগড়াই চেহারা।'

'তা হলে এরা কোথায় যাবে?'

'আরে এর জন্যে তোমাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমি কি মরে গেছি? ওদের দায়িত্ব আমি নেব। আমার বাড়িতে জলের অভাব নেই। সব ক'টা যেন ঠিকঠাক থাকে তা আমি দেখব। কী চিন্তা দূর হল তো?' লালমোহন হাত তুলল।

'আপনি ওদের নিয়ে নেবেন?' দুখন জিজ্ঞাসা করল।

'নিয়ে নেব মানে? দেখাশোনা খাওয়ানো মানে কি নিয়ে নেওয়া? তোমরা না থাকলে ওরা যাতে মরে না যায় তা আমি দেখব। যখন যে ফিরে আসবে সে তার গোরু-ছাগল ফেরত নিয়ে যাবে। এ তো সোজা কথা। এখন তোমরা বলো ভালভাবে বাঁচার জন্যে যেতে রাজি আছ কিনা?' লালমোহন জিজ্ঞাসা করল।

একটু সময় লাগল। কিন্তু যেই একজন হ্যাঁ বলল অমনি সবাই চিৎকার করে উঠল একসঙ্গে, 'হ্যাঁ।'

খুশিতে হাত তুলল লালমোহন, 'ভাল। কিন্তু একটা ছোট্ট সমস্যা আছে। ইংরেজ রাজার আইন অনুযায়ী যারা শক্ত সমর্থ তারাই ওখানে যেতে পারবে। যাদের বয়স হয়ে গিয়েছে অথবা যেসব শিশুর বাবা-মা নেই অথবা যে অনেকদিন রোগে ভুগছে তাদের এখনই নিয়ে যাওয়া হবে না।'

শোনামাত্র একটা হতাশার ধ্বনি ছিটকে উঠল জনতার কারও কারও গলায়।

হাত তুলে শান্ত হতে বলল লালমোহন, 'অজানা অচেনা জায়গা, তা যতই ভাল হোক, আগে দেখা দরকার। শক্ত সমর্থরা যাবে, সব দেখবে, বয়স্কদের যাতে অসুবিধে না হয়

তার ব্যবস্থা করবে। এরপর বয়স্কদের যেতে কোনও অসুবিধে হবে না। ঠিক আছে?'

মাংরা বলল, 'হ্যাঁ। এই কথাটা ভুলো না।'

গাঁওবুড়ো বলল, 'ওরা চলে গেলে আমাদের কে দেখবে? কে জল এনে দেবে? কে বর্ষা পড়লে চাষ করবে? আমাদের শরীরে তো ওসব করার শক্তি নেই!'

লালমোহন হাসল, 'আমার ওপর একটু ভরসা রাখো। ওরা যতদিন না তোমাদের নিয়ে যাচ্ছে ততদিন আমি ভাঙা গম আর জল দেব। এমনি এমনি ঘর থেকে কেউ দেয় না। বর্ষা নামলে মাঠে তো তোমাদের গোরু দিয়ে চাষ করাব, তোমাদের ছাগলের দুধ খাব আর তার বদলে তোমাদের সাহায্য করতে পারব না?'

হঠাৎ কেউ একজন হাততালি দিতেই সবাই হাততালি দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল। মাথা নেড়ে লালমোহন বলল, 'এবার কাজের কথা বলি। তোমরা সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়াও। একজনের পব একজন। মাথা গোনা হবে।'

লোকজনের মাথায় কথাটা যেন ঢুকছিল না। লালমোহন দুখনদের ডেকে ব্যাপারটা বোঝাতে তারা উদ্যোগী হল। প্রথমে গাঁওবুড়ো, তারপর বুড়ো থেকে শিশুদের লাইন পড়ল। ওপাশে প্রথমে সুখী, তারপর যত বুড়ি যুবতি বালিকা শিশু।

লালমোহন তেলি ছেলেদের লাইনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমে গাঁওবুড়ো। লোকটার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও একেবারে থুত্থুরে বুড়ো হয়ে যায়নি। সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়ে যাওয়া চলবে না এমন বয়সের মানুষকে। কিন্তু সেটা বললেই ঘোঁট পাকাবে লোকটা। গাঁওবুড়োকে নিশ্চয়ই অন্যান্যরা মানে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বউ কোথায়?'

হাত বাড়িয়ে গাঁওবুড়ো পাশের লাইনের প্রথমে দাঁড়ানো সুখীকে দেখিয়ে দিল। সুখীকে মোটেই বৃদ্ধা বলে মনে হল না লালমোহনের। অতএব গাঁওবুড়োর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে

রাজি করাতে হবে সাহেবকে। একের পর এক বৃদ্ধদের লাইন থেকে সরিয়ে আনা হচ্ছিল। শিশুরা দাঁড়িয়েছিল মায়ের কাছ ঘেঁষে। শেষ পর্যন্ত এতোয়ার দিকে নজর গেল লালমোহনের। এই বাচ্চাটাকেই কাল শজারু আহত করেছিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাই, তোর বাপ-মা কোথায়?'

মাথা নাড়ল এতোয়া, 'নেই।'

নেই? অ। এই বেরিয়ে যা। বুড়োদের পাশে গিয়ে দাঁড়া।

এতোয়া বেরিয়ে এল। সোমরা গলা তুলল এতক্ষণে, 'ওকে নেবেন না?'

'নিশ্চয়ই নেব। আর একটু বড় হোক, তখন যাবে। আইনে আছে মা-বাবার সঙ্গে বাচ্চা যাবে, ও তো একা যেতে পারে না।' লালমোহন বলল, তারপর ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এখানে কার সঙ্গে থাকিস?'

হাত তুলে লাইন থেকে বের করে আনা এক বুড়োকে দেখিয়ে দিল এতোয়া।

মাথা নাড়ল লালমোহন। তা হলে কিছু করা যাবে না।

একই পদ্ধতিতে মেয়েদের লাইন থেকে বুড়ি এবং প্রৌঢ়াদের সরিয়ে দিল সে। তারপর কর্মচারীদের হুকুম করল দুই লাইনের মানুষদের মাথা গুনতে। লোকগুলো তৎপরতার সঙ্গে গোনা শেষ করল। চল্লিশজন পুরুষ, বিয়াল্লিশজন মহিলা এবং উনত্রিশটা বাচ্চা। মোট মানুষের সংখ্যা একশো একুশ। এবার লালমোহনের নির্দেশে একটা কৌটো খুলে তা থেকে লাল রং কাঠি দিয়ে বের করে লাইনে দাঁড়ানো লোকদের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে মাখিয়ে দেওয়া হল।

কাজ শেষ করার সময়েই সূর্যদেব উঠে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে গরম হাওয়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লালমোহন তার চেয়ারের কাছে চলে গিয়ে চিৎকার করল, 'আজকের মতো কাজ শেষ। হ্যাঁ, তোমরা জানো এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে রেললাইন পাতা হয়েছে। এখন সেখান দিয়ে মালগাড়ি যায়।

তোমরা নিশ্চয়ই তাকে দেখে এসেছ। কালো ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে শব্দ করে ছুটে যায়। ওই গাড়িতে উঠলে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে তোমরা। আজ থেকে ঠিক ছয়দিন পরে সকালবেলার মধ্যে তোমরা টুংরিমিলায় চলে যাবে। টুংরিমিলায় ট্রেন লাইনের পাশে তোমাদের মতো অন্যান্য গ্রাম থেকেও লোক আসবে যাওয়ার জন্যে। সন্ধের পরে রওনা হলে আরামসে ভোরের আগে পৌঁছে যাবে সেখানে। আজকের রাত ধরলে পাঁচটা রাত যাওয়ার পর ছয় নম্বর রাত এলেই রওনা হবে। যতদিন তোমাদের মধ্যে যারা বুড়োবুড়ি এবং এখন যাচ্ছে না ততদিন গোরু-ছাগলগুলো এখানে থাকবে। আমি ওদের জন্যে ভাঙা গম পাঠিয়ে দেব। তোমরা যারা যাচ্ছ তাদের ওপর ইংরেজ রাজার অনেক দয়া। এই দয়ার কথা কোনওদিন ভুলো না।' কথা শেষ করে চেয়ারের দিকে পা বাড়াতেই দূরে মেয়েদের দেখা গেল যারা জল আনতে গিয়েছিল। মাথায় হাঁড়ি নিয়ে ফিরছে তারা।

অপেক্ষা করল লালমোহন। মেয়েরা এসে আফশোসের সঙ্গে জানাল আজ কারও হাঁড়ি অর্ধেকের বেশি ভরেনি। অন্যান্য গাঁয়ের মেয়েরা এসে বালি খুঁড়ছে জলের আশায়। পরিশ্রান্ত মেয়েগুলোর মুখ খুব করুণ দেখাচ্ছিল।

লালমোহন লক্ষ করল এদের কারও কারও শরীর রোগা এবং দুর্বল হলেও প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছাতে দেরি আছে। তার নির্দেশে মেয়েদের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে লাল রং মাখিয়ে দেওয়া হল। মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল বাহান্ন। ব্যাপারটা কী তারা বুঝতে পারছিল না। সুখী বুঝিয়ে দিতে হাসি ফুটল মুখগুলোতে।

চেয়ারে বসল লালমোহন তেলি। মুখ মাথা কাপড়ে ঢাকল। চার বাহক তাকে কাঁধে নিয়ে ছুটল বাজারের পথে। দিগন্তে না মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত গাঁয়ের মানুষরা সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

পাঁচ রাত। তার পরই এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

পুরো গ্রামটা এখন আটচালার নীচে বসে নিচু গলায় এই আলোচনা করছিল। আজ আধ হাঁড়ি জল পাওয়া গেছে। কাল হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না। শুকিয়ে মরতে হবে এখানে। নয়তো সবাই মিলে হাজির হবে বাজারে। কিন্তু লালমোহনের কথা না শুনে থেকে গেলে কি সে জল দেবে?

তরুণরা সজোরে প্রতিবাদ করল। যেখানে এত জল এত খাবার সেখানে না যাওয়ার কোনও কারণই নেই। শরীরটা যাতে আরাম পায় সেটাই করা উচিত। সোমরা চুপচাপ ছিল। দুখন এবং মাংরা সমবয়সিদের নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। যাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনও দ্বিধা নেই। হঠাৎ চিৎকার করল দুটো বাচ্চা। একটা ছাগলের পেছনে ছুটছিল তারা রোদ মাথায় নিয়ে। ছাগলটা এমন লাফ মেরেছে যে একেবারে কুয়োর ভেতরে ঢুকে গেছে। দুখনরা দৌড়াল। কুয়োর নীচে আলো পৌঁছাচ্ছে না। একজন দড়ি বেঁধে নেমে গেল নীচে। কিছুক্ষণ পরে তার গলা পাওয়া গেল। সেই গলায় উল্লাস ওপরের উৎসুক মানুষদের অবাক করল। কুয়োর কাদার ওপরে জল হয়েছে। এক হাঁটু জল। ছাগলটা সেই জল খাচ্ছে!

কথা হচ্ছিল বুড়োবুড়িরা গাঁয়েই থাকবে। অতটা পথ কষ্ট করে যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একেবারে জরাগ্রস্ত ছাড়া সবাই যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে। ক'দিন থেকে এতোয়া মাংরাদের কাছে এসে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বারংবার বলেছে। তার কোনও কষ্ট হবে না। বড়দের মতো সেও পারবে যেতে। সোমরা ওকে সমর্থন করেছে। যে ছেলে ভয়ংকর সাপকে সহজেই ধরতে পারে, শজারুকে কাহিল করতে পারে সে আর পাঁচটা বাচ্চার মতো নয়। কিন্তু ইংরেজ রাজার আইন মেনে চলতেই হবে। তবু যদি শেষ মুহূর্তে লালমোহন তেলিকে বলে আইন ওর জন্যে বদলানো যায় তার চেষ্টা করা হবে।

লাঠির ডগায় পুঁটলি বেঁধে ছেলেরা রওনা হল। মেয়েরা যা পারল নিল বাচ্চাদের সঙ্গে। গ্রাম ছাড়ার আগে গাঁওবুড়োরা নতজানু হয়ে মাটিকে প্রণাম করল। দীর্ঘ রাস্তা। মশাল জ্বালিয়ে ওরা ধীরে ধীরে হাঁটছিল। ফেটে যাওয়া শুকনো মাটিতে সাপ থাকতে পারে বলে আওয়াজ করছিল প্রথম দিকে যারা হাঁটছে তারা। আকাশ তারায় তারায় ঝকঝকে। কেউ কোনও কথা বলছিল না। মাঝে একবার ধুলোর ঝড় উঠল। গরম ঝড়। ওরা তখন মাথা নিচু করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত যখন পুবের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে তখন একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'টুংরিমিলা, টুংরিমিলা।'

শব্দ দুটো শোনামাত্র আচমকা কেউ কেঁদে উঠল। কোনও বুড়োর গলার কান্না। এবং তা যে সংক্রামক পরক্ষণেই বোঝা গেল। অনেকেই কাঁদছে এখন। টুংরিমিলায় পৌঁছাবার মুখে সেই কান্না থামল অদ্ভুত দৃশ্য দেখে। তিনদিক থেকে মশালের আলো এগিয়ে আসছে। আলোর পেছনে অনেক মানুষ। এরকম দৃশ্য ওরা আগে কখনও দেখেনি।

যে বিশাল মাঠটায় ওরা গিয়ে জড়ো হল তার পাশে ট্রেনের লাইন। লাইন আর মাঠের মাঝখানে একটা বেড়া। বাঁশ পুঁতে পুঁতে বেড়াটা করা হয়েছে। বেড়ার প্রান্তে একটা ছোট্ট আটচালা। গোটা পনেরো স্বাস্থ্যবান লোক যাদের পরনে হাফপ্যান্ট এবং হাতে চাবুক, চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছিল বিভিন্ন দলকে আলাদা আলাদা বসার জন্যে।

এখানে কয়েকটা বড় গাছ এখন পাতা ধরে রাখতে পেরেছে। তাদের একটার দিকে মাংরারা গিয়ে বসল। দুখন বলল, 'দ্যাখ, শুধু আমরা না, অন্যান্য গাঁ থেকেও মানুষ যাচ্ছে। তার মানে যেখানে যাচ্ছি সেটা খুব ভাল জায়গা।'

পাশের গাছটার নীচে যে দলটা বসেছিল সেখান থেকে দুটো মেয়ে উঠে দাঁড়াল। একটি মেয়ের শরীর বেশ সমৃদ্ধ। সোমরার মনে হল তাদের গ্রামের কোনও মেয়ের এমন স্বাস্থ্য নেই।

অকারণে ঘুরে ঘুরে কথা বলছিল ওরা আর আড়চোখে এদিকে তাকাচ্ছিল। ওদের দলের কোনও মহিলা বারংবার ডাকছিল, দূরে যেতে নিষেধ করছিল। নামটা কানে এল সোমরার, বুধনি। শেষ পর্যন্ত হাফপ্যান্ট পরা লোকের ধমক খেয়ে ওরা দলে ফিরে গেল। সোমরার মনে হল ওর বউটার শরীর যদি ওরকম হত তা হলে নিশ্চয়ই মরত না।

রোদ ওঠার পর ঘটাং ঘটাং শব্দ কানে এল। ওদের বিস্মিত চোখের সামনে একটা কালো গাড়ি বিকট শব্দ করতে করতে ধোঁয়া ছুড়তে ছুড়তে মাঠের পাশের লোহার লাইনে এসে দাঁড়াল। শব্দটার সঙ্গে রাগী সাপের হিসহিসানির মিল আছে। ওর পেছনে পর পর অনেকগুলো খালি পেট কাটা গাড়ি বাঁধা আছে। একসময় স্থির হয়ে গেল ওটা। ধোঁয়া বন্ধ হয়ে গেল। আর তখনই একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল আটচালার পাশে। সেই গাড়ি থেকে নামল একটা পুরো প্যান্টের সাহেব একটা হাফপ্যান্ট এবং লালমোহন তেলি। আটচালার নীচে পাতা চেয়ারে বসে তারা কথা বলতে লাগল। এই সময় হাতে চাপ পড়তেই সোমরা পাশ ফিরে তাকাল। কাতর চোখে তাকিয়ে এতোয়া বলল, 'আমি যাব। ওকে তুমি বলো, আমি যাব।'

'আসুক। কাছে আসুক। বলব।' নির্জীব গলায় বলল সোমরা।

মাথায় এখনও কিছু গাছের পাতার আড়াল কিন্তু গরম বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ। শরীর নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। হঠাৎ সাপের মতো রেলগাড়ি থেকে বড় বড় পাত্র নামাতে লাগল বলবান মানুষগুলো। তারপর নিয়ে এল ওগুলোকে গাছের নীচে। চিৎকার করে ডাকল একের পর এক এসে খাবার নিয়ে যেতে। সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন উঠল। গাছের শুকনো পাতা কুড়িয়ে তার মধ্যে ঢেলে দেওয়া ভাঙা গমের সেদ্ধ দলা নিয়ে গোগ্রাসে খেতে লাগল ওরা। ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে খাওয়া শেষ হলে ওদের নিয়ে যাওয়া হল বেড়ার

ধারে। একজন লোক পেটকাটা ওয়াগন থেকে একটা পাত্রে জল তুলে এনে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওদের হাতে দিচ্ছিল। গরম হয়ে যাওয়া সেই জলের সবটুকু গলায় চালান করে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল ওরা। একবার যে জল পেয়েছে তাকে দ্বিতীয়বার নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছিল না বলবানরা। জল খাওয়া হয়ে গেলে ফিরে যেতে হল গাছের তলায়। জল যত অল্প বা গরম হোক না কেন খাওয়ার পর তা পেটে যাওয়ায় মানুষগুলোর সুখ হল। সেই সুখে প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করতে অসুবিধে হল না ওদের।

একটু পরেই ডাক এল। যাদের আঙুলে লাল রং লাগানো হয়েছে তারা আটচালার সামনে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়াক।

আদেশ শোনামাত্র সবাই হুড়মুড়িয়ে এগোতে চাইল। বলবান লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে পথ আড়াল করে। তারা আঙুল দেখতে চাইছে। যার আঙুলে লাল দাগ আছে তাকে যেতে দিচ্ছে আটচালার দিকে। বুড়োবুড়িরা যাদের হাতে রং নেই তাদের বলছে ফিরে যেতে। না গেলে চাবুক মারছে মাটিতে ভয় দেখাতে। তাতেও ভয় না পেলে দু'-তিন জনের পিঠে সেটা আছড়ে মারছে। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বুড়োবুড়িরা ফিরে যাচ্ছে গাছের তলায়। আধঘণ্টা ধরে এমন দৃশ্য পর পর হয়ে যাওয়ার পর দল দুটো আলাদা হল। চার গ্রামের শক্ত সমর্থ মানুষরা বাচ্চা সমেত আটচালার সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের মাথার ওপর আগুন ঝরানো সূর্য। যে যার পুঁটুলি মাথার ওপর তুলে নিয়েছে আত্মরক্ষার জন্যে। আর দূরের গাছগুলোর নীচে বুড়োবুড়িরা দঙ্গল পাকিয়ে কাঁদছে। চারটে গাছের নীচে চার গ্রামের বুড়োবুড়ি। তাদের কান্নার আওয়াজ এখন বিকৃত।

দু' দুবার চেষ্টা করে লাইনে ঢুকতে পারেনি এতোয়া। দু'-দুবারই আঙুলে রং না থাকায় প্রবল ধমক খেতে হয়েছে। তৃতীয়বার চেষ্টা করার আগে একটা কাঁটা তুলে আঙুল রক্তাক্ত

করল সে। আঙুলের চেহারা লাল হয়ে গেলে সে আগে যে প্রহরীর কাছে যায়নি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে আঙুল দেখাল। লোকটা আঙুল ধরে চাপ দিতেই এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে হেসে হাতের চাবুকে আলতো করে এতোয়ার পশ্চাদদেশে আঘাত করে বলল, 'ভাগ। ভাগ যা।' কেঁদে ফেলল এতোয়া। রক্তাক্ত আঙুল মুখে পুরে চলে গেল বুড়োবুড়িদের কাছে। তার বয়সি, তার চেয়ে কম বয়সি ছেলে-মেয়েরা যাওয়ার অধিকার পাচ্ছে কারণ তাদের সমর্থ মা-বাবা যাচ্ছে। সে ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

আটচালায় তখন খুব ব্যস্ততা। একজন হাফপ্যান্ট কাগজ নিয়ে বসে আছে। প্রথম লোকটার আঙুল দেখে জিজ্ঞাসা করছে, 'নাম?'

'শনিচর।'

এক লিখে তার পাশে শনিচর লিখল লোকটা। তারপর একটা সুতোয় বাঁধা প্ল্যাস্টিকের চাকতি হাতে বেঁধে দিল আর একটা লোক। দিয়ে বলল, 'এই চাকতি মরে যাওয়ার আগে খুলবি না। যা। ওপাশে যা।' লোকটি বিহ্বল হয়ে বেড়ার ফাঁক গলে চলে এল ওয়াগনের ধারে। তাকে ধমকে উঠল একজন প্রহরী, 'ওঠ, ওপরে উঠে বস।' লোকটি তেতে থাকা পেটকাটা ওয়াগনে উঠে লাফাতে লাগল যন্ত্রণায়।

লোহার ওয়াগন এখন এত গরম যে পা রাখা যাচ্ছে না। হাতের পুঁটলি নীচে ফেলে তার ওপর উঠে দাঁড়াল লোকটা।

এক এক করে লোক যাচ্ছে আর ওয়াগনগুলো ভরে উঠছে। মানুষের শরীরের তাপে লোহার ওয়াগন ক্রমশ ঠান্ডা হচ্ছে। এবার মাংরার পালা। তার বউ এবং দুটো বাচ্চা সঙ্গে। বাচ্চা দুটো নেতিয়ে রয়েছে দু'জনের কোলে। নাম বলে লকেট নিয়ে ভেতরে পাঠাবার আগে জিজ্ঞাসা করা হল, 'এই বাচ্চা কার? তোমার?' মাংরা মাথা নাড়তে অব্যাহতি পেল। একই প্রশ্ন ওর

বউকে করতে সেও মাথা নাড়ল। সাদা চামড়ার পুরো প্যান্ট পরা লোকটা হাতের লাঠি উঁচিয়ে মাংরার বউকে দেখিয়ে কিছু বলল। হাফপ্যান্ট পরা একজন সেটা লালমোহন তেলিকে বলতে সে হেসে বলল, 'দেখতে রোগা কিন্তু খাটতে পারে মোষের মতো। কোনও চিন্তা নেই।' বাক্যটা হাফপ্যান্ট সাহেবকে শোনাতে তিনি লাঠি নেড়ে যেতে বললেন মাংরার বউকে। সোমরা স্বস্তি পেল। তার বউ যদি বেঁচে থাকত তা হলে কিছুতেই সাহেব অনুমতি দিত না। ওকে এখানে ফেলে রেখে যেতে হত তাকে, নয়তো যেত না।

গাঁওবুড়ো আঙুল দেখাতেই পরীক্ষক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাই, তোমার বয়স কত?'

গাঁওবুড়ো এমন ঘাবড়ে গেল যে কথা বলতে পারল না। পুরো প্যান্ট পরা সাহেব উঠে এসে গাঁওবুড়োর চিবুকের নীচে লাঠি রেখে মুখটা তুলে বিকৃত গলায় কিছু বলল। হাফপ্যান্ট পরা লোকটা লালমোহনকে সেটা তর্জমা করে দিতে সে ঘনঘন মাথা নাড়ল, 'দেখতে ওই রকম। কিন্তু একদম জোয়ান। ওর বউকে দেখুন। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাই, তুমি ওর বউ?'

সুখী মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ।'

'তোমার বর তোমাকে খুশি করতে পারে?' হাফপ্যান্ট পরা জিজ্ঞাসা করল।

'মানে?'

'যাচ্চলে। তোমার বর রাত্রে তোমাকে আনন্দ দেয়?'

গাঁওবুড়ো কাতর চোখে বউয়ের দিকে তাকাল। সুখী বলল, 'হ্যাঁ।'

'তোমাদের বাচ্চারা কোথায়?'

'মরে গেছে।' বলল সুখি।

লালমোহন তাকে বলল, 'এ হচ্ছে গাঁওবুড়ো। ওর বউ যুবতী। একে যেতে না দিলে মুশকিলে পড়ব। সবাই বেঁকে বসতে পারে। সাহেবকে বুঝিয়ে বলো।'

হাফপ্যান্ট পরা লোকটা পুরো প্যান্টকে সেটা বলল। লোকটা কিছুতেই রাজি হয় না। বারংবার সুখীর শরীরের দিকে তাকাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মুখ ভেটকে যেতে দিল গাঁওবুড়োকে। সোমরা এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। নাম? সোমরা। বউ বাচ্চা? নেই। লকেট দেওয়া হল তাকে। লোকটা বলল, 'একশো আট নম্বর। মনে রেখো। যাও।'

সোমরা গেল না।

লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'একটা বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।' সোমরা বলল।

'বাচ্চা? কার বাচ্চা?' লোকটা অবাক।

'ওর বাপ-মা নেই।'

'কত বড় বাচ্চা?'

'যত বড় হলে কালসাপ ধরতে পারে, শজারু মারতে পারে।'

'না নিয়ম নেই। যাও, ভেতরে যাও। এই এসো।' দুখনকে ডাকল লোকটা। অতএব মাথা নিচু করে এপাশে চলে এল সোমরা।

বেলা যত বাড়তে লাগল ওয়াগনগুলো তত ভরে উঠল। শেষ পর্যন্ত আটচালার সামনে যখন কোনও লাইন নেই, সূর্য চলে গেছে পশ্চিমে তখন প্রহরীরা চলে এসেছে বেড়ার এপাশে। ওয়াগনগুলোকে ঘিরে তাদের ব্যস্ততা বেড়েছে। কেউ যেন ওয়াগনের বাইরে শরীরের কোনও অংশ বের করে না রাখে। কোনও ওয়াগনে চিৎকার-চেঁচামেচি হলেই সেখানে চাবুক গিয়ে পড়ছে, 'চুপ, একদম চুপ।' লালমোহন তেলি হাসি হাসি মুখে সাহেবের সঙ্গে কথা বলছে। ওদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাফপ্যান্ট পরা একটা লোক কথাগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছে। দুখন চট করে উঠে দাঁড়িয়ে অন্য ওয়াগনগুলো দেখে নিল। তাদেরটা একেবারে শেষে। তাদের আগে আর একটা ওয়াগনে মানুষ ঠাসা। তারপর একটা অন্য রকম ঘর।

মাথায় ছাদ, সামনে বারান্দা। ঘরটা কাঠের তাই দুপুরে তেমন গরম হবে না। হঠাৎ পৃথিবী কাঁপিয়ে একটা শব্দ বাজল। সেটা আসছে একেবারে সামনের দিক থেকে। যে রাগী যন্ত্রটা এই পেটকাটা গাড়িগুলোকে টানবে সে যেন সতর্ক করছে। হঠাৎ মাংরা জিজ্ঞাসা করল, 'এই গাড়িটা এখন চলবে?'

সোমরা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। না হলে আমাদের তুলবে কেন?'

মাংরা জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু এতটুকু জায়গায় এত মানুষ বসে আছি পেচ্ছাপ পায়খানা পেলে কী করব? এই গাড়ি চললে তো খুব অসুবিধা হবে।'

দুখন বলল, 'এখানেই করতে হবে। করে তার ওপর বসে থাকব।'

মাংরা বলল, 'আমার এখন একদম ভাল লাগছে না। ইংরেজ রাজা আমাদের ভাল করতে নিয়ে যাচ্ছে অথচ ওর লোক চাবুক মারছে। কেন? চাবুক মারবে কেন?'

সোমরা বলল, 'ঠিক। একদম ঠিক।'

মাংরা বলল, 'আমার মনে হচ্ছে না যাওয়াই ভাল।'

সঙ্গে সঙ্গে দুখন ধমকাল, 'নদীর নীচেও জল নেই। এখানে থাকলে তো শুকিয়েই মরে যাব। যাব না?'

গাঁওবুড়ো চুপচাপ শুনছিল। সুখী বসে আছে অন্য মেয়েদের সঙ্গে। এতকাল সে সুখীকে হুকুম করে এসেছে আর আজ সুখীর কথায় ওরা তাকে যেতে দিচ্ছে। এটা গাঁওবুড়োর খুব খারাপ লাগছে। সে মাথা নেড়ে বলল, 'গত বছর কীভাবে বেঁচেছিলি? তার আগের বছর? তোর বাপ ঠাকুরদা কীভাবে বেঁচেছে। দু'-চারজন নিশ্চয়ই প্রত্যেক বারে মরে কিন্তু বাকিরা তো আবার বর্ষা দ্যাখে। আর বিয়াল্লিশটা দিন কষ্ট সহ্য করলেই বৃষ্টি দেখতে পেতাম আমরা। তখন নদী ভরে যেত, ডোবাগুলোতে জল টলটল করত। মাটি আবার জুড়ে যেত, গাছে নতুন পাতা ফুটত।'

মাংরা বলল, 'তা হলে আমরা নেমে যাই?'

ঠিক তখনই একটা চাবুক সপাং করে এসে পড়ল মাংরার কাঁধে এবং সেইসঙ্গে তীব্র চিৎকার, 'চুপ। বাৎচিত বন্ধ।'

রোদ এখন মরে এসেছে। মাঠের ও প্রান্তে গাছগুলোর নীচে পড়ে থাকা বুড়োবুড়িরা অনেকক্ষণ নড়ছিল না। তাদের গলাতেও কোনও আওয়াজ নেই। অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে তাদের গলা ধরে গিয়েছিল। কান্নার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিল। রোদ মরে এলে প্রহরীরা যখন বেড়ার ওপাশে চলে গেল তখন গাছগুলোর তলা থেকে ভয়ে ভয়ে ওরা চলে এসেছে বেড়ার ধারে। নিজেদের গাঁয়ের পরিচিত মুখগুলো যেসব ওয়াগনে বসে আছে তার ঠিক সামনের বেড়া ধরে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে ওরা। কারও ছেলে, ছেলের বউ, কারও মেয়ে, কারও জোয়ান নাতি সেই ওয়াগনে বসে তাদের পূর্বপুরুষকে দেখছে কাতর চোখে। একেবারে শেষ ওয়াগনের সামনে বেড়ার এপাশে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ঠেলে সরিয়ে এতোয়া বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ছিল তার গাঁয়ের মানুষদের দিকে। ওরা যাচ্ছে সেই দেশে যেখানে প্রচুর জল, প্রচুর খাবার। যেখানে কোনও কষ্ট নেই, যেখানে শুধু আরাম আর আরাম।

সোমরা ওকে দেখতে পেল। সে বসেছিল বেড়ার দিকের ওয়াগনে। এতোয়ার ঠোঁট নড়ল। কোনও শব্দ নেই তবু সোমরা যেন শুনতে পেল, আমি যাব। সোমরা চোখ বন্ধ করল। তার কোনও ক্ষমতা নেই। এরা যেরকম ব্যবহার করছে তাতে নিজেকে বন্দি ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। অথচ এখান থেকে পালাবারও সাহস হচ্ছে না তাদের।

হঠাৎ বাঁশি বাজল। ঘন ঘন। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। দুটো ওয়াগন বাদ দিয়ে একটা জায়গায় এক একজন রক্ষী উঠে বসল। তাদের হাতে এখন বন্দুক আর একটা যন্ত্র। রক্ষীদের বসার ব্যবস্থা আগেই করে রাখা ছিল। ইঞ্জিনটা শব্দ করছে খুব, বাঁশি বাজাচ্ছে। হঠাৎ দুলে উঠল ওয়াগনটা খুব জোরে। সোমরারা এ-ওর শরীরে ঢলে পড়তে পড়তেও

সামলে নিল শেষ পর্যন্ত। তারপর চলা শুরু হল। খুব ধীরে। চেনা মুখগুলো যা ছিল বেড়ার ওপাশে, এখন সরে যেতে লাগল।

ওয়াগনগুলোকে চলতে দেখেই এতোয়া বেড়া ছেড়ে দিয়ে মাঠে নামল। তারপর দৌড়াতে লাগল। দৌড়াতে দৌড়াতে দেখল সাপের মতো গাড়িটা খুব ধীরে চলছে। লোহার লাইনটা একটা বাঁক নিয়ে বাঁ দিকের একটা সাঁকোর ওপর উঠে গেছে। ছোট্ট সাঁকো। নীচে জল নেই। এতোয়া মাঠ চিরে দৌড়ে সেই সাঁকোর নীচে যখন চলে এসে হাঁপাচ্ছে একটু বাতাসের জন্যে তখনও ইঞ্জিনটা সেখানে এসে পৌঁছায়নি। এদিকে অনেক কাঁটা ঝোপ। যার পাশে দিব্যি লুকিয়ে থাকা যায়। সাঁকোর নীচ থেকে সেরকম একটা ঝোপের পেছনে চলে এল এতোয়া। এখান থেকে রেললাইন মাত্র কয়েক হাত দূরে। এবার ইঞ্জিনটাকে দেখতে পেল সে। ধোঁয়া ছাড়ছে শব্দ করে। ওর শরীরের ভেতর আগুন জ্বলছে। নাক দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে সাঁকো পার হল ইঞ্জিনটা। ওটাকে চালাচ্ছে যারা তাদের দেখতে পেল এতোয়া। মাথায় টুপি পরেছে লোকগুলো। তারপর একের পর এক ওয়াগন সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। শেষ ওয়াগনটা সামনে আসতেই সে দৌড়াল। লাইনের ওপর উঠে ছুটতে লাগল ওটাকে ধরার জন্যে। হাত গেল ওয়াগনের গায়ে। কিন্তু সেখানে ধরার কিছু নেই যা তাকে ওপরে উঠতে সাহায্য করবে। শেষ পর্যন্ত একটা লোহার রড চোখে পড়ায় সেটা ধরে ঝুলতে লাগল সে। রডটা ওয়াগনের নীচের দিকে। ওখানে ঝুলে থাকলে কিছুতেই ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। সে চিৎকার করে গাঁয়ের মানুষদের ডাকতে লাগল যদি ওরা ওকে সাহায্য করে। কিন্তু গলা দিয়ে যে শব্দ বের হল তা চাকা এবং ইঞ্জিনের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল।

রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর এতোয়ার শরীর অবশ হয়ে আসছিল। ট্রেনটা এখনও গতি

বাড়ায়নি যদিও গ্রাম থেকে অনেকদূরে নির্জন প্রান্তরে চলে এসেছে। যে-কোনও মুহূর্তেই রড থেকে হাত খসে যাবে, গতি বাড়ালেই আর ধরে রাখতে পারবে না রডটাকে এতোয়া। এইসময় হুইস্‌ল বাজতে লাগল। ট্রেনটা ধীরে ধীরে থেমে গেল। থামতেই নীচে পড়ে গেল এতোয়া। লাইনের মাঝখানে পড়ে থাকা পাথরে কনুই আর হাঁটু ঘষে গিয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা তৈরি হল। সে মরার মতো পড়ে রইল।

এবার প্রহরীরা নেমে পড়ল যে-যার জায়গা থেকে। ওয়াগনগুলোর সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা এখনই পেচ্ছাপ পায়খানা করে নাও। এরপর ট্রেন আর সারারাত থামবে না। এই জায়গাটা নির্জন কিন্তু কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। পালালেই গুলি করে মারব।'

কেউ একজন প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'কে বলল কথাটা? কে বলল? শালা, তোরা এখন ইংরেজ রাজার সম্পত্তি। ইংরেজ রাজা তোদের কিনে নিয়েছে লালমোহন তেলির কাছ থেকে। যার দরকার আছে সে নেমে আয়। ছেলেরা বাঁদিকে যাবে, মেয়েরা ডানদিকে। পাঁচ মিনিট সময় পাবি তোরা।' দেখা গেল অনেকেরই প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছিল। যাদের ছিল না তারাও নামল। বাচ্চাদের নিয়ে মায়েরা। তারা গেল ডানদিকে।

শরীর শুকনো। বাইরের জল এত কম সেখানে গিয়েছে যে সোমরার চেষ্টা বৃথা গেল। বেশির ভাগ মানুষেরই একই অবস্থা, শুধু গাঁওবুড়োর সময় লাগল। পাশে দাঁড়ানো মাংরা সোমরাকে ফিসফিস করে বলল, 'গাঁওবুড়ো চুরি করে জল খেয়েছে আজ। এত জল ও পেল কোথায়?'

সোমরা কথা বলল না। ততক্ষণে তার দৃষ্টি চলে গিয়েছে শেষ ওয়াগনের পেছনে। সেখানে লাইনের ওপর যে একটা মানুষ পড়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। মানুষটা কে? এরকম শুকনো নির্জন প্রান্তরে কারও আসা সম্ভব নয়। প্রহরীরা দাঁড়িয়ে

আছে দূরে। তাদের নজর মেয়েদের দিকে। সেই দৃশ্য দেখে হ্যা হ্যা করে হাসছে তারা। ফেরার সময় চট করে সরে গেল সোমরা। ওয়াগনের নীচে পড়ে আছে এতোয়া। বুক নড়ছে বলে বোঝা গেল, বেঁচে আছে। সে দু'হাতে ঝাঁকাতে চোখ মেলল বাচ্চাটা। ঘোর কাটার আগেই সোমরা বলল, 'আমাকে ধরে উঠে দাঁড়াতে পারবি?'

আবার নেতিয়ে পড়ল ছেলেটা। হুইস্‌ল বাজছে ওপাশে। সময় নেই। কোলে করে খানিকটা নিয়ে এসে সোমরা চেঁচাতে লাগল, 'আমার বাচ্চাটা কী রকম করছে। মরে যাবে ও।' একজন প্রহরী ছুটে এল, 'কী হয়েছে?'

'আমার বাচ্চাটাকে পেচ্ছাপ করাতে নামিয়েছিলাম। গরমে পেচ্ছাপ হয়নি। কিন্তু এখন কী রকম করছে, হুঁশ থাকছে না।' সোমরা চেঁচাল।

'যাক না মরে। মরে গেলে ফেলে দিস।'

'কী বলছিস তুই? তোর বাচ্চা নেই?' ফুঁসে উঠল সোমরা।

লোকটা রেগে গিয়েও সামলে নিল, 'দাঁড়া। আমি আসছি।'

এতোয়াকে ওয়াগনের কাছে নিয়ে এল সোমরা। ততক্ষণে অনেকেই ভিড় করেছে সেখানে। মাংরা বলল, 'ও এখানে কী করে এল?'

সোমরা মাথা নাড়ল, 'জানি না। কিন্তু ও কে জিজ্ঞাসা করলে আমার ছেলে বলবি।'

চাবুকের শব্দ হতেই সবাই দুদ্দাড় করে ওয়াগনে উঠে গেল। এইসময় সেই প্রহরী ফিরে এল একটা মগ হাতে নিয়ে। তার ভেতরে খানিকটা ঘোলা জল। এতোয়ার মাথায় সেই জল কিছুটা ঢেলে দিয়ে বলল, 'বাকিটা ওকে খাইয়ে দে।'

মগ এতোয়ার মুখে চেপে ধরতেই ঠোঁট ফাঁক হল, দাঁত খুলল। একটু একটু করে জল ওর গলায় যখন ঢালছে সোমরা তখন ওয়াগন থেকে চিৎকার ভেসে এল বাচ্চাদের, তারা জল চাইছে।

মগটা ছিনিয়ে নিয়ে বাকি জল নিজের মুখে ছড়িয়ে দিয়ে প্রহরী বলল, 'আহ, উঠে পড়।'

সোমরা অনেক কষ্টে এতোয়াকে ওপরে তুলতেই বুধন তাকে টেনে নিল। এতক্ষণে এতোয়া চোখ মেলেছে। অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। তারপর দুটো হাতের মুঠো খুলল সে। সেখানে বড় বড় ফোসকা।

আবার হুইস্‌ল বাজল। ট্রেন চলল। সবাই চুপচাপ। চেনা পৃথিবী, চেনা আকাশ সরে যাচ্ছে একটু একটু করে। আকাশে আর সূর্য নেই কিন্তু অন্ধকার নামতেও বেশ দেরি আছে। আকাশে যেন ঘোর লেগেছে। হঠাৎ একটা ওয়াগন থেকে কেউ যেন বিষণ্ণ গলায় গেয়ে উঠল, 'মা তোকে ছেড়ে যাচ্ছি পেটের জন্যে, ক্ষমা কর মা।' সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রহরী তাকে ধমকে থামিয়ে দিল। আবার একটু নীরবতা। তারপর অন্য ওয়াগন থেকে একই সুরে বাজল কথাগুলো। প্রহরী তাকেও থামাল।

এখন আকাশ পেছনে রেখে, মাথায় নিয়ে ট্রেনটা চলছে। ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া সেই আকাশে বীভৎস ছবি আঁকছে। টেনে আনছে অন্ধকার, রাতের অন্ধকার। হঠাৎ সব ক'টা ওয়াগন থেকে কয়েকশো গলায় গানটা বেজে উঠল, 'মা, তোকে ছেড়ে যাচ্ছি পেটের জন্যে, ক্ষমা কর মা।' এই চরাচর চুপচাপ গ্রহণ করল কথাগুলো।

অন্ধকার নামল। ছুটে যাচ্ছে ইঞ্জিন ওয়াগনগুলোকে নিয়ে। সামনের বা পেছনের পৃথিবীটার চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। শুধু মাথার ওপর তারায় ভরা আকাশটাই একমাত্র চেনা। মানুষগুলো কুঁকড়ে, এ-ওর শরীরের সঙ্গে আটোসাঁটো ভাবে জড়িয়ে বসেছিল, বলা যায় বসতে বাধ্য হয়েছিল। হঠাৎ গতি কমে এল, কমতে কমতে দাঁড়িয়ে গেল ট্রেনটা। এতক্ষণ অন্ধকারে চোখ ঘষে ঘষে তিরতিরে আলোর সন্ধান পেয়ে গেছে ওরা। তাতেই দেখতে পেল দু'পাশে জঙ্গল আর জঙ্গল। বড় বড় গাছগুলো ঝুম হয়ে মিলেমিশে আছে। প্রহরীদের গলা

শোনা গেল, এরকম জায়গায় দাঁড়াবার কারণ জিজ্ঞাসা করছে এ-ওকে। তাদের চিৎকার মিলিয়ে যাওয়ার আগেই গর্জন শোনা গেল জঙ্গলে। এত কাছাকাছি যে রক্ত হিম হয়ে গেল সবার। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা দুলে উঠল। ইঞ্জিন সিটি বাজাল তীব্র স্বরে। গুডুম গুডুম শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। দু'বার। ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল। ওদের এতক্ষণ মনে হচ্ছিল কখন থামবে এই গাড়ি, এখন মনে হল আর যেন না থামে।

দুখন তারা দেখছিল চলন্ত ওয়াগনে বসে। কতদিন মাঠে চিত হয়ে শুয়ে যে ওদের দেখেছে। সব চেনা চেনা তারা। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে ওগুলো বাবার ঘরের আলো। রাতের বেলায় বাবা ওদের জ্বালিয়ে দেয় দিনের বেলায় নেভায়। এখনও ওই চেনা তারাগুলো যে যখন দেখতে পাচ্ছে তখন বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, এই জায়গাটাও বাবার। দুখন লেপটে-থাকা বউ বাচ্চাদের দিকে তাকাল। তার মেয়ের বয়স এখন পাঁচ। খালি-গা, মাথায় জট পাকানো চুল কিন্তু এর মধ্যে কান ফুটো করে দিয়েছে বউ। দিয়ে সুতো বেঁধে রেখেছে। মেয়েটা মরার মতো ঘুমোচ্ছে। বউ ওর পাশে ছোট বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে বসে আছে। চোখাচোখি হতে বউ ফিসফিস করে বলল, 'ভয় লাগছে। আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

দুখন উত্তর দিল না। তার বাঁ দিকে সোমরা হাঁটুতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। সোমরার শরীরে ভর দিয়ে বসেছে এতোয়া। এখন ওর কনুই-হাঁটুতে রক্ত শুকিয়ে আঠা হয়ে আছে। এতটা সময় কী করে ওয়াগনের নীচে ঝুলেছিল কে জানে!

'সোমরা।' নিচু গলায় ডাকল দুখন।

সোমরা মুখ তুলল।

দুখন বলল, 'এই লোকগুলো ভাল না। আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানিস।'

সোমরা নিচু গলায় বলল, 'জল আর খাবারের দেশে।'

'কী জানি! তা হলে ওরা লালমোহনকে টাকা দেবে কেন?'

দুখন জিজ্ঞাসা করল।

উত্তরটা সোমরারও অজানা। ট্রেন চলছে যেমন চলছিল।

হঠাৎ দুখন ফিসফিসিয়ে বলল, 'পালাবি?'

অবাক হয়ে তাকাল সোমরা। দুখন বলল, 'এরপরে যদি গাড়িটা থেমে যায় তা হলে পেছনদিক দিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়লেই হল। অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না।'

মাংরা যে কথাগুলো শুনছে তা ওর কথায় বোঝা গেল, 'গর্জন কানে যায়নি? নামামাত্র ওরা খেয়ে নেবে আমাদের।'

দুখন বলল, 'আর একটু পরে ভোর হবে। আলো ফুটবে, কোনও ভয় নেই। তা ছাড়া আমরা যদি পাঁচ-ছয়জন একসঙ্গে থাকি তা হলে পাথর ছুড়ে ওদের তাড়িয়ে দেব।'

মাংরা জিজ্ঞাসা করল, 'পাথর কোথায় পাবি?'

'নীচে। এতোয়া তো পাথরের ওপর শুয়ে ছিল। অনেক পাথর।'

কিন্তু আলো ফোটার আগে ট্রেন থামল না। এবং ভোরের আলোয় ওরা অন্য পৃথিবী দেখল। শুকনো পোড়া মাটি নেই দু'পাশে, মাটির ওপর সবুজ ঘাস। গাছের পাতারাও ঝরে যায়নি এবং তাদের রংও সবুজ। প্রচণ্ড শব্দ বাজল। ট্রেনটা যে নদী পার হচ্ছে বোঝা গেল বালি আর বালির মাঝখানে বয়ে যাওয়া জলের স্রোত দেখে। সুখী চিৎকার করে উঠল, 'জল, জল, কত জল।' নদীটা যেন পিছলে পিছলে চলে গেল।

সূর্য তখনও মাথার ওপরে ওঠেনি কিন্তু রোদের তাপ বাড়ছে। হঠাৎ দুই-একটা ছাড়া ছাড়া বাড়ি চোখে পড়ল ওদের। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। তার পরেই গতি কমে এল ট্রেনটার। দূরে অন্য রকমের বাড়িঘর, কিছু মানুষ অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, রাস্তা দিয়ে গোরুতে টানা গাড়ি চলছে দেখতে পেল ওরা। তারপর ট্রেনটা থেমে গেল।

প্রহরীরা নেমে গেল উঁচু মতো একটা জায়গায়। জায়গাটা অন্য রকমের পাথরে তৈরি। ছাউনি দেওয়া ঘর থেকে একটা

মোটাসোটা লোক যার পরনে হাফপ্যান্ট মাথায় সোলার টুপি, প্রহরীদের কিছু বলল। তারপর এগিয়ে গেল সামনের দিকে যেখানে খুব বড় ঘর আছে। প্রহরীরা বাঁশি বাজাল। ওয়াগনগুলোর সামনে এসে চিৎকার করে ওদের নামতে বলল।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ওরা বুঝতে পারল পায়ে সাড় নেই। কোমরের নীচটা অসাড় হয়ে আছে। প্রহরীরা পাথরে চাবুক মারছে আর হুকুম করছে তাড়াতাড়ি নামতে। কাঁপতে কাঁপতে প্রথমে পুরুষরা নামল, নেমে মেয়ে আর বাচ্চাদের নামতে সাহায্য করল। সবাই নামলে প্রহরীরা হুকুম করল ওদের অনুসরণ করতে। ওরা হাঁটল। সামনে এবং দু'পাশে প্রহরীরা ওদের পাহারা দিচ্ছে।

বাইরে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই বড় বাড়িটার পেছনে ওরা জল দেখতে পেল। গোরু-মোষ সেই জলে স্নান করছে। কয়েকটা লোক লাঠি হাতে তাদের পাহারা দিচ্ছে। কয়েকশো মানুষকে এদিকে আসতে দেখে তারা প্রাণীগুলোকে সাত তাড়াতাড়ি জল থেকে তুলে নিয়ে সরে গেল।

প্রহরীদের কিছু বলতে হল না। কয়েকশো মানুষ প্রায় একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘোলাজলে। যেন বহুমাস পরে প্রাণের স্পর্শ পেল। ছেলেদের পরনের নামমাত্র কাপড় ভিজে চপচপে হলেও মেয়েরা এখন আর আবরুর কথা ভাবছে না। কত্ত মাস পরে শরীরের শুকনো চামড়া জলের স্পর্শ পাচ্ছে আর তাতেই তারা পাগল হয়ে যাচ্ছিল। এ-ওর গায়ে জল ছিটাচ্ছিল। সোমরাও জলে নেমেছিল। কাদার ওপর পা রেখে কোমর অবধি জলে ডুব দিচ্ছিল ঘন ঘন। সবাই এই জল খাচ্ছে পেট ভরে। কয়েক ঢোক পেটে যাওয়ার পর তার শরীর গুলিয়ে উঠতে সে খাওয়া বন্ধ করে ডুব দিল। পায়ের পাশে যেটা পেল তা তুলে ধরতেই সে অবাক। গুগলি। চিৎকার করে সবাইকে দেখাতে এতোয়া হাত বাড়াল, 'আমাকে দাও।' দু'হাতের চাপে

গুগলির বর্ম ভেঙে তুলতুলে মাংসটা এতোয়ার প্রসারিত হাতে দিতেই ছেলেটা সেটা গপ করে মুখে পুরে চিবোতে লাগল চোখ বন্ধ করে।

'আমাকে একটা ধরে দাও।'

মেয়েলি গলা কানে আসতেই পেছন ফিরল সোমরা। তাকাতেই শরীরটা কী রকম হয়ে গেল। বুধনি চলে এসেছে তার কাছে। হাসছে। চুলের জটা জল পেয়ে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। শরীরের ময়লা মরে যাওয়ায় চামড়া চকচকে দেখাচ্ছে। জল পেয়ে মেয়েটার আর কোনও হুঁশ নেই। এত কষ্টের মধ্যে থেকেও ওর শরীর যে এমন ভরাট কী করে থাকল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। সোমরা ডুব দিল। কাদার গায়ে তার হাত খুঁজতে লাগল গেঁড়ি। না নেই, আর একটাও পাচ্ছে না সে। দম বন্ধ করে থাকায় বুকে চাপ লাগতে লাগল। বাতাসের জন্যে ওপরে উঠতেই ব্যাকুল বুধনি জিজ্ঞাসা করল, 'পেলে?'

মাথা নেড়ে না বলে এক বুক বাতাস নিয়ে আবার সে ডুব দিল। হাতড়াতে হাতড়াতে যখন বুক বাতাসের জন্যে ছিঁড়ে যাচ্ছে তখন আঙুলে যন্ত্রণা হল। কেউ তার আঙুল কামড়ে ধরেছে। দ্রুত ওপরে উঠে হাঁসফাঁস করে নিশ্বাস নিতে নিতে সে দেখতে পেল তার আঙুল থেকে রক্ত ঝরছে আর সেখানে কামড়ে ধরে ঝুলছে একটা বড়সড় কাঁকড়া। এক হ্যাঁচকা টানে দাড়া ভেঙে দিয়ে কাঁকড়াটাকে এগিয়ে দিল সে বুধনিকে। বুধনির মুখ চকচক করতে লাগল। কাঁকড়াটাকে নিয়ে ছুটে গেল তার সঙ্গীদের দেখাবে বলে। বিহ্বল হয়ে ওর যাওয়া দেখছিল সোমরা। হঠাৎ হাতে টান পড়তে দেখতে পেল এতোয়া তার আঙুল থেকে ভেঙেও লেগে থাকা কাঁকড়ার দাড়াটা ছাড়িয়ে নিল। রক্ত পড়ছে টপ টপ করে। এতোয়া সোমরার আঙুল চট করে নিজের মুখে পুরে চুষতে লাগল। আঙুল চুষলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে এই তথ্যটা ওইটুকু বাচ্চাও জানে বুঝতে পেরে

অন্য হাতে ওর মাথায় আদর করল সোমরা। এইসময় প্রহরীরা চিৎকার করতে লাগল জল ছেড়ে উঠে আসার জন্যে। প্রথম কয়েকবার সেটাকে পাত্তাই দিল না মানুষগুলো। প্রহরীরা তখন জলের কাছে চলে এসে চাবুক মারতে লাগল শরীরগুলোকে। অনেক চেষ্টার পর ওদের জল থেকে তুলতে পারল ওরা। দেখা গেল শুধু সোমরাই নয় অনেকেই গেঁড়ি তুলেছে পুকুর থেকে। খোলা ভেঙে কাঁচাই চিবুচ্ছে পরমানন্দে।

আবার লাইন করে ওয়াগনের কাছে নিয়ে আসা হল ওদের। সেখানে তখন পাথরের মধ্যে আগুন জ্বলছে। কাঠের আগুনের ওপর হাঁড়িতে সেদ্ধ হচ্ছে চাল সঙ্গে কয়েক রকমের পাতা। বড় বড় হাতায় সেটা পরীক্ষা করছে যারা তারা স্থানীয় মানুষ। তাদের পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। সবাই জুলজুল করে দৃশ্যটা দেখছিল। অনেকগুলো আগুনে অনেক হাঁড়িতে অনেক অনেক চাল সেদ্ধ হচ্ছে। ওগুলো যে চাল তা একটু কাছে গিয়ে দেখে এসেছে ওরা। এবার হুকুম হল পাশের গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আসার। চওড়া পাতা, গাছগুলোও লম্বা নয়।

আগুন নিভে গেলে খাবার ঠান্ডা হয়ে এলে এক এক করে গিয়ে পাতা সামনে ধরতে হল। দুই হাতা ঘ্যাঁট নিয়ে সরে এসে খেতে লাগল ওরা। এই দৃশ্য দূরে দাঁড়িয়ে যেসব স্থানীয় মানুষ দেখছিল তারা হাসছিল। সোমরারা দেখেই বুঝতে পারছিল স্থানীয় মানুষদের অবস্থা তাদের থেকে ভাল।

এতটাই জল পেটে গিয়েছিল যে দু'হাতা ভাতের ঘ্যাঁট খেয়েই পেট ভরে গেল ওদের। খেয়ে খুব আরাম হল। আবার তাদের লাইন দিয়ে পুকুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। যে যার মুখ ধুয়ে জল খেয়ে নিতেই হুকুম হল প্রাকৃতিক কাজ শেষ করার। এরপরে নাকি গাড়ি আর থামবে না।

মেয়েরা চলে গেল একদিকে, ছেলেরা অন্যদিকে। প্রাকৃতিক কাজ শেষ হওয়ার পর যখন আবার ওয়াগনের দিকে ওরা

ফিরছে তখন সোমরার নজর গেল বুধনির দিকে। ওর বউয়ের বুক বলে কিছু ছিল না, বুধনির দিকে তাকাতেই মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। হাসল বুধনি। যে-যার ওয়াগনে উঠে যাওয়ার পর সুখী বলল, 'কাল খুব ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু না আসলে এত জলে স্নান করতে পারতাম? কতদিন পরে ভাত জুটল, ওখানে পেতাম?'

ওপরে ওঠার সময় বসার জায়গা বদলে গিয়েছিল। দুখনরা গিয়েছে আরও ভেতরের ঘরে। মাংরা ওই কোণে গাঁওবুড়োর পাশে। এতোয়া সোমরার বাঁ দিকটা ছাড়েনি কিন্তু গাঁওবুড়োর বউ সুখী চলে এসেছে সোমরার ডান দিকে। এত বড় ওয়াগনের তুলনায় মানুষের সংখ্যা বেশি বলে এ-ওর শরীরে চেপে রয়েছে।

সুখী বলল, 'কী, ঠিক কিনা?'

সোমরা মাথা নাড়ল, 'ঠিক।'

সুখী নড়ল। সুখীর শরীর সোমরার বুক টের পাচ্ছিল। গাঁওবুড়োর দ্বিতীয় বউ সুখী। অনেক ছোট। যৌবন ভাল। অন্যসময় এইভাবে বসার কথা কেউ ভাবতেই পারত না। কিন্তু এখন উপায় নেই। গাঁওবুড়ো দূর থেকে সুখীর দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। সুখী বলল, 'তুমি একটা বুদ্ধু।'

'কেন?' সোমরা মুখ ফিরিয়েই সরিয়ে নিল। সুখীর মুখ বড্ড কাছাকাছি।

'অত কষ্ট করে কাঁকড়াটাকে ধরে ওই বিধবা মেয়েটাকে দিয়ে দিলে?' সুখী বলল।

'বিধবা?' সোমরা অবাক।

'হ্যাঁ। তাই তো শুনলাম। তোমাকে ওর নজরে লেগেছে। সাবধান।' সুখী হাসল।

'কেন? ভয় কীসের?' বিরক্ত হল সোমরা।

'যে নিজের স্বামীকে খেয়েছে সে যে-কোনও পুরুষকে খেতে পারে।'

মুখ নামাল সোমরা। আচ্ছা কোনও মেয়ে তো তার সম্পর্কেও একই কথা বলতে পারে। তার বউ মরে গিয়েছে। বলতে পারে, যে নিজের বউকে খেয়েছে সে যে-কোনও মেয়েকে খেতে পারে। কী রকম গুটিয়ে গেল সোমরা। চোখ বন্ধ না করলে স্বস্তি পাচ্ছিল না।

ট্রেন চলছিল। আস্তে আস্তে মাটির চেহারা, গাছগাছালির শরীর একদল বদলে গেল। রোদ মরে যখন ছায়া ঘনাল তখন পৃথিবীটাকে স্বপ্নের দেশ বলে মনে হচ্ছিল। এখানে কেউ খাবার বা জল না পেলেও দিনের পর দিন হয়তো বেঁচে থাকতে পারে। মাঝে মাঝে মাটির ঘর, খড়ের চাল, চাষের খেত, অবাক হয়ে ট্রেন দ্যাখ্যা মানুষের দল ওদের চোখে পড়ছিল কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছিল না। তারপর একসময় ঠান্ডা বাতাস ওদের শরীর স্পর্শ করল। ট্রেনের গতিও কমে আসছিল। কমতে কমতে সেটা যখন দাঁড়িয়ে গেল তখন চোখের সামনে একটা বিশাল বাড়ি যার ওপারে কী আছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

প্রহরীরা চিৎকার করল, 'কেউ নামবে না। খবরদার।'

একটা বাচ্চা প্রথম মুখ খুলল, 'মা দ্যাখো দ্যাখো, কত জল।'

দুপুরে পর্যাপ্ত জল পেয়ে, তা যতই ঘোলা হোক না কেন, আকাঙ্ক্ষা তেমন তীব্র ছিল না। কিন্তু জল দেখতে ওদের খুব ভাল লাগছিল।

এতোয়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়ানোর জায়গা কম বলে হাত রেখেছিল সোমরার কাঁধে। অবাক গলায় বলেছিল, 'এই গাড়ি ওই জলের মধ্যে দিয়ে যাবে?'

কথাটা শুনতে পেয়ে দুখন বলল, 'দুর। তা হলে আমরা সবাই ডুবে যাব।'

এবার জল্পনা আরম্ভ হল। কেন তাদের এই বড় নদীর গায়ে নিয়ে আসা হল? সবাই কথা বলছিল কিন্তু কেউ ঠাওর করতে পারছিল না।

এইসময় চোখে পড়ল। বেশ বড় লম্বা নৌকো একের পর

এক এসে তীরে ভিড়ল। অন্তত কুড়িটা। এগুলোকে যে নৌকো বলে তা ওরা জানত না। ওদের গাঁয়ের কাছে যে নদী আছে সেখানে এ জিনিস কেউ দ্যাখেনি কারণ বর্ষার সময়েও নদীর জল বেশি গভীর হয় না। স্রোতের জন্যেই সে ভয়ংকর। সোমরা বলল, 'এগুলো বোধহয় জলের গাড়ি।'

হঠাৎ এতোয়া বলল, 'এই নদীটাকে যদি আমাদের গাঁয়ে নিয়ে যাওয়া যেত!'

সোমরা হাসল, 'তা হলে আমরা কেউ আসতাম না।'

খানিক পরে প্রহরী হুকুম করল ওয়াগন থেকে নেমে আসতে। ওরা নেমে শুনল ওই জলের গাড়িতে উঠতে বলা হচ্ছে। খুব ভয় পাচ্ছিল সবাই। কেউ পা বাড়াতে রাজি না। এমনকী প্রহরীদের চাবুক খেয়েও না। এইসময় সেই হাফপ্যান্ট পরা লোকটা এগিয়ে এল যে ছাউনি দেওয়া ঘরে বসে ট্রেনে করে এসেছে। লোকটার বয়স হয়েছে। টুপি খুলে আছে বলে টাক দ্যাখা যাচ্ছে। ভুঁড়িটাও বেশ বড়। প্রহরীদের দেখতে বলে লোকটা এগিয়ে গিয়ে সামনের নৌকোয় উঠে দাঁড়াল। তারপর দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে বোঝাল ভয়ের কিছু নেই।

তবু ইতস্তত ভাবটা যাচ্ছে না দেখে লোকটা দু'জন প্রহরীকে বলল অন্য নৌকোয় উঠতে। তারা আদেশ মান্য করে হাসতে লাগল। হাফপ্যান্ট পরা লোকটা ততক্ষণে মাথায় টুপি চাপিয়েছে। মুখ তুলে সবাইকে দেখছে। তারপর আঙুল তুলে সুখীকে ডাকল নৌকোয় উঠতে। ওর মুখের অদ্ভুত হাসি, ঘন ঘন মাথা নেড়ে নামতে বলা উপেক্ষা করতে পারল না সুখী। শরীর নাচিয়ে সে নেমে গেল নৌকোর দিকে, হাত বাড়িয়ে তাকে নৌকোর ওপরে তুলে নিয়ে লোকটা অন্যদের ডাকল। এবার জড়তা একটু কমল। একটু একটু করে নৌকোগুলো ভরে গেল। মাঝিরা লক্ষ রাখছিল যাতে কোনও নৌকোর ওপর চাপ বেশি না পড়ে।

সাপের মতো ওয়াগনগুলোকে নিয়ে ইঞ্জিনটা চুপচাপ পড়ে রইল নদীর পাড়ে। হুইস্‌ল বাজল ঘন ঘন। হঠাৎ মাঝিগুলো চিৎকার করে উঠল, 'গঙ্গা মাইকা জয়। বলো গঙ্গা মাইকা জয়।' তারপর লগি আর দাঁড় পড়ল জলে।

দু'পাশে জল আর জল। নৌকোগুলো খুব তাড়াতাড়ি স্রোতে পড়তেই নীচের দিকে ছুটতে আরম্ভ করল। তখন আকাশে আলো নেই। তিরতিরে অন্ধকার নেমে আসছে নদীর ওপর। ঢেউ আর বৈঠার লড়াইয়ের আওয়াজ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। মানুষগুলো ভয়ে কুঁকড়ে বসে আছে। হাতের কাছেই জল। ঘোলা জল নয়, দেখলে মনে হয় কালো জল। হাত বাড়াল সোমরা। হাতের তেলোয় জল তুলে নিয়ে দেখল পরিষ্কার টলটলে জল। বাবার এটা কেমন খেলা? এখানে মানুষ নেই অথচ কত জল দিয়েছে আর যেখানে মানুষ জলের জন্যে হাহাকার করছে সেখানে এক ফোঁটাও দিচ্ছে না এখন।

যে মাঝিটা হাল ধরেছিল তার সামনে বসে আছে হাফপ্যান্ট পরা টেকোমাথা। টুপিটা বাঁ হাতে ধরা। নৌকোতে জায়গা খালি নেই এখন। যেহেতু সুখী উঠেছিল প্রথমে তাই তাকে বসতে হয়েছে টেকোমাথার সামনে। নৌকো চলতে শুরু করলেই সুখী টের পেল টেকোর হাত তার পশ্চাৎদেশ পরীক্ষা করছে। গাঁয়ে যদি কেউ এরকম কিছু করত তা হলে তাকে বেদম মার খাওয়াত সে। বিচার করিয়ে ছাড়ত। কিন্তু এখানে আড়ষ্ট হয়ে দূরে বসা গাঁওবুড়োর দিকে তাকাল। গাঁওবুড়ো ভয়ে চোখ বন্ধ করে বসে বিড়বিড় করছে। হয়তো বাবাকে ডাকছে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে সুখীর মনে হল এই একরাত একদিনে লোকটা যেন আরও বুড়ো হয়ে গিয়েছে। তার নাম সুখী কিন্তু তাকে সুখ দেওয়ার ক্ষমতা লোকটার নেই। ব্যাপারটা স্বীকার করে লোকটা। রাত্রে কান্নাকাটি করে নিজের অক্ষমতার জন্যে। অথচ লোকটা গাঁয়ের মাতব্বর। সুখীর মুখ থেকে কথাটা বের হলে লোকে আর ওকে গাঁওবুড়ো বলে মানবে না।

তাই কথা গিলতে হয়েছে সুখীকে। ইচ্ছে হয়েছে গাঁয়ের কোনও পুরুষকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে সুখী হতে। কিন্তু পারেনি। আজ দুপুরের পর সোমরার শরীরের সঙ্গে শরীর লাগাতে বাধ্য হওয়ায় সেই ইচ্ছেটা প্রবল হচ্ছিল। সোমরার তো বউ নেই। বাচ্চা নেই। হয়তো বয়সে একটু ছোট, তাতে কী এসে যায়। একজন পুরুষের শরীরের মাঝে শরীর চেপে ধরতেই যদি এত আনন্দ তা হলে নিজেকে ওই বুড়োর জন্যে বঞ্চিত করবে কেন? প্রচণ্ড যন্ত্রণা হল। টেকোটা চিমটি কাটছে। ঝট করে লোকটার দিকে তাকাতেই হাসি দেখতে পেল। সুখী ভাবল উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবে। তারপরই মনে হল প্রতিবাদ করলে লোকটা যদি তাকে জলে ফেলে দেয় তা হলে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। সামনে যেসব চেনা মুখ বসে আছে তাদের কারও ক্ষমতা নেই তাকে জল থেকে নেমে উদ্ধার করার। লোকটা তাকে ফেলে দিতে পারে। চিমটি কাটার পরই লোকটা ওখানে আদর করতে লাগল। মাথা ঘুরিয়ে নিল সুখী। তার কিছুই করার নেই।

রাত নেমে গিয়েছে। দক্ষ মাঝিরা শেষ পর্যন্ত ওপারে নিয়ে গেল নৌকো। প্রহরীদের একবারের বেশি দু'বার বলতে হল না। নৌকোগুলো খালি হয়ে গেল চটপট এবং তখনই ওদের কানে ইঞ্জিনের শব্দ পৌঁছাল। অর্থাৎ এপারেও ট্রেন আছে। প্রহরীরা হুকুম করল প্রাকৃতিক কাজ শেষ করে ফেলতে। দুপুরের পর্যাপ্ত জল এবং নৌকোর ভয় প্রয়োজনটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অতিরিক্ত এবং দীর্ঘকাল বাদে স্নানের জন্যেই তাদের শরীর জ্বরে কাঁপছে, কেউ কেউ পেটের যন্ত্রণায় ভুগছে। কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় প্রহরীদের নেই। অন্ধকারেই তাদের তুলে দেওয়া হল ওয়াগনগুলোতে। ওয়াগনে ওঠার আগে দুখনের মাথায় পালাবার ভাবনাটা এসেছিল কিন্তু নদী পার হওয়ার অভিজ্ঞতায় সে আর সাহস পেল না। অন্ধকারে এ-ওর নাম

ধরে ডেকে বুঝে নিল ঠিকঠাক সবাই উঠেছে কিনা। গাঁওবুড়ো পাতলা পায়খানা করে এমন নির্জীব হয়ে বসেছিল যে সুখীর নাম ধরে ডাকার ইচ্ছেই হয়নি।

সুখী ওয়াগনে উঠতে পারেনি। অন্ধকারে টেকোমাথা তাকে টেনে নিয়ে গেছে ছাউনি দেওয়া গাড়িটায়। সেখানে তুলে ভাঙা ভাঙা কথায় বলেছে চুপ করে বসে থাকতে, মেয়েদের ব্যাপারে আলোচনা করতে চায়। বলে লোকটা নেমে গিয়েছিল নীচে। প্রহরীদের হাতের টর্চ অবশ্য নৌকো থেকে নামামাত্র জ্বলছিল। তারা যে-যার জায়গায় চলে গেলে বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন ছাড়ল। চলন্ত ট্রেনে দৌড়ে এসে উঠল টেকোমাথা।

ততক্ষণ ঘরটাকে দেখে নিয়েছে সুখী। ঘরের একপাশে উঁচু জায়গায় গদি পাতা আছে। আর একটা জায়গায় বসার জায়গা। টেকোমাথা দুটো ব্যাগ নিয়ে উঠেছিল। একটা ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বের করে টেবিলে রেখে হাত বাড়িয়ে ঝোলানো লণ্ঠনে আগুন ধরিয়ে দিতে ঘরটি আলোকিত হল। ছুটন্ত সেই ট্রেনের মাত্র ওই ঘর থেকেই বাইরে আলো কাঁপতে কাঁপতে বাড়ছিল।

সুখী বসেছিল মেঝের ওপর। কাঠের মেঝে। ওয়াগনের মতো লোহার নয়। এবার টেকো দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে দুটো বড় বড় বাটি বের করে তার ঢাকনায় খাবার ঢালতে আরম্ভ করল। দুটো রুটি আর মাংস একটা ঢাকনিতে ঢেলে উঠে এল সুখীর সামনে। ভাঙা ভাঙা কথা বুঝতে পারল সুখী, খেতে বলছে।

দুপুরের খাবার হজম হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ঢাকনাটা ধরল সুখী। এরকম খাবার সে জীবনে দ্যাখেনি। ওগুলোকে কী বলে সে জানেও না। কিন্তু চমৎকার গন্ধ বের হচ্ছে ওগুলো থেকে। সে দেখল টেকো পরমানন্দে গোল খাবার ছিঁড়ে অন্য খাবারটা তুলে নিয়ে মুখে ফেলে চিবোচ্ছে। সুখী অনুকরণ করল। একটুখানি মুখে দিতেই মনে হল এমন স্বাদ সে কখনও পায়নি। গোগ্রাসে খেতে লাগল সে। তার খাওয়া দেখে টেকো ইশারায়

কাছে ডাকল। খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঢাকনা নিয়ে কাছে যেতে তাতে আর একটা রুটি আর একটু মাংস ফেলে দিল লোকটা।

দাঁড়িয়ে খাওয়া যাচ্ছিল না কারণ চলন্ত ট্রেনে শরীর দুলছিল। সে আবার মেঝেতে বসতে যাচ্ছিল কিন্তু টেকো হাত নেড়ে নিষেধ করল। ইশারায় গদিটা দেখিয়ে দিল। ভয়ে ভয়ে সুখী গদির ওপর বসতেই বেশ আরাম বোধ করল। এবার তৃতীয় রুটিটাকে মাংসের সঙ্গে রসিয়ে রসিয়ে খেল সে। টেকো এসে ওর হাত থেকে ঢাকনা নিয়ে দরজার কাছে চলে গেল। বাঁ দিকের নীচে রাখা কুঁজো তুলে ঢাকনায় জল ঢালল। তারপর খানিকটা মুখে নিয়ে কুলকুচি করে অন্ধকারে ছুড়ে দিল। ইশারায় কুঁজোটা দেখাল সুখিকে। জলের প্রয়োজন বোধ করায় সুখী এগোল। টেকো জল ঢেলে দিতে সে দু'হাত জড়ো করে কিছুটা জল খেতে পারল। কুঁজো রেখে দিয়ে কৌটোগুলো বন্ধ করল টেকো, সুখী লক্ষ করল শুধু তার খাওয়া ঢাকনাটাই টেকো জলে ধুয়েছে কিন্তু নিজেরটা ধোয়নি। একটু একটু করে সাহস বাড়ছিল সুখীর। মনে হচ্ছিল লোকটাকে যতটা খারাপ ভেবেছিল ততটা খারাপ নয়। তাকে চিমটি কেটেছিল বটে কিন্তু এখানে না আনলে এমন পা ছড়িয়ে বসতেও পারত না, অত সুন্দর খাবারের স্বাদও পেত না। এই যে সে বসে আছে, লোকটা তার দিকে তাকাচ্ছে না।

পেট ভরার পর টেকোমাথা মদের বোতল বের করল। এটা পেয়েছে সে তার মালিকের কাছ থেকে। খোদ বিলেতে তৈরি। এই যে এতগুলো লোককে সামলে নিয়ে যেতে হচ্ছে তাকে তার জন্যে মালিক কম তোয়াজ করেনি। টাকা তো আছেই, তিন বোতল মদও দিয়েছে। গ্লাসে মদ ঢালল সে। গন্ধ শুঁকল। আঃ। তারপর চুমুক দিতেই শরীর গরম হয়ে গেল। সুখীর দিকে তাকাল টেকোমাথা। এর আগে অল্পবয়সি মেয়েমানুষের সঙ্গে শুয়েছে সে। কিন্তু এই আদিবাসী অল্পবয়সি মেয়েগুলো তাকে

এত ভয় পায় যে কোনও সুখ হয় না। আজ বোধহয় সেই দুঃখ যাবে। গ্লাসটা ওপরে তুলে সে সুখীকে ইশারা করল, খাবে কিনা?

জিনিসটা কী তা বোঝা সুখীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বছরের অর্ধেক সময় যাদের দু'বেলা খাবার জোটে না তাদের পক্ষে নেশার পানীয় তৈরি করা অসম্ভব ব্যাপার। তবে বর্ষার পরে মাঠে ফসল তোলার সময় যে পরবের দিনটা আসে তখন ঘরে ঘরে হাঁড়িয়া তৈরি করা হয়। বাবাকে উৎসর্গ করে সেই হাঁড়িয়া পান করে বুঁদ হয়ে থাকে অনেকেই। হয়তো আরও এক-দু'বার কিন্তু সেই শেষ। আর সেই হাঁড়িয়া থাকে মাটির হাঁড়িতে, হাতা করে তুলে নিতে হয়। তার রংও ঘোলা জলের মতো। এই রকম সুন্দর বোতলে সোনালি রঙের পানীয় জীবনে দ্যাখেনি সুখী।

এই চলন্ত ঘরে এসে সুস্বাদু খাবার খাওয়ার পর থেকেই সুখীর মনে হচ্ছিল এখানকার সবকিছুই স্বপ্নের মতো। বোতলের ভেতর যেটা টলটল করছে, যা গ্লাসে ঢেলে টেকো একটু একটু করে খাচ্ছে তার স্বাদ নিশ্চয়ই খুব ভাল। টেকোমাথা তাকে আবার ইশারা করতে সুখী হেসে এগিয়ে গেল।

নিজের গ্লাসটা দিল না টেকোমাথা। আর একটা গ্লাস বের করে তাতে মদ ঢালল। তারপর গ্লাসটা এগিয়ে দিল সুখীর প্রসারিত হাতে। গ্লাস নিয়ে ফিরে এল সুখী গদিতে। বসে সন্তর্পণে চুমুক দিল। অদ্ভুত গন্ধ, ঝাঁঝ নেই কিন্তু গলা দিয়ে নামবার সময় শরীরটা গরম হয়ে গেল হঠাৎই। যেন একটা আগুনের গোলা জিভ থেকে পেটে নেমে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল। সুখীর মনে হল এটা নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান পানীয়। টেকো জল খায়নি। খাবার খাওয়ার পর, তার বদলে এটা খাচ্ছে। তার মানে জলের বিকল্প এই পানীয় যা বোতলে পাওয়া যায়।

টেকোমাথা ভাঙা ভাঙা শব্দে জিজ্ঞাসা করল, 'এ জিনিস আগে খেয়েছিস?'

সুখী হাসল, মাথা নেড়ে না বলল। দ্বিতীয়বার গলায় ঢালল আগের মতন গরম লাগল না শুধু কান দুটো ছাড়া।

টেকোমাথা বলল, 'তুই যদি ভাল হয়ে থাকিস তা হলে এরকম রোজ রাত্রে খেতে পাবি। দু'বেলা, দু'বেলা কেন, চারবেলা এত ভাল খাবার পাবি যা কোনওদিন চোখেই দেখিসনি। তোরা তো জামা পরিস না। ভাল জামা পাবি, শাড়ি পাবি। তা যদি না চাস তা হলে মেমসাহেবদের মতো গাউন পাবি। কিন্তু ওই নোংরা ভিখিরিদের সঙ্গে থাকা চলবে না। তোকে রোজ সাবান মাখতে হবে।'

'আমি কোথায় থাকব?'

'বাংলোয়। বাংলো বুঝিস? হা হা হা। বাগানওয়ালা কাঠের বাড়ি। বড় বড় ঘর। খানসামা, বাবুর্চি, মানে জানিস? সব জানবি। একসময় তুই মেমসাহেব হয়ে যাবি।'

'মেমসাহেব?'

'মেমসাহেব দেখিসনি কখনও?'

মাথা নাড়ল সুখী। তার গ্লাস শেষ হয়ে গেছে। এখন কথা বলতে ভাল লাগছে। টেকোমাথা আবার নিজের গ্লাসে মদ ঢেলে বোতলটা নিয়ে চলে এল সুখীর কাছে। খালি গ্লাসে কিছুটা ঢেলে দিয়ে বলল, 'খা, বিলিতি জিনিস খা।'

তারপর নিজের জায়গায় যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল টেকোমাথা। ট্রেন গতি কমাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেল অন্ধকারে। দরজায় গিয়ে টেকোমাথা চিৎকার করল! 'কী হয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গে পাশের ওয়াগনের প্রহরী রিলে করল প্রশ্নটা। পর পর প্রহরীদের মুখে মুখে সেটা পৌঁছে গেল ইঞ্জিনের ড্রাইভারদের কাছে। একজন জানিয়ে দিল অন্যজনের প্রাকৃতিক প্রয়োজন হওয়ায় নীচে নেমেছে ট্রেন থামিয়ে। উত্তরটা মুখে মুখে ফিরে আসতেই টেকোমাথা শব্দ করে

অন্ধকারে থুতু ছুড়ে দিল। তারপর হ্যারিকেনের দিকে তাকাল। দু'পাশের মাঠের পোকাগুলো উড়ে এসে আছাড়ে পড়ছে হ্যারিকেনের ওপর। ওরা বোধহয় এই প্রথম আলো দেখল।

দু'হাত নেড়ে তাদের তাড়াতে চেষ্টা করল টেকোমাথা। কিন্তু ক্রমশ তাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তারা নেমে আসছে টেকোমাথার শরীরে। তার তাড়নায় নাচতে লাগল সে। তারপর কোনওমতে নিভিয়ে দিল হ্যারিকেন। দৃশ্যটা দেখতে খুব মজা লাগছে। ওরকম জবরদস্ত মানুষ একেবারে ছেলেমানুষের মতো লাফাচ্ছে দেখে হেসে উঠেছিল। পোকাগুলো তার কাছেও আসছিল। আলো নিভে যাওয়ার পর যখন বাইরের সঙ্গে ঘরের অন্ধকার একাকার হয়ে গেল তখন টেকোমাথা চিৎকার করে উঠল। তার টাকে কিছু একটা এসে বসেছিল। সজোরে সেটাকে ছুড়ে ফেলতে হয়েছে। টেকোমাথার চিৎকার শুনে পাশের ওয়াগন থেকে নেমে একজন প্রহরী ছুটে এল, 'কী হয়েছে সাহেব?'

'আলো জ্বাল, টর্চ জ্বালা।' চিৎকার করল টেকোমাথা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীর হাতের টর্চ জ্বলে উঠল। ঘরের মধ্যে তার আলো পড়তেই বিশাল চামচিকেটা দেখতে পেল। পাক খেয়ে তার দিকেই উড়ে আসছে, কাবাডি খেলার মতো সেটাকে এড়াতে পারল টেকোমাথা। ততক্ষণে প্রহরীর আলো গিয়ে পড়েছে সুখীর ওপর। দু'পাত্র খাওয়ার পর এমন মজাদার দৃশ্য দেখতে দেখতে সুখীর নিজের কাপড় নিয়ে খেয়াল নেই। তার খোলা বুকেও আলো পড়ছে। ব্যাপারটা দেখে টেকোমাথা চিৎকার করল। 'অ্যাই ওখানে আলো ফেলছিস কেন? নিজের মায়ের ন্যাংটো শরীর দেখগে যা।' সঙ্গে সঙ্গে আলোর বৃত্ত চামচিকেটাকে ধরার চেষ্টা করল। টেকোমাথা বলল, 'সব শালা হারামজাদা। সারাজীবন যা খেয়েছে তাই এখন হেগে বের করছে।'

বলামাত্র ট্রেনটা দুলে উঠল, বাঁশি বাজল। প্রহরী পড়ি কি

মরি করে ছুটল তার জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্যে। ট্রেন চলছে। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া ঢুকল ঘরে। পোকাগুলো সেই হাওয়ার চাপ সহ্য করতে পারল না। টেকোমাথা যখন বুঝল আর আক্রমণের সম্ভাবনা নেই তখন আবার হ্যারিকেন জ্বালল। তারপর পোশাকের ভেতর ঢুকে যাওয়া পোকাগুলোকে খামচে খামচে বের করতে লাগল। তখনই চামচিকেটা ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যারিকেনের কাঁচে। তার ধাক্কায় দুলতে লাগল হ্যারিকেন। টাকে হাত বুলিয়ে টেকোমাথা ভাবতে লাগল কী করে প্রাণীটাকে মারা যায়। এখন আঘাত করতে হ্যারিকেনের কাচ ভেঙে যাবে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হ্যারিকেন ছেড়ে দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চলে গেল চামচিকে। সম্ভবত উত্তাপ সহ্য করতে পারেনি।

ঘুম পাচ্ছিল সুখীর। অনেকক্ষণ নীরবে হেসে কাহিল হয়ে পড়ায় মদের প্রতিক্রিয়া ঘুমটাকে নিয়ে এল আচমকা। সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল গদিতে। একটা আরামবোধ হওয়ামাত্র তার জ্ঞান চলে গেল। এত আরামের ঘুম সে কখনও ঘুমায়নি।

সম্পূর্ণ পোকামুক্ত হতে যে সময় লাগল তাতে টেকোমাথার নেশা চলে গিয়েছিল। সে গ্লাসে মদ ঢেলেই গালাগাল দিল। মদে পোকা ভাসছে। আঙুল দিয়ে পোকাগুলোকে তুলে ফেলে চুমুক দিতেই বুনো গন্ধ নাকে এল। পোকাদের শরীরের গন্ধ। একবার ভাবল খাওয়া ঠিক হবে কিনা! কিন্তু এত দামি মদ ফেলে দিতেও ইচ্ছে হল না। জামাটা খুলে ফেলল টেকোমাথা। ঠান্ডা বাতাস তাকে আরাম দিল। অনেকটা মদ একসঙ্গে গিলে সে বলল, 'মেমসাহেব! কপাল থেকে পা পর্যন্ত সাদা শরীর। মাথার চুল কারও লালচে, কারও কালো। লম্বা লম্বা শরীর। সুন্দর শরীর। তোদের মতো কালো না। আমি অবশ্য কোনও মেমসাহেবের শরীর দেখিনি। কিন্তু খাটো গাউন পরা মেমসাহেবের পা দেখেছি। যার কাছে তোদের নিয়ে যাচ্ছি তার আবার সাদা মেমসাহেব ভাল লাগে না। সে-ও সাহেব।

বুঝলি?' মুখ ফেরাল টেকোমাথা। তার চোখ ছোট হয়ে গেল। সুখী ঘুমাচ্ছে। শুধু কোমরের কাছে কাপড় লুটিয়ে আছে ওর, বাকি আঁটোসাঁটো শরীরটায় আলো পড়ায় কী রকম চনমনে দেখাচ্ছে। টেকোমাথা বাকিটা গলায় ঢেলে বলল, 'আশ্চর্য! শালারা খেতে না পেয়ে মরে, বিক্রি হয়ে গেল খাবারের জন্যে অথচ শরীর এরকম থাকে কী করে! শ্বাসের তালে তালে সুখীর বুক নড়ছিল। টেকোমাথার মনে হল তাকে ডাকছে সুখী, আয়, আয়।

ভোর হচ্ছিল পৃথিবীতে। ট্রেনটা মাঝে কয়েকবার থেমেছিল প্রয়োজনে।

সারারাত ঢুলেছে ওরা ওয়াগনে ওয়াগনে। আলো ফুটতেই দেখল সবুজ আর সবুজ। এ অন্য রকমের সবুজ। আরও গাঢ়। দু'পাশে জঙ্গল আর মাঠ। হঠাৎ কেউ চেঁচিয়ে আকাশ দেখাল। আকাশের গায়ে রেখা। ওটা যে পাহাড় তা বুঝতে সময় লাগল। পাহাড়টা অবশ্য অনেক দূরে।

'আমরা বোধহয় পাহাড়ে যাচ্ছি।' কেউ একজন বলল।

সবাই শুনল, কেউ জবাব দিল না। হঠাৎ এতোয়া চেঁচিয়ে উঠল। আগের ওয়াগনের কেউ দ্যাখেনি, একপাল হরিণ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে রেলগাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। 'অনেকটা ছাগলের মতো দেখতে।' 'না না ঘোড়ার মতো।' 'দূর, ঘোড়ার কি শিং হয়।' 'এগুলো রঙিন বড় ছাগল।' মন্তব্যগুলো শেষ হওয়ার আগেই ট্রেন হরিণদের পেছনে ফেলে দিল।

গাঁওবুড়ো ঘুমাচ্ছিল। রাত্রে তার আর পেট কামড়ায়নি। এখন চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যেতে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল। তারপর চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে বউকে খুঁজতে লাগল। সব পরিচিত মুখ শুধু সুখীকে সে দেখতে পাচ্ছিল না।

সে ওঠার চেষ্টা করতেই পাশের লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! উঠছ কেন? মাথায় লাগছে, উঠবে না।'

'সুখী, সুখী কোথায়?'

গাঁওবুড়োর গলায় এমন একটা আর্তি ছিল যে অনেকেই হেসে উঠল। তারপর তারা সুখীকে লক্ষ করতে চাইল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বোঝা গেল সুখী নেই এই ওয়াগনে। মাংরা বলল, 'সর্বনাশ তা হলে কি সুখী অন্ধকারে উঠতে পারেনি?'

দুখন বলল, 'সবাই তো উঠেছে। হয়তো ভুল করে অন্য ওয়াগনে চলে গেছে।'

এই ভুল হওয়াটা যে খুব স্বাভাবিক তা সকলে মেনে নিলেও গাঁওবুড়ো তা মানতে পারল না। এত লোকের ভুল হল না শুধু সুখীর হল? ভুল হলে পাশের ওয়াগনে নিশ্চয়ই উঠবে। সে সোমরাকে বলল পাশের ওয়াগনে খবর নিতে।

সোমরা মাথা নাড়ল। ট্রেনের শব্দ এত যে পাশের ওয়াগনে তার গলা পৌঁছাবে না। এখানেই চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে।

গাঁওবুড়ো বলল, 'তা হলে পাহারাদারকে বল না। ও শুনতে পাবে।'

মাংরা বলল, 'চুপ করো তো। পাহারাদারকে বললে চাবুক খেতে হবে। তোমার বউ তোমার চেয়ে অনেক চালাক, ও হারাবে না।'

গাঁওবুড়ো কিছু বলতে পারল না। আসার আগে সুখী তাকে বুঝিয়েছে নতুন জায়গায় গিয়ে সব কাজ সে করবে, বুড়োকে পরিশ্রম করতে হবে না। সুখী যদি হারিয়ে যায় তা হলে সে অসহায় হয়ে যাবে। নতুন জায়গায় গিয়ে মরার থেকে নিজের দেশের মাটিতে মরা ঢের ভাল। ওর মন বলছিল সুখীকে আর পাওয়া যাবে না।

ভোর হতেই সুখীর ঘুম ভেঙেছিল। দুদ্দাড় করে উঠে বসে শরীর কাপড়ে ঢাকল। তার পাশে টেকোমাথা হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। ভয়ংকর নাক ডাকছে। ছুটন্ত ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডেকে যাচ্ছে। লোকটা নগ্ন। সুখী চোখ বন্ধ করল। কাল রাত্রে

তার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু শরীরে যখন বিস্ফোরণ ঘটেছিল তখন চেতনায় ফিরেছিল। এক অপূর্ব তৃপ্তির স্বাদ পেতে পেতে সে বুঝেছিল খুব অন্যায় করছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে অন্যায় করতে তার ভাল লেগেছিল। ওই টেকোটা তাকে ভাল খাবার, ভাল পানীয় শুধু দেয়নি তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেছে। তারই ঘোরে সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন আলো ফুটতেই তার ঘুম ভেঙে গেছে। এবং তখনই মনে ভয় জাগছে, গাঁওবুড়ো জানলে কী করবে?

গ্রামে এরকম ঘটনা ঘটলে মেয়েটির স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে ওকে স্ত্রী হিসেবে আবার গ্রহণ করতে রাজি আছে কিনা। থাকলে গ্রামের সবাইকে একবেলা খাওয়াতে হবে। যদি না রাজি হয় তা হলে অপরাধী ছেলে এবং মেয়েকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়। বর্ষার সময় এক কথা, কিন্তু অন্য সময়ে গ্রামের সবাইকে এক বেলা খাওয়ানোর ক্ষমতা কারও থাকে না। তাই ইচ্ছে থাকলেও স্বামীকে না বলতে হয়। অবশ্য তেমন পরিস্থিতি না হলে কোনও স্বামীই ঘটনাটা প্রকাশ্যে আনে না, কোনও অভিযোগ জানায় না। তাই স্বামীর বাইরে সম্পর্ক স্থাপন করেও অনেকে দিব্যি চালিয়ে গেছে। একই ব্যবস্থা স্বামীদের ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু স্বামী গ্রাম থেকে বিতাড়িত হলে স্ত্রীর একার পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব বলে স্ত্রীরা প্রকাশ্যে অভিযোগ করে না।

কিন্তু সুখী খুব দ্রুত অপরাধবোধ কাটিয়ে উঠল। চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে সে সবুজ গাছপালা, পরিষ্কার নীল আকাশ আর দূরের পাহাড় দেখতে দেখতে ভাবল, সে তো আর খরার গ্রামে নেই। গ্রামের আইন এখানে চলবে কেন? চললেও মানবে কেন? এই যে গতকাল সোমরার শরীরের সঙ্গে চেপে বসতে বাধ্য হয়েছিল সে তাতে তো কেউ অন্যায় হয়েছে বলেনি। গ্রামে হলে ওভাবে বসতে পারত?

এইসময় টেকোমাথার ঘুম ভাঙল। শব্দ করে শরীরের

জড়তা ভেঙে উঠে দাঁড়িয়ে সে সুখীর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল, 'ফার্স্ট ক্লাস।'

শব্দটার মানে বুঝতে পারল না সুখী কিন্তু অভিব্যাক্তি দেখে তার মনে হল টেকো ভাল কথা বলছে। তাই জবাবে সে হাসল।

টেকো মুখ ধুল। কুলকুচি করে জল বাইরে ফেলল। তারপর খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জলবিয়োগ করল। সুখী পুরো ব্যাপারটা অবাক চোখে দেখল। এরকম কাণ্ড তাদের গাঁয়ে বাচ্চারাই করে। লোকটার কি খেয়াল নেই যে বুড়ো হতে চলেছে।

একটা গ্লাসে জল ঢেলে এগিয়ে দিল টেকো। তেষ্টা পেয়েছিল সুখীর। বর্ষার সময় ছাড়া সাতসকালে এতটা জল পাওয়া স্বপ্নের চেয়ে দূরের ছিল। সে জলটা খেয়ে নিল। খালি গ্লাসে আর একটু জল ঢেলে টেকো বলল, 'মুখ চোখ ধুয়ে ফ্যাল।'

আদেশ মান্য করল সুখী। আর, মুখ ঠান্ডা হল।

খাবারের বাটি বের করল টেকোমাথা। নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকল। তারপর খানিকটা মাংস আর একটা রুটি সুখীকে দিয়ে নিজে খেতে শুরু করল! 'আর বেশি দেরি নেই। আমরা পৌঁছে যাব, বুঝলি। তুই কোথায় থাকবি? ওদের সঙ্গে না বাংলোয়?'

'যা হুকুম হবে।' খেতে খেতে বলল সুখী। আঃ, খাবারটা কী ভাল।

'তুই যা জিনিস তাতে তোর ওদের সঙ্গে থাকা ঠিক না। রোজ রোজ তো বাংলোয় আসতে পারবি না। তার চেয়ে তোকে বাংলোতেই চাকরি দেব। এই পরিষ্কার টরিষ্কার করবি। কিন্তু তার আগে তোকে সহবত শিখতে হবে। আমাদের কথা বুঝতে হবে। সকালে উঠে বলতে হবে, গুড মর্নিং। বল, 'গুড মর্নিং।' টেকো তাকাল।

'গু মর্নিং।'

'না। গুড—!'

'গুড।'

'মর্নিং। গুড মর্নিং। বল।'

'গুড মর্নিং।'

'বাঃ। ঠিক তো পারলি। তুই ওই গ্রামে পড়ে থাকলে কী অপচয় হত? তোকে আরও অনেক কিছু শিখতে হবে। ওই কাপড় পরা চলবে না। বাংলোতে যারা কাজ করবে তাদের হুকুম করতে শিখতে হবে।'

'আমি হুকুম করব?' সুখী অবাক।

'কেন করবি না। মালিকের সঙ্গে যে শোবে সে চাকরদের হুকুম করবে না?'

'কিন্তু আমার বর?' সুখী তাকাল।

'এর মধ্যে বর আসছে কোত্থেকে?'

'আমি না থাকলে ও মরে যাবে। বুড়ো মানুষ।'

টেকোমাথা সুখীর দিকে পিটপিট করে তাকাল। একটু ভাবল। তারপর মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে তোর বরও থাকবে। বাংলোর বাগানের কাজ করবে। কিন্তু খবরদার ওপরে যেন না ওঠে। দু'বেলা তোকে দেখতে পাবে এতেই যেন শান্তি পায়।'

'খাওয়া?'

'সব বাংলো থেকে পাবে। অন্যদের থেকে অনেক আরামে থাকবে।' খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। জল খেয়ে মুখ ধুল টেকো মাথা। তারপর প্রায় তলানির জল সুখীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নে, মুখ ধো, নইলে তোর মুখে সাহেব পচা গন্ধ পাবে।'

'সাহেব? সাহেব কে?'

'গোরা সাহেব। বিলিতি মাল। তার কাছে তুই থাকবি।'

'তুই—?' অবাক হয়ে গেল সুখী।

'আরে আমি তো ওর দালাল। তোদের মতো মানুষদের নিয়ে এসে টাকা কামাই।' হ্যা হ্যা শব্দ করল টেকোমাথা।

তলানির জলে কুলকুচি করতে করতে সুখী বুঝতে পারল তার এখন জলের প্রয়োজন। সে গিলে ফেলল।

দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে গেল। ট্রেনটা এসে থামল একটা নদীর পাড়ে। সেখানে টিনের চালওয়ালা স্টেশন। তার গায়ে লেখা রয়েছে নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে। স্টেশনের বাইরে তখন বেশ কয়েকটা ভয়ংকর চেহারার জিপ। পাঁচজন সাদা চামড়ার মানুষ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। তাঁদের পরনে খাঁকি পোশাক, হাফপ্যান্টের ওপর দুটো পকেটওয়ালা শার্ট। হাতে পাইপ অথবা চুরুট। ওয়াগনগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল সেখানে কয়লা বোঝাই হয়ে আছে।

মিস্টার প্যানডার খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'বেশি মানুষ আনতে পারোনি দেখছি।'

মিস্টার হেগ শব্দ করে হাসলেন, 'ইউ কল দেম ম্যান?'

মিস্টার উইনড্রাম বললেন, 'বলতেই হবে। আমাদের মতো হাত পা মাথা ওদেরও আছে।'

মিস্টার হেগ একটা বিরক্তিসূচক শব্দ তৈরি করলেন।

এইসময় টেকোমাথাকে দেখা গেল কাগজপত্র বগলে করে দ্রুত এগিয়ে আসতে, সামনে এসে সে কপালে হাত ছুঁইয়ে স্যালুট করল, 'গুড মর্নিং স্যার।'

মিস্টার প্যানডার বললেন, 'গুড মর্নিং। এবার কত লোক এনেছ?'

টেকোমাথা জবাব দিল 'থ্রি হান্ড্রেড ম্যান, টু হান্ড্রেড নাইনটি ওম্যান, ফোর হান্ড্রেড চিলড্রেন স্যার।'

মিস্টার হেগ হাত বাড়ালেন, 'লেট মি সি দ্য পেপার্স।'

টেকোমাথা তাঁর হাতে সব কাগজ তুলে দিল। সেগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে মিস্টার হেগ ইংরেজিতে বললেন, 'সংখ্যা যদি কম হয় তা হলে একটা টাকাও পাবে না তুমি।'

'নো স্যার। নো রং। একদম কারেক্ট।'

সাহেবদের পেছনে কয়েকটি লোক দাঁড়িয়ে ছিল দূরত্ব রেখে। তারা বিশ্বস্ত কর্মচারী। বাঙালি। মিস্টার উইনড্রাম তাদের আদেশ করলেন মাথা গুনতে। ওয়াগনেই থাক ওরা, সেখানেই গোনা হোক।

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হল ওরা। টেকোমাথা ওদের সঙ্গে এগোতে চাইলে তাকে বাধা দিলেন মিস্টার হেগ, 'ইউ স্টে হিয়ার। লোকগুলোকে আনতে কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'নো স্যার। খুব পুয়োর। খেতে পায় না। খাবার, জল, থাকার লোভ দেখাতেই রাজি হয়ে গেল সবাই। তারপর সপ্তাহে এক পয়সা করে নগদ পাবে যা কেউ ভাবেইনি।' টেকোমাথা বিগলিত হল।

হেগ বিরক্ত হলেন, 'পয়সার কথা ওদের বলতে গেলে কেন?'

প্যানডার মাথা নাড়লেন, 'নো। ওরা যখন চা বাগানের কর্মচারী হবে তখন ওদের মাইনে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। মাইনে না দিলে লোকে ভাববে আমরা ওদের স্লেভ হিসেবে ট্রিট করছি। হইচই শুরু হয়ে যাবে।'

কর্মচারীরা মাথা গুনছিল। প্রতিটি ওয়াগনের পুরুষ নারী এবং বাচ্চাদের আলাদা করে গুনে যোগ করে এনে ওদের একজন মিস্টার হেগকে কাগজটা দিল। হেগ সেটা দেখে বললেন, 'তুমি বলেছ টু হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান। তাই তো?'

'ইয়েস স্যার।'

'নো। একটা বাড়িয়ে বলেছ তুমি। এখানে আছে টু হান্ড্রেড নাইনটি। এই একটা বাড়িয়ে বলার জন্যে তোমাকে পেনাল্টি দিতে হবে।' হেগ গম্ভীর গলায় বলেন।

প্যানডার বললেন, 'এরকম বোকামি কেন করো তোমরা আমি বুঝতে পারি না। মাথা গুনলেই যখন ধরা পড়ে যাবে তখন বাড়িয়ে বলে কী লাভ? যাচাই না করে কি তোমাকে টাকা

দেওয়া হবে?'

'না স্যার, এরকম ভুল হতেই পারে না।'

'তা হলে রাস্তায় কোনও মেয়ে পালিয়ে গিয়েছে বলছ?' হেগ জিজ্ঞাসা করলেন?

'আমি— আমি—।' হঠাৎ মনে পড়ে সুখীর কথা। সুখী ওয়াগনে নেই বলে এরা ওকে গুনতিতে পায়নি। কিন্তু সুখী কেন ওয়াগনে নেই এই প্রশ্নের জবার দিতে গেলে বিপদে পড়বে। সকালে যখন একবার ট্রেন থেমেছিল তখনই ওকে ওয়াগনে চালান করা উচিত ছিল।

অন্য চারজন তখন আগন্তুকদের পর্যবেক্ষণ করতে এগিয়েছেন। হেগ পা বাড়াচ্ছেন যখন তখন টেকোমাথা তাঁকে বলল, 'স্যার। আমার ভুল হয়নি। আর একজনকে আমি ওয়াগনে না রেখে সেলুনে রেখেছি।'

'সে কী? কেন?' হেগ অবাক।

'আমি স্যার ওকে আপনার জন্যে এনেছি। বাংলোতে আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে বলে শুনেছিলাম। তাই ওকে দল থেকে প্রথম থেকেই সরিয়ে এনেছি।'

'আচ্ছা। চলো, দেখাও ওকে।'

হেগ সাহেবকে নিয়ে নিজের কামরায় সামনে চলে এল টেকোমাথা। তারপর হাততালি দিয়ে ডাকল, 'অ্যাই, বাইরে আয়।'

সুখী এল।

হেগ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নট ব্যাড। কিন্তু শি মাস্ট বি অ্যারাউন্ড থার্টি। অল্পবয়সি কেউ নেই?'

'স্যার, শি ইজ মোর দ্যান অল্পবয়সি।'

'হাউ ডু ইউ নো? ডিড ইউ স্ক্রু হার?'

'নো স্যার, নো স্যার। শি ইজ ইয়োর প্রপার্টি।'

হেগ মাথা নেড়ে কামরার ভেতর উঠে গিয়ে সুখীর শরীরে হাত বুলিয়ে যৌবন মাপতে চাইলেন। সুখী এমন আক্রমণে

বিব্রত হয়ে বিদ্রোহ করল। সপাটে একটা চড় মারলেন হেগ। পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল সুখী। তার চুলের মুঠি ধরে ওপরে তুলে বললেন হাঁ করতে। ভাঙা হিন্দি বুঝতে পেয়ে হাঁ করল সুখী। জিভ এবং দাঁত দেখে মুঠো থেকে চুল ছেড়ে দিয়ে নীচে নামলেন লাফিয়ে, 'গুড থিং। কিন্তু অনেক সাবান দরকার। কাউকে বলো ওকে আমার গাড়িতে বসিয়ে দিতে।'

'স্যার!' টেকোমাথা টাক চুলকালো।

'ওকে! ওকে! নো পেনাল্টি।' হাঁটল হেগ।

'নো স্যার। আর একটা রিকোয়েস্ট। প্লিজ ডু মার্সি।'

'কী ব্যাপার?' হেগের মুখে সন্দেহ।

'ওর হাসব্যান্ড একজন হাফ ওল্ডম্যান। সুখীর জন্যেই ওকে আনতে হয়েছে। কিন্তু লোকটাকে অন্যদের সঙ্গে রাখা ঠিক না। ওকে যদি সরিয়ে এনে আপনার নিজের ফুলবাগানের কাজে লাগান তা হলে সব ঠিক থাকে। এটা সুখী চাইছে।'

'সুখী?' গুড। কিন্তু ওরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলবে না।' হেগ হাঁটতে আরম্ভ করলেন। টেকোমাথা বলল পেছনে যেতে যেতে, 'নো স্যার। শুধু দেখতে পেলেই সুখী খুশি হবে।'

নদীর নাম তিস্তা, বর্ষায় ভয়ংকর, সমুদ্র দেখার বাসনা মেটায়। শীতে জল কমতে শুরু করে, বালি শুকোয়। আর এই সময় দোমহনীর দিকে দেড়শো গজ জায়গা জুড়ে স্রোত বয়ে যায়। জলের গভীরতা কমে যায় খুব। আর বাকি চরে জেগে ওঠে কাশের বন, কাঁটা ঝোপ। হাওয়ায় জোর বাড়লে বালি ওড়ে।

গাড়িগুলো ধুলো উড়িয়ে বালির ওপর দিয়ে টলতে টলতে চলে এল সেখানে যেখানে জল একটু গভীর। দুটো নৌকো পাশাপাশি বেঁধে তার ওপর কাঠের পাটাতন চাপিয়ে গাড়ি তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে জল বেশি থাকায় নৌকো চলাচল করতে পারছে। এক একবারে একটি করে গাড়ি, তাই

সময় লাগবে। একেবারে শেষ গাড়িটায় বসেছিল সুখী। তার চোখে সবকিছু নতুন এবং অদ্ভুত লাগছিল। এই প্রথম সে চার চাকাওয়ালা যন্ত্রের গাড়িতে চেপেছে। ট্রেনযাত্রাও তো প্রথম কিন্তু দু'রাত গোটা দিনে সে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ওই স্টেশন থেকে নদী পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে এনেছে সেই সাদা সাহেবটা যে পশুর মতো তার শরীর মেপেছিল। গাড়ি চালানোর সময় লোকটা একটা কথাও বলেনি তার সঙ্গে। সাদা চামড়া, লালচে চুল, প্রবল স্বাস্থ্যের ওই পুরুষটি নিশ্চয়ই ইংরেজ রাজার কেউ হবে। লালমোহন তেলি বলেছে ইংরেজ রাজা তাদের কষ্ট দেখে উপকার করতে জল এবং খাবারের দেশে নিয়ে যাবে। কিন্তু উপকার করার বিনিময়ে শরীরে হাত দেবে তা বলেনি। বরং টেকোমাথা লোকটা ভাল ছিল। এই লোকটাই তা হলে সেই গোরাসাহেব যার কথা টেকোমাথা বলেছিল। গোরাসাহেব, বিলিতি মাল। এর কাছেই তাকে থাকতে হবে। যেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে গিয়ে হুকুম করা শিখতে হবে। শব্দটা মনে করতে চেষ্টা করল সুখী। গুড-গুড। কী যেন বাকিটা? শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল। বহুদূরে বালির ওপর একটা কালো সাপের মতো কী যেন? গোরাসাহেব নেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আরও কয়েকটা গোরা সাহেবের সঙ্গে কী সব কথা বলছে। কথা শেষ করে গোরাসাহেব ফিরে এল গাড়িতে। সুখী সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল। পেছনের সিটে শরীর ঢেকে বসে রইল।

হেগসাহেব সেদিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না। জিপ চালু করে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল নদীর গা দিয়ে। তারপর বাঁ দিকে ঘুরে গাড়ি ছোটাল স্টেশনের দিকে।

অতদূর থেকে সুখী যাকে সাপ বলে ভেবেছিল কাছাকাছি হতে বুঝল ওটা মানুষের লাইন। ওয়াগনগুলো থেকে নামিয়ে লাইন করিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে বালির চরে হাঁটিয়ে। দু'পাশে

রক্ষীরা আছে চাবুক হাতে। টেকোমাথা সবার সামনে। হেগের জিপ কাছে যেতেই টেকোমাথা কপালে হাত ছুঁইয়ে সেলাম করে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াল লাইনটাও। হেগ চিৎকার করে বললেন, 'বাঁ দিক ধরে এগোও। ওখানে জল কম আছে। ফলো মাই জিপ।' মাথা দুলিয়ে টেকোমাথা হাঁটতে শুরু করলে লাইন এগিয়ে চলল। হেগ মানুষগুলোকে জরিপ করা জন্যেই জিপ সরালেন না। তাই পেছনে বসে সুখী ওদের দেখতে পেল। দু'রাত একদিন ওয়াগনে কষ্ট করে বসে থাকার পর এখন বালির ওপর হাঁটতে ওদের যে কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারছিল সে। কিন্তু এখন যারা তার সামনে দিয়ে হাঁটছে তারা অচেনা। অন্য গাঁয়ের মানুষ এরা। সুখী বুঝতে পারল হাঁটতে হাঁটতে সবাই তার দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছে। অবশ্য ঠিক তার দিকে না গাড়িটার দিকে তাতে তার সন্দেহ হচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখের সামনে ওরা চলে এল। গ্রামের সব মানুষ দুখন, মাংরা, সোমরা, শনিচর, ফুলিয়ারা। ওরাও দেখতে পেয়েছে তাকে। জিপে বসে থাকতে দেখে এত অবাক হয়ে গেছে যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কেউ কেউ। তখনই প্রহরীদের চাবুকের শব্দ হাওয়ায় ছড়িয়েছে। লোকগুলো আবার হাঁটতে শুরু করেছে কিন্তু মুখগুলো সুখীর দিকে ঘোরানো। এইসময় গাঁওবুড়োকে দেখতে পেল সুখী। এই দু'দিনেই লোকটাকে আরও বুড়ো আরও কাহিল দেখাচ্ছিল। টলতে টলতে হাঁটছে। কেউ তাকে বলতেই সে চোখ ফিরিয়ে সুখীর দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড। তারপরেই কাপড়ের পুঁটুলিটাকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সুখীর বুকের ভেতরটা ছটফট করতে লাগল। মানুষটাকে সে এর আগে কখনও কাঁদতে দ্যাখেনি। ইচ্ছে হচ্ছিল জিপ থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে। গাঁওবুড়ো লাইন ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসছিল জিপের দিকে। অন্যরা হাঁটছে। একজন প্রহরী ছুটে এসে গাঁওবুড়োর হাত ধরে টান

দিতেই লোকটা বালির ওপর পড়ে গেল।

হেগসাহেব ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন, এবার সুখীর মুখের দিকে তাকালেন। সুখী তখন সিটে বসেই চিৎকার করে কাঁদছে।

'হু ইজ হি?' হেগসাহেব চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন সুখীকে।

প্রশ্নটা বুঝতেই পারল না সুখী, তার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে কান্নার দমকে। এইসময় টেকোমাথাকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল সামনে থেকে। দূর থেকে সে দেখেছিল একটা মানুষ বালিতে পড়ে গেছে। মরে গেলে তার প্রাপ্য থেকে একটা মানুষের দাম কাটা যাবে। কাছে এসে যখন বুঝল মরেনি তখন একটু আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এনি প্রব্লেম স্যার? আমি কি ব্যাপারটা দেখতে পারি?'

'হু ইজ হি?' দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেন হেগসাহেব।

ঝুঁকে গাঁওবুড়োর মুখ দেখে টেকোমাথা সুখীর দিকে তাকাল। সুখী এখনও কাঁদছে কিন্তু শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

'হার হাসব্যান্ড স্যার।'

হেগসাহেবের মনে পড়ল টেকোমাথা এর কথাই বলেছে। তিনি মাথা নাড়লেন। মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'এরকম দৃশ্য আমি দ্বিতীয়বার দেখতে চাই না। ওকে হাঁটতে বলো।'

টেকোমাথা গাঁওবুড়োকে বালি থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে বলল, 'এখন দলের সঙ্গে হাঁটো, পরে তোমার বউয়ের কাছে গিয়ে থাকবে।'

টেকোমাথার দিকে অবিশ্বাসী চোখে তাকাল গাঁওবুড়ো। তারপর মাথা নিচু করে লাইন ছাড়া হাঁটতে শুরু করল। প্রহরী ছুটে গিয়ে তাকে লাইনে ঢুকিয়ে দিল। হেগসাহেব গাড়ি চালু করলেন। ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত চলে এলেন নদীর ধারে। সেখানে অন্য সাহেবরাও পৌঁছে গেছেন। মিস্টার প্যানডার বললেন, 'তোমার কি মনে হয় ওরা নদী পার হতে পারবে? কেউ সাঁতার

জানে বলে তো মনে হয় না।'

মিস্টার উইনড্রাম মাথা নাড়লেন, 'এদিকে নৌকো যখন আসে না তখন জল কম।'

টেকোমাথা মিছিল নিয়ে নদীর ধারে পৌঁছালে হেগ বললেন, 'জল বেশি নেই। ওদের বলো হেঁটে পার হতে। ভয়ের কিছু নেই।'

টেকোমাথা জল দেখল। তারপর বলল, 'স্যার। এরা সাঁতার জানে না। এত কষ্ট করে এদের নিয়ে এলাম, কেউ ডুবে গেলে বা ভেসে গেলে আপনি কিন্তু টাকা কাটবেন না।'

'নো।' হেগ মাথা নাড়লেন, 'তোমার সঙ্গে কনট্রাক্ট হয়েছে তুমি স্পটে এদের পৌঁছে দেবে। আমরা তো ভদ্রতা করে এতদূরে এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে।'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে বাচ্চারাও আছে।' টেকোমাথা চোখ পিটপিট করল।

'এটা তোমার হেডেক।' হেগসাহেব হাসলেন।

অতএব পায়ের জুতো খুলতে হল টেকোমাথাকে। তারপর শার্ট-প্যান্ট। সেগুলোর দায়িত্ব একজন প্রহরীকে দিয়ে অন্তর্বাস পরে সে জলে নামল। দু'পা যেতেই জল কোমরে চলে এল। বেশ ঠান্ডা জল। সোজা গেলে জল বুকে পৌঁছে গেল। আর একটু হাঁটতেই নাক বরাবর চলে আসবে। সে পিছিয়ে গেল খানিকটা। তারপর বাঁ দিকে হাঁটতে লাগল। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় একটা রাস্তা খুঁজে পেল যেখান দিয়ে হাঁটলে জল কোমরের ওপর উঠবে না। কিন্তু রাস্তাটা যেহেতু জলের তলায় তাই ওপর থেকে যাতে বোঝা যায় তার জন্যে কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়। আশেপাশে কোনও লম্বা কাঠ বা বাঁশ নেই। আবার এপার দিয়ে এসে টেকোমাথা দশজন শক্ত সমর্থ পুরুষকে বেছে নিয়ে ওর সঙ্গে জলে নামতে হুকুম দিল। জলে নামার আনন্দে কেউ আপত্তি করল না। লোকগুলোকে খুঁটির মতো বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করিয়ে সে প্রহরীদের নির্দেশ দিল

লাইনটাকে জলে নামাতে। দশজন লোক জলে দাঁড়িয়ে আছে স্রোত ঠেলে। জল তাদের কোমর পর্যন্ত উঠেছে। অনেক বকাঝকার পর ইতস্তত ভাবটা দূর করা গেল। লোকগুলো জলে নামল। একজন আর একজনের হাত ধরেছে, অন্য হাতে সম্পত্তি মাথার ওপর। যাদের সঙ্গে বাচ্চা আছে তারা তাদের তুলে নিয়েছে কাঁধে। একটু বড় যারা, যাদের কাঁধে নেওয়া যায় না তাদের নাক ছুঁয়ে যাচ্ছিল জল। এক হাতে তাদের ভাসিয়ে রাখতে হচ্ছিল।

এতোয়া যখন জলের তলায় চলে যাচ্ছে তখন সোমরা ওর হাত ধরেছিল। ছেলেটা রোগা, খাটো। শেষ পর্যন্ত ওকে পিঠে তুলে নিল সোমরা। গাঁওবুড়ো জলে পড়ে গেল, দুখন তাড়াতাড়ি টেনে তুলে হাঁপাতে লাগল। নদীর বুকে কালো বেঁকা লাইন চলছে। প্রথম লোকটা ওপারে উঠল যখন তখন শেষ লোকটা এপারে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ চিৎকার উঠল। একটা শিশু জলে পড়ে গেছে। তার মা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খুঁজছে। চকিতে ভেসে যাওয়া শিশুকে দেখতে পেয়ে সে মরীয়া হয়ে লাইন ছেড়ে এগিয়ে যেতেই ঝুপ করে ডুব জলে চলে গিয়ে ওপরে হাত ছুড়তে লাগল। মেয়েটা ডুবছে ভাসছে, খাবি খাচ্ছে। একজন প্রহরী সাঁতরে গিয়ে মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে ফিরিয়ে আনল লাইনে যেখানে জল কোমরে। মেয়েটার চোখ ঠিকরে কোটর থেকে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। শ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন, যেন বুকে কিছু আটকে আছে। এইসময় তার ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। কিন্তু তা নিয়ে সে বিব্রত নয়। ভাবছেই না। হাত বাড়িয়ে শিশুকে খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কাঁদছে কিন্তু গলা থেকে কোনও শব্দ বের হচ্ছে না। প্রহরী তাকে টানতে টানতে শেষ পর্যন্ত এপারে নিয়ে আসতে পারল। বালিতে এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেয়েটা। সবাই ওকে দেখছে কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছে না। এমনকী মেয়েটির স্বামীও না।

অঘটন আর না ঘটিয়ে বাকি দলটা এপারে চলে আসতে পারল। ওপাশে তখন হেগসাহেবের গাড়ি ছাড়া বাকিগুলোকে পার করে দিয়েছে নৌকো।

নিজের গাড়ি নৌকোয় তুলে হেগসাহেব চিৎকার করলেন, 'গেট ডাউন।'

সুখী নির্বাক। এতক্ষণ যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল তাতে তার কথা বলার ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। বাচ্চাটাকে স্রোত কোথায় নিয়ে গেল, মেয়েটাও মরে যেত যদি তাকে বাঁচানো না হত। কিন্তু কেউ বাচ্চার খোঁজ করছে না।

হেগসাহেব ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি হিন্দি শব্দ শিখে নিয়েছেন। মনে করে তার কিছু প্রয়োগ করলেন, 'উতরাও, নামো।" সেই সঙ্গে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। সুখী বুঝতে পেরে ধড়মড় করে নেমে এল নৌকোর ওপর। নৌকো পাড় ছাড়ল।

এপারে তখনও মেয়েটা কাঁদছে। টেকোমাথা বিরক্ত হল। এত কান্নার কী আছে? ওদের গাঁয়ে না খেয়ে তো কত বাচ্চা মরে যায়। সে কাছে গিয়ে ধমকাল, 'চুপ কর। একটা হাড় জিরজিরে বাচ্চা মরেছে তো কী হয়েছে, ক'মাস বাদে তোর যে বাচ্চাটা হবে তার স্বাস্থ্য দেখবি, হ্যাঁ!'

মেয়েটা সম্ভবত ভয় পেয়েই চুপ করে গেল। গাঁওবুড়ো বসেছিল দ হয়ে। তার কাছে গিয়ে টেকোমাথা বলল, "একটু শক্ত হও বুড়ো। ওই দ্যাখো, তোমার বউ সাহেবের সঙ্গে নৌকো করে নদী পার হচ্ছে। এক ফোঁটা জলও গায়ে লাগছে না। তোমার তো খুশি হওয়া উচিত। সুখীর সুখ হওয়া মানে তো তোমার সুখ।' গাঁওবুড়ো নিঃশব্দে শ্বাস ফেলল।

টেকোমাথা খুশি। একটা বাচ্চা ভেসে যাওয়ায় তার কোনও লোকসান হয়নি, ওইটুকুনি বাচ্চা মাথা গুনতিতে ছিল না। ওটার জন্যে সাহেব কোনও টাকা কাটবে না। ওপাশে হেগসাহেবের গাড়ি ততক্ষণে নৌকো ছেড়ে নেমে গেছে

বালিতে। ভাঁজ করা চেয়ার পেতে বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে সাহেবদের কর্মচারীরা। তিনজন সাহেব মদ্যপান করছেন বোতল থেকে সরাসরি। বাকি দু'জন খাচ্ছেন না। টেকোমাথা সেখানে পৌঁছে সেলাম করল। নয়শো নব্বইটা মাথা ওই পাঁচজন সাহেব ভাগ করে নেবে। প্রত্যেকে ষাটজন করে পুরুষ পাবে। কোন পুরুষ সবল, কে দুর্বল তা যাচাই করা চলবে না। সবাই লাইন করে দাঁড়াক। প্রথম ষাটজন হেগ নিক, পরের ষাটজন মিস্টার প্যানডার নেবেন। এইভাবে বাকিরা ভাগ হয়ে যাবে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা হবে। বাচ্চাদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না।

টেকোমাথা বলল, 'স্যার, আমার কাজ শেষ।'

হেগ রেগে গেলেন, 'মানে? এটা কি আমার স্পট?'

'না স্যার। এখানে তো ট্রেন নেই। ওদের শরীরের যা অবস্থা তাতে হাঁটালে কেউ স্পটে পৌঁছাবে না। আপনারা তো লরি এনেছেন। তাতে তুলে দেওয়া মানেই স্পটে পৌঁছে যাওয়া।

হেগসাহেব অন্যদের দিকে তাকালেন, 'এই লোকটা শেয়ালের থেকেও ধূর্ত।'

অনেকক্ষণ তর্কাতর্কির পর টেকোমাথা টাকা পেল। তবে চুক্তি অনুযায়ী যা পাওয়ার কথা তার থেকে অনেক কম। অবশ্য তাতে তার উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমেনি। হেগসাহেব বললেন, 'উই নিড মোর ম্যান পাওয়ার, যত তাড়াতাড়ি পারো নিয়ে এসো। কিন্তু বাচ্চা কম আনবে।'

টেকোমাথা হাসল, 'স্যার। বাচ্চাকে বাঁচাতেই ওরা এখানে আসতে রাজি হয়। তা ছাড়া বাচ্চাদের জন্যে তো আপনারা অর্ধেক দামও দেন না। অথচ বছর দশেক বাদে ওরাই বড় হয়ে যাবে, আপনার কাজে লাগবে।'

মিস্টার প্যানডার বললেন, 'হি ইজ রাইট। ওরা এখন আমাদের নার্সারিতে লাগানো গাছ। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

সুখীর খুব ইচ্ছে করছিল গাড়ি থেকে নেমে ওদের কাছে

যেতে। কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। যে তার সাহেব হয়েছে সেই লোকটা যে খুব রাগী তাতে তার সন্দেহ নেই। ওয়াগনে উঠে যেভাবে তার শরীর খামচে দেখেছে তাতে এখনও শরীর টাটিয়ে রয়েছে। দূরে গোরা সাহেবরা কথা বলছে। গাঁয়ের লোকেরা যেখানে বসে আছে সেখানে সে কুড়ি পা হাঁটলেই পৌঁছে যেতে পারে। আশ্চর্য! ওরাও তো কেউ কেউ তার কাছে আসতে পারে। সুখী দঙ্গলটার মধ্যে গাঁওবুড়োকে খুঁজতে লাগল, পেল না।

তখন দলের কেউ উদাস গলায় বলল, 'এতদিন আমরা একফোঁটা জলের জন্যে কত কষ্ট করেছি, জল না পেয়ে কেউ কেউ মরেছে আর এখানে জলই আমাদের একজনের জীবন নিল।'

আর একজন বলল, 'বাচ্চাটাকে শক্ত করে ধরেনি, এখন কেঁদে কী হবে?'

সোমরা বালির ওপর বসে চারপাশে তাকাল। গায়ের জল শুকিয়ে গিয়েছে কিন্তু পরনের কাপড় এখনও ভিজে। এতোয়া তার গায়ের সঙ্গে লেপটে রয়েছে। পার হওয়ার সময় ওকে না ধরলে এতক্ষণে ছেলেটা মরে যেত। হঠাৎ সোমবার মনে হল ছেলেটা বড্ড বেশি তার ওপর নির্ভর করছে। আসতে পারছিল না, নিজের ছেলে বলায় ও আসতে পেরেছে। এখন ও খাবার খুঁটে খাক। এইসময় দুখন বলল, 'সুখী আমাদের দেখছে।'

'দেখছে কিন্তু আসছে না।' মাংরা জবাব দিল।

সোমরা মাথা নাড়ল, 'ও আলাদা হয়ে গিয়েছে। আমাদের সঙ্গে আসেনি। সাহেবের গাড়িতে রানির মতো বসে আছে। আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে নদী পার হলাম, ও জলে পা না দিয়ে নদী পেরোল কী করে?'

দুখন বলল, 'ও গাঁওবুড়োকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারত। একটুর জন্যে ডোবেনি বুড়ো।'

মাংরা বলল, 'যেত না। ও নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

দুখন তাকাল, 'নষ্ট?'

'বুঝতে পারছিস না। কাল রাত্রেই সুখীকে নষ্ট করেছে ওরা। নষ্ট হতে পেরে সুখীর মজা লাগছে। গাড়ি থেকে নামতেই চাইছে না।' মাংরা জবাব দিল।

'কিন্তু গাঁওবুড়ো যদি ওর বিচার করে—।'

সোমরা হাত নাড়ল, 'গাঁয়ের নিয়ম এখানে চলবে না। এখানে সাহেব যা বলবে তাই নিয়ম। সাহেব চাইছে তাই সুখী গাড়িতে বসে আছে। কোনও লোক ওর পাশে চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে নেই। আমাদের এখানে আছে।'

'তার মানে সুখী সাহেবের কাছের মানুষ?" দুখন জিজ্ঞাসা করল।

'জানি না। তবে ও খাতির পাচ্ছে।' সোমরা বলল।

'তা হলে ও নিশ্চয়ই জানে আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে!' দুখন বলল।

'হয়তো জানে। যা জিজ্ঞাসা করে আয়।' মাংরা বলল।

দুখন দুঃসাহসী হতে চাইল না। সোমরা এতোয়ার দিকে তাকাল। ডুবে যাওয়া আতঙ্ক সামলে চুপচাপ বসে আছে ছেলেটা। সে তাকে ঠেলল, 'এই।'

এতোয়া তাকাল।

'যা। সুখীকে জিজ্ঞাসা কর আমরা কোথায় যাচ্ছি।' সোমরা বলল।

শোনামাত্র উঠে দাঁড়াল এতোয়া। এটা ভাল লাগল না সোমরার। ছেলেটা যদি গাঁইগুঁই করত, যেতে না চাইত তা হলে বকাঝকা করে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারত। তা না করে সুড়সুড় করে হুকুম মানতে গেল, মানে আরও জড়াল।

বালির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এতোয়া। ওইটুকু বালককে হাঁটতে দেখে প্রহরী অবাক হল কিন্তু গুরুত্ব দিল না। সোজা গাড়ির কাছে পৌঁছে এতোয়া সরু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

সুখী মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না। কিছুই জানি না।'

'তুমি কাল রাত্রে খেয়েছ?'

মাথা নাড়ল সুখী, হ্যাঁ।

'কী খেয়েছ?'

'জানি না। আগে কোনওদিন খাইনি।'

'আজ সকালে?'

'না। এখনও খেতে দেয়নি।' সুখী তাকাল, 'গাঁওবুড়ো কেমন আছে রে?'

'ওখানে বসে আছে। তুমি আসবে না?' এতোয়া জিজ্ঞাসা করল।

'আমাকে যেতে না দিলে কী করে যাব?'

'কেন যেতে দেবে না?'

'আমি জানি না।'

এতোয়ার মনে পড়ে গেল, 'ও, জানি। তুমি নষ্ট হয়ে গিয়েছ।'

ওইটুকুনি পুঁচকের মুখে নষ্ট শব্দটা শুনে খেপে গেল সুখী। সে এমন তারস্বরে চিৎকার করে উঠল যে এতোয়া দৌড়ে দলের দিকে ছুটে গেল। সুখীর চিৎকার শুনে চমকে তাকাল টেকো বুড়ো। তখনও সে টাকা গুণে যাচ্ছিল। হেগসাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ইজ শি ম্যাড? মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ঠকিয়েছ!'

'নো স্যার। নেভার। শি ইজ এ নাইস গার্ল। আমি দেখছি।' টাকাগুলোর ব্যবস্থা করে টেকোমাথা ছুটে এল, 'অ্যাই, কী হচ্ছে? চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'ওরা, ওরা নিশ্চয়ই আমাকে নষ্ট বলছে।' ককিয়ে উঠল সুখী।

'কে বলল তোকে?'

"ওইটুকুনি বাচ্চা। ও জানবে কী করে যদি ওরা না বলে।'

'তুই কি চাস সাহেব ওদের শাস্তি দিক।'

'চাই। একশোবার চাই।' মাথা নাড়তে লাগল সুখী।

'ঠিক আছে। আর চেঁচাবি না। সাহেব তোকে পাগল ভাবছে। আবার চেঁচালে তোকে ওই নদীতে ফেলে দেবে! এত করে বললাম, মাথা ঠান্ডা করে থাক। সাহেব তোকে মাথায় করে রাখবে। এখানে ওর বউ নেই, সাদা মেম ওর পছন্দ নয়। ওর মন ভোলালে তুই পায়ের ওপর পা তুলে থাকতে পারবি কিন্তু কথাগুলো বুঝতেই পারছিস না।'

'কিন্তু তাই বলে আমাকে ও নষ্ট বলবে?'

'দাঁড়া, আমি দেখছি।'

টেকোমাথা চলে এল দঙ্গলটার সামনে। তাকাল। তারপর বাঁকা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'সুখীকে নষ্ট কে বলেছে?'

কেউ জবাব দিল না। ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকল।

টেকোমাথা বুঝল এরা উত্তর দেবে না। সে বাচ্চাদের দেখতে লাগল।

'কোন বাচ্চা সুখীর কাছে গিয়েছিল? উঠে দাঁড়া।'

কেউ কিছু বলার আগেই এতোয়া উঠে দাঁড়াল।

'হুম্। তুই বলেছিস সুখী নষ্ট?'

মাথা নাড়ল এতোয়া, হ্যাঁ।

'সুখী নষ্ট একথা কার কাছে শুনেছিস?'

এতোয়া জবাব দেওয়ার আগে মাংরা বলল, 'কেউ বলেনি ও নিজেই ভেবে নিয়েছে। খুব পাকা ছেলে।'

'এই বয়সে তুই নষ্ট হওয়া বুঝিস? বাপ্স্। কথাটা যদি সাহেবকে বলি তা হলে তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবে। হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা। এর বাপ কে?'

কেউ সাড়া দিল না।

'আরে! এ্যাই, তোর বাপ কে?' টেকোমাথা এতোয়াকে ধমকাল।

এতোয়া সোমরার দিকে তাকাতেই সোমরা খেপে গেল, 'অ্যাই! আমি তোর বাপ?' মাথা নাড়ল এতোয়া, না।

'তা হলে আমার দিকে তাকাচ্ছিস কেন?' প্রশ্ন করেই টেকোমাথাকে বলল সোমরা, 'ওর বাপ-মা মরে গেছে। ও একা।'

ঢোঁক গিলল টেকোমাথা। কথাটা যদি সত্যি হয় তা হলে সাহেবদের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। এই বয়সের বাচ্চার বাপ-মা না থাকলে নিয়ে আসা নিষেধ। যে লোকটা চেকিংয়ে ছিল সে নির্ঘাত ভুল করেছে।

'এই কথাটা সত্যি?' টেকোমাথা এক বয়স্কা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, মহিলা মাথা নেড়ে বলল, সত্যি।

'নেই বললে তো হবে না। এসে যখন পড়েছে তখন তোদের কাউকে ওর বাপ হতে হবে। কে ওর বাপ হবি, হাত তোল।' ধমকাল টেকোমাথা।

কেউ হাত তুলল না।

টেকোমাথা খেপে গেল। এতোয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই কাকে বাপ বলবি?'

এতোয়া সোমরার দিকে তাকাল। তাকাতেই সোমরা ওকে ধাক্কা মারল। 'না। কক্ষনও না। আমি তোর বাপ হতে পারব না।'

'পারব না বললে তো চলবে না শুয়ার।' হাসল টেকোমাথা।

এইসময় মিনমিনে গলায় কেউ বলল, 'আমি বাপ হব।'

'কে? কে বলল কথাটা?' জানতে চাইল টেকোমাথা।

একটা হাত ওপরে উঠতেই হুকুম দিল, 'উঠে দাঁড়াও।'

সবাই দেখল কোনওমতে উঠে দাঁড়াল গাঁওবুড়ো। দাঁড়িয়ে কাশতে লাগল।

'তুমি গাঁওবুড়ো না?' টেকোমাথা বিস্মিত।

'ছিলাম।'

'হুম্। তুমি ওর বাপ হতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। হও। আমার কোনও আপত্তি নেই। অ্যাই যা

তোর বাপের কাছে।'

এতোয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল গাঁওবুড়ো তাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। সে মানুষের শরীর সামলে গাঁওবুড়োর কাছে পৌঁছে গেল। তাকে জড়িয়ে ধরল বুড়ো।

টেকোমাথা হাসল, 'যাক তোমার একটা ছেলে জুটে গেল।'

টেকোমাথা পেছন ফিরতেই এতোয়াকে নিয়ে বসে পড়ল গাঁওবুড়ো। এতোয়া ওর শ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছিল। একটু শান্ত হয়ে গাঁওবুড়ো বলল, 'আমি খুব খুশি। তুই আমার মনের কথা বলেছিস।'

'কখন?' এতোয়া বুঝতে পারছিল না।

'ওকে নষ্ট বলেছিস, ঠিক করেছিস।' বলে চুপ করে গেল।

টাকাপয়সা বুঝে নিয়ে টেকোমাথা প্রহরীদের সঙ্গে নৌকো করে ওপারে চলে গেল। ওপারে, বহুদূরের যে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে গিয়ে সারাদিন বিশ্রাম করবে। সন্ধের পর ট্রেন চালু হবে। অতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাতে তার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। চারপাশে রয়েছে বিশ্বস্ত প্রহরী। অনেক যাচাই করে ভাল মাইনে দিয়ে সে রেখেছে ওদের। ক'দিনের মধ্যেই তাকে আবার যেতে হবে ছোটনাগপুরে। লালমোহন তেলির মতো আরও কিছু লোককে টোপ দিয়ে এসেছে সে। এ লাইনে সে একা নয়; প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে টেক্কা দিতে হচ্ছে।

লরিতে বোঝাই করা হল ওদের। যতটা সম্ভব একসঙ্গে রাখা হল এক গ্রামের লোকদের। তখন সূর্য প্রায় মাথার ওপর। লরি ছাড়ার আগে কয়েক ধামা মুড়ি খেতে দেওয়া হল। জীবনে প্রথমবার মুড়ি দেখল মাংরারা। মুখে দিতে মজা লাগল। লরি ছাড়ল।

দু'পাশে শুধু গাছ আর গাছ। মাঝে মাঝে মাঠ আর ডোবা। ঘন জঙ্গল এগিয়ে এসেছে কোথাও কোথাও। এত সবুজ কখনও দ্যাখেনি ওরা। সোমরার মন ভাল হয়ে গেল। নিজের

রোগা জিরজিরে বউটার কথা মনে পড়ল তখন। এত কষ্ট সহ্য করতে পারত না বউ। ওই নদী পার হওয়ার সময় নির্ঘাত ভেসে যেত। তার চেয়ে গাঁয়ের বউ গাঁয়েই থেকে গেল, এই ভাল হল। এখন সে একা। মিষ্টি মিষ্টি বাতাস লাগছে গায়ে। মাংরাদের মতো তার কোনও দায়িত্ব নেই। যা খুশি সে করতে পারে। পরিশ্রম করবে, দু'বেলা পেট ভরে খাবে আর হপ্তার পয়সা জমাবে। তারপর অনেক পয়সা হয়ে গেলে আবার গাঁয়ে ফিরে যাবে। গিয়ে লালমোহন তেলির মতো ব্যবসা করবে। পাঁচজনে নিশ্চয়ই তখন তাকে মানবে।

দুপুরের শেষে লরি থামল। সামনে নদী। তবে বেশি চওড়া নয়। জলও খুব কম। তাদের শরীর থেকে নামিয়ে লরিগুলো হাঁটু-জলে নেবে গেল। নড়বড় করতে করতে পৌঁছে গেল ওপারে। জলে নামতে হল ওদের। এই জল বেশ ঠান্ডা আর পরিষ্কার। মুড়ি খেয়ে গলা শুকিয়েছিল, তাই পেট ভরে জল খেল সবাই। দুখন বলল! 'আরে, শুধু এই নদীটাকে যদি গাঁয়ে নিয়ে যাওয়া যেত তা হলে কী ভালই না হত।'

একজন বলল, 'লালমোহন তেলি যা বলেছিল তা কিন্তু মিলে যাচ্ছে। সবুজ গাছ অনেক জল, এখানে গরম নেই।'

মাংরা বলল, 'ওই গাছের পাতা খেয়েই বাঁচা যায়।'

আর একজন চেঁচিয়ে উঠল। নদী পার হয়ে ওপারে পৌঁছে সে দেখতে পেয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটা গাছে ফল ঝুলছে। একটায় লম্বা মোটা ফল, গায়ে কাঁটা কাঁটা। অন্যগুলোয় গোল গোল, পাকা ফল। একজন পাথর ছুড়তেই দুটো গোল ফল মাটিতে পড়ে গেল। কেউ চেঁচিয়ে উঠল, 'খাস না, বিষফল হতে পারে।'

যারা মুখে তুলেছিল তারা থিতিয়ে গেল। বিষফল হলে খেলেই মরে যাবে।

পাঁচজন সাহেব জিপে চেপে এপারে পৌঁছে স্থির করে নিলেন প্রত্যেকে একশো আটানব্বুই মানুষ পাবেন। একটু পরে

তাঁদের রাস্তা আলাদা হয়ে যাবে। তাই এখন থেকেই ভাগ করে নেওয়া উচিত। সেসময় সাহেবদের কর্মচারীরা চিৎকার করে আদেশ দিল পাথর ছুড়ে ফল না পাড়তে।

হেগ সেটা শুনলেন। মিস্টার প্যানডারকে বললেন, 'একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ওদের আজ ডিনার খাওয়াতে হবে না। ওই ম্যাংগো আর জ্যাকফ্রুট খেয়েই পেট ভরে যাবে ওদের। আপনি কী বলেন?'

'গুড আইডিয়া।' মিস্টার প্যানডার হাসলেন।

হেগ কর্মচারীদের ডেকে বললেন, 'ওদের বাধা দিয়ো না। বরং বলো সব ফল গাছ থেকে পাড়তে কিন্তু কেউ যেন একটাও না খায়।'

কর্মচারীরা হুকুম বদল করতে হইচই পড়ে গেল। ফল পাড়ার একটা মজা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আম আর কাঁঠালে গাছের নীচটা ছেয়ে গেল। পাড়তে গিয়ে একটা পাকা কাঁঠাল মাটিতে পড়ে ফেটে গিয়েছিল। কাঁচা সোনার মতো কোয়া বেরিয়ে এসেছিল। সেই রূপে মুগ্ধ হয়ে একজন সাবধানবাণী ভুলে গিয়ে খানিকটা মুখে তুলেই চেঁচিয়ে উঠল। 'আঃ, কী সুন্দর খেতে, কী মিষ্টি। সবাই স্থির হয়ে দেখল ফলটা খেয়েও লোকটা মরে গেল না।

সময় চলে যাচ্ছে। মানুষগুলোকে গুনে গুনে তোলা হল লরিতে। মাংরাদের লরিতে অন্য গাঁয়ের কিছু মানুষদের তোলা হল। ড্রাইভারের মাথার ওপরে ছাদে ফলের পাহাড়। লরি এগোল। সামনে সাহেবদের গাড়ি।

খিদেতে পেট মোচড়াচ্ছে। গতকাল দুপুরে ওরা শেষবার খাবার দিয়েছিল। না খেয়ে থাকার অভ্যেস ওদের আছে বটে কিন্তু এমন তো পরিশ্রম করতে হয় না। টানা দু'দিন না খাওয়ার পর একটু গমভাঙা সেদ্ধকে অমৃত বলে মনে হয়। এরা কখন খেতে দেবে কে জানে! বড় নদীর পারে ওদের থেকে দূরে চেয়ারে বসে সাহেবরা খাচ্ছিল আর বোতল থেকে তরল পদার্থ

গলায় ঢালছিল। অতএব ওদের এখন খিদে নেই। আর সেটা নেই বলে এতগুলো লোকের খিদে টের পাচ্ছে না সাহেবরা। অথচ ওরা ইংরেজরাজার লোক, তাদের উপকার করতে এখানে এসেছে। ব্যাপারটা কী রকম গুলিয়ে যাচ্ছিল সোমরার।

এখন এই চলন্ত লরিতে তাদের গাঁয়ের লোকের সঙ্গে অন্য গাঁয়ের লোকও ঢুকেছে। আবার তাদের গাঁয়ের লোক অন্য লরিতে গিয়েছে। তাদের মধ্যে দুখন আর তার বউবাচ্চাও আছে। দুখন ছেলেটা ভাল। ও থাকলে পরামর্শ করা যেত। মাংরা অবশ্য রয়েছে কিন্তু ওর বুদ্ধি ঠিক কাজের নয়। যে ছেলেটা কাঁটাওয়ালা ফল খেয়ে চেঁচিয়েছিল কী সুন্দর মিষ্টি বলে সে অন্য গাঁয়ের। কিন্তু ছেলেটা মরেনি। ফলগুলো রয়েছে লরির মাথায়। সত্যি যদি মিষ্টি হয় তা হলে খেতে অসুবিধে কোথায়। যদিও তাদের নিষেধ করা হয়েছে খেতে কিন্তু খাচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে তো কেউ এখানে নেই। নিজেকে সামলে গাড়ির শরীর ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল সোমরা। এখন তার ওপর সবার নজর। হাতের সামনেই ফলগুলো। কয়েকটা গোল ফল তলায় পড়ায় চেপটে গেছে। রস বের হচ্ছে। আঙুল বাড়িয়ে সেই রস একটু তুলে জিভে দিল সোমরা। বেশ মিষ্টি তবে একটু টক টক স্বাদও আছে। কাঁটাওয়ালা ফলগুলো বেশ বড়। সে হাত বাড়িয়ে দুটো গোল ফল তুলে নিয়ে বসতে যেতেই অনেকগুলো হাত তার দিকে প্রসারিত হল। তারপর লরির শেষ প্রান্তে বসে থাকা মানুষটিও যখন হাত বাড়াল আর একসঙ্গে সবাই খেতে চাইল তখন ভয় পেল সোমরা। চটপট ফলদুটো লরির ওপর রেখে বসে পড়ল সে। মাংরা বলল, 'ঠিক, ঠিক। অন্যের জিনিস তুই দেবার কে? না দিয়ে ভাল করেছিস।' সবাই যে হতাশ হল তা গলার আওয়াজেই বোঝা গেল। কিন্তু অন্য কেউ উঠে ফল নিতে গেল না।

ওদের পেছনে অনেকগুলো লরি ছিল, এখন একটাই অনুসরণ করছে। বাকিরা কোথায় কখন চলে গেছে বুঝতে

পারেনি সোমরা। এখন জঙ্গল ঘন হচ্ছে। সূর্য মাথার ওপরে নেই। ছায়া বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত লরি দুটো থেমে গেল এক পাশে। আর কর্মচারীদের চিৎকার শোনা গেল, 'নামো, জলদি নামো। লাইন করে দাঁড়াও।'

সমস্ত পথ সুখী চুপচাপ বসে এসেছে। মাঝে যখন অল্প জলের নদী জিপটা পেরিয়ে আসছিল তখন তার মনে ভেসে যাওয়ার ভয় ঢুকেছিল। দলের লোকজন যখন গাছ থেকে ফল পাড়ছিল তখন দু'জন সাদা চামড়ার লোক একেবারে কাছে এসে তাকে দেখে গিয়েছিল। সুখী ভয় পাচ্ছিল এরাও তার শরীর পরীক্ষা করবে কিনা! কিন্তু করেনি।

গাড়ি ছাড়ার আগে হেগসাহেব যখন ফিরে এল তখন সুখীর শরীরে প্রকৃতির চাপ খুব বেড়ে গেছে। সে মরীয়া হয়ে হেগসাহেবকে ইশারা করল, নীচে নামতে চায়। হেগসাহেব অবাক হয়ে মাথা নাড়লে সুখী দ্রুত নীচে নেমে জিপের পেছনে চলে গেল। নিজের শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জলের পরিমাণ দেখে অবাক হল সে। গত কয়েক মাসে এ দৃশ্য দ্যাখেনি সে। আড়াল থেকে উঠে আসতেই দেখল তার বসার জায়গায় কিছু একটা পড়ে আছে, হেগসাহেব ইশারায় সেটা খেতে বলে ড্রাইভারের আসনে বসে গাড়ি চালু করলেন। মোড়ক খুলে নরম খাবার পেল সুখী। এগুলো যে খাবার তা হেগসাহেব ইশারায় না জানালে সে জানত না। দাঁত দিয়ে একটু কেটে নিতেই খুব আরাম হল। কাল রাত্রে টেকোমাথা যা খাইয়েছিল এটা বোধহয় তার থেকেও ভাল। এবং তখনই তার মনে এল গাঁওবুড়োর কথা। কাল দুপুরের পর গাঁওবুড়ো কিছু খেতে পেয়েছে কিনা জানা নেই। এর অর্ধেকটা যদি মানুষটাকে দেওয়া যেত, এত ভাল খাবার বুড়ো তো এই জীবনে খায়নি।

জঙ্গুলে পথ ধরে লাইনটা চলছিল। প্রথমে হেগসাহেব, সুখী, কিছু কর্মচারী, তারপর ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া মানুষগুলো। সবার

শেষে আবার কিছু কর্মচারী। হঠাৎ ঘণ্টার আওয়াজ কানে এল। বেশ মিষ্টি আওয়াজ যা শুনলে মন পবিত্র হয়।

তারপরেই জঙ্গল আচমকা ন্যাড়া হয়ে গেল। একটা মাঠ, মাঠের ওপাশে কিছু ঘরবাড়ি, বাড়ির ছাদগুলো খড়ের। একটা বাঁশের বড় বাড়ি, তাতে কাঠের দরজা লাগানো। দরজাটা খোলা। সেখানে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন পেছনে হাত রেখে। ওঁর গলা থেকে পা পর্যন্ত একটা সাদা পোশাক, গলায় কিছু ঝুলছে।

হেগসাহেব এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালেন, 'গুড আফটারনুন ফাদার।'

'গুড আফটারনুন। এদের নিয়ে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?' ফাদার বললেন।

'না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সবাই ঠিকঠাক এসেছে।'

'এরা সংখ্যায় কত?'

'একশো আটানব্বই।'

'কবে থেকে এরা কাজ শুরু করবে?'

'কাল থেকেই ফাদার।'

'নো। পরশু থেকে ওদের কাজ করাবেন। ওরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। এই জায়গাও ওদের কাছে নতুন। কালকের দিনটা ওদের জায়গাটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে দাও।'

'কিন্তু একটা দিন ওদের বসে বসে খাওয়াব?' হেগসাহেবের পছন্দ হচ্ছিল না।

'ওরা অনেক বেশি কাজ করবে যখন আপনার ওপর ভরসা বেড়ে যাবে। এসো, কাজ শুরু করি আমরা।' ফাদার ইশারা করতে দু'জন মানুষ এগিয়ে এল। এঁরা গির্জার কর্মী। একজন ফাদারের হাতে বাইবেল তুলে দিল।

ততক্ষণে কর্মচারীরা একশো আটানব্বুই জনকে মাঠের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। এখন বিকেল। সূর্য গাছের আড়ালে। মানুষগুলো কথা বলছিল না। সোমরা দেখল দুখনও এখানে

আছে। তার মনে হচ্ছিল এইবার তাদের খেতে দেওয়া হবে।

ফাদার মুখ খুললেন। তাঁর ভাষা জগাখিচুড়ি। কিছু ইংরেজি, কিছু হিন্দি শব্দ কিছু ভাঙা বাংলায় মেশানো। সামনে বসা মানুষগুলো তার অনেকটাই বুঝতে পারছিল না। ফাদার বললেন, 'এই পৃথিবীতে মানুষের অনেক রকম দুঃখ। কেউ মনের কষ্টে ভোগে, কেউ অর্থের অভাবে কষ্ট ভোগ করে। পরমপিতা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যখন মানুষের কষ্ট বেড়ে গেল তখন তা দূর করতে তিনি তাঁর সন্তানকে পাঠালেন। এই সন্তানের নাম যিশু। কী নাম বললাম? যিশু। ঈশ্বরের সন্তানের নাম যিশু। নামটা তোমরা উচ্চারণ করো।'

কিন্তু কেউ শব্দ করল না। মনে হচ্ছিল সবাই বধির এবং মূক। ফাদার হেগসাহেবের দিকে তাকালেন। হেগসাহেব চিৎকার করলেন, 'বলো, যিশু, যিশু।'

একটু নড়াচড়া দেখা গেল। হেগসাহেব বিরক্ত হয়ে শূন্যে নিজের হাতের লাঠি চালালেন। সেটা বাতাস কাটল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি গলায় স্বর ফুটল, 'যিশু।'

ফাদার বললেন, 'ইয়েস। যিশু। সবাই বলো।' হাত নাড়লেন তিনি।

এবার সমুদ্র গর্জনের মতো শোনাল, 'যিশু। যিশু।'

ফাদার হাসলেন, 'ইয়েস। যিশুর মায়ের নাম মেরি। সে, মেরি। মেরি।'

সবাই এবার চেঁচাতে লাগল, 'মেরি। মেরি।'

'গুড।'

'পৃথিবীতে এসে যিশু বললেন, 'ভালবাসো। তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো। তোমার মনে যদি কষ্ট জন্মায় তা হলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে শান্তি দেব।' যিশুর পুরো নাম যেশাস ক্রাইস্ট। তিনি যে ভালবাসার ধর্ম পৃথিবীতে প্রচার করলেন তার নাম খ্রিস্টধর্ম। এই ধর্মে যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাদের পাশে এসে দাঁড়ান। এদের বলা হয় খ্রিস্টান। তোমরা

এমন জায়গা থেকে এসেছ যেখানে কেউ ধর্মের আলো হাতে পৌঁছায়নি। যেখানে সভ্যতা পথ দেখায়নি। তোমাদের সৌভাগ্য যে এখানে আসতে পেরেছ। এখন থেকে ঈশ্বরের পুত্র যিশু, যেশাস ক্রাইস্ট তোমাদের পথ দেখাবেন। আমেন।'

পাশে রাখা একটি বড় ড্রামের ঢাকনা তুলে লম্বা হাতা নিয়ে দাঁড়াল একজন স্বেচ্ছাসেবক। হেগসাহেব প্রথমে বসা লোকটিকে ইশারা করলেন উঠে আসতে। বেচারা এতক্ষণ কী শুনেছে তা নিজেই জানে না। শুধু মনে করেছে ভাল ভাল কথা বলা হচ্ছে। এখন হেগসাহেব তাকে এগিয়ে যেতে ইশারা করাতে সে অন্যদের দিকে তাকাচ্ছিল।

হেগসাহেব চিৎকার করলেন, 'ইউ বাস্টার্ড, গেট আপ, কাম হিয়ার।'

সেই চিৎকারে এমন কিছু ছিল লোকটা ভাষা বুঝে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল। ফাদার তাকে সস্নেহে ডাকলেন, 'এসো, বৎস। তোমার নাম কী?'

লোকটার গলা শুকনো, দুটো হাঁটু কাঁপছে।

'কোনও ভয় নেই। তুমি এখন যিশুর আশ্রয়ে আছ। নাম বলো।'

'কোনও রকমে শব্দটি উচ্চারিত হল, 'চারোয়া।'

সঙ্গে সঙ্গে গলায় ঝোলা লকেটটা ওর কপালে ছুঁয়ে চোখ বন্ধ করে কিছু বিড়বিড় করে ফাদার বললেন, 'আজ থেকে তুমি চারোয়া নামটা ভুলে যাবে। তোমার নাম হল চার্লস। এখন থেকে তুমি খ্রিস্টান। যাও, হোলি ওয়াইন পান করো।'

ড্রামের পাশে দাঁড়ানো স্বেচ্ছাসেবক ইশারা করতে লোকটা তার কাছে নিয়ে গেল। স্বেচ্ছাসেবী জিজ্ঞাসা করল, 'কী নাম?'

লোকটা চুপ করে আছে দেখে বলল, 'চার্লস। তোমার নাম চার্লস। নাম বলো। তোমার নাম কী?'

জড়ানো গলায় জবাব এল, 'চার্লস।'

সঙ্গে সঙ্গে ফাদার হাততালি দিলেন। লম্বা হাতা দিয়ে

ড্রামের ভেতর থেকে পানীয় তুলে একটা হাতলভাঙা কাপে ঢেলে স্বেচ্ছাসেবী এগিয়ে দিল, 'নাও, খাও।'

ফাদার বললেন, 'হোলি ওয়াইন। পবিত্র মদিরা।'

দ্বিতীয়বার আদেশ শুনে লোকটি পানীয় মুখে ঢালল। গত বর্ষার সময় একবার সে হাঁড়িয়া খেয়েছিল। এখন মনে হল ঠিক সেই জিনিস খাচ্ছে। তবে আরও কড়া।

চার্লসকে আলাদা জায়গায় বসানো হল। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি যে অভুক্ত, তার গলা দিয়ে যখন হাঁড়িয়া নেমেছিল তখন যে উত্তাপ শরীরে ছড়িয়েছে তার প্রতিক্রিয়ায় সে চোখ বন্ধ করেছিল। একে একে মানুষগুলোকে নতুন নাম দান করলেন ফাদার। সোমরা হল স্যামুয়েল, মাংরা ম্যাকডোনাল্ড, এতোয়া এডোয়ার্ড, দুখন ড্যানিয়েল। খাতায় লেখা হল সোমরা স্যামুয়েল, মাংরা ম্যাকডোনাল্ড। মেয়েদেরও নতুন নাম দেওয়া হল। কেউ মেরি, কেউ মার্থা, কেউ লিজা, কেউ এলিজাবেথ। শিশুরাও বাদ গেল না।

ইতিমধ্যে ঝুপঝুপ করে অন্ধকার নেমে এসেছে। হ্যারিকেন জ্বলছে চার্চের ভেতর এবং বাইরে। যিশুর মূর্তির পাশে এবং নীচে মোম জ্বালানো হয়েছে। আর বেশ কিছু মশাল জ্বলল মাঠের চারপাশে।

হেগসাহেব ফাদারকে বললেন, 'রাত বেশি হওয়ার আগেই এদের নিয়ে যাওয়া উচিত।'

ফাদার ইতস্তত করলেন, 'ইতিমধ্যে যে অন্ধকার নেমেছে তাতে—।'

'না না। মশাল আছে। কোনও সমস্যা হবে না।' হেগসাহেব তাঁর কর্মচারী বাহিনীর প্রধানকে ডেকে কী করতে হবে তার নির্দেশ দিলেন।

মানুষগুলোকে আবার লাইনে দাঁড় করানো হল। ওদের একপাশে চুপচাপ বসেছিল সুখী, তার নাম এখন সুসান। বারংবার সে গাঁওবুড়োকে খুঁজছিল। লোকটা যখন খ্রিস্টান হতে

এগিয়ে গিয়েছিল তখন তাকে দেখতে পেয়ে ভেবেছিল নিশ্চয়ই এদিকে তাকাবে। কিন্তু গাঁওবুড়ো তাকায়নি।

হঠাৎ একটা লোক তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে খুব সংকুচিত ভঙ্গিতে যা বলল তার অর্থ বুঝতে সময় লাগল সুখীর। অনুমানে বুঝে সে অনুসরণ করল। মশালের আলোয় পথ দেখে লাইনের মানুষেরা এগোচ্ছে। তাদের পাশ দিয়ে লোকটা সুখীকে একটু জোরে পা ফেলে নিয়ে এল জিপের কাছে। জিপের চালকের সিটে বসে হেগসাহেব মদের বোতল উঁচু করে গলায় ঢাললেন। সুখী লক্ষ করল, পরিচিত মানুষগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে আসার সময় কেউ একটিও শব্দ উচ্চারণ করল না। অভিমান তীব্রতর হল। সে গাড়িতে উঠে বসতেই দেখল যে লোকটা তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এল সে-ও গাড়ির পেছনে পা বাইরে ঘুরিয়ে উঠে বসেছে। গাড়ি চলতে শুরু করল।

দু'পাশে জঙ্গল, গাছগাছালি, ঝোপঝাড়ের মাঠ পেরিয়ে ওরা যেখানে পৌঁছাল সেখানে লাইন দিয়ে বাঁশের খুঁটির ওপর খড়ের চালের ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চারপাশে দরমার বেড়া, দরজা। পায়ের তলায় মাটি। মাটির ওপর খড় বিছানো।

মশালের আলোয় কর্মচারী বাহিনীর প্রধান কাগজে চোখ রেখে হাঁক দিল, 'ম্যাকডোনাল্ড'। কেউ সাড়া দিল না।

লোকটি বিরক্ত হল, 'মাংরা ম্যাকডোনাল্ড! এগিয়ে এসো।'

এবার মাংরা সপরিবারে কয়েক পা হেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'একদম প্রথম ঘরটা তোমার। কোম্পানি তোমাকে বিনা পয়সায় এই ঘর করে দিয়েছে। ঘরের পেছনে দরজা আছে। সেই দরজা দিয়ে বাইরে গেলে ছোট্ট ঘর পাবে। সেখানে রান্না করবে। ওখানে কাঠ আছে, পাথর আছে। পাথরের উনুনে কাঠ জ্বেলে রান্না করবে। রান্নাঘরে মাটির হাঁড়ি, কলসি, গ্লাস আছে। সাতদিনের খাওয়ার জন্যে রেশন দেওয়া হয়েছে। এ সবই কোম্পানি তোমাদের বিনা পয়সায় দিচ্ছে। আর একটু পেছনে

গেলে ঝরনা দেখতে পাবে। সারা বছর জল থাকে ওখানে। ওই জল খাবে, রান্না করবে, স্নান করবে। পেচ্ছাপ পায়খানা যা করার তা ওই ঝরনার ধারে করবে। এদিকে নয়। বুঝতে পেরেছ? যাও। প্রথম ঘরটায় যাও।' লোকটি আদেশ করল।

মশালের আলো ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে। মাংরা সেটা ঠেলতেই খুলে গেল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। পায়ের তলায় শক্ত খড়। বাচ্চাদুটো আর বউ সেই খড়ের ওপর বসে পড়ল। মাংরা পেছনের দরজাটা আন্দাজে বের করে চাপ দিতেই খুলে গেল। তারাদের আলো পৃথিবীতে নেমে আসায় পেছনে ছোট ছোট ঘর পর পর দেখতে পেল সে। আর কানে বাজল জলের শব্দ।

'দুখন ড্যানিয়েল!'

দুখন এগিয়ে গেল সপরিবারে। তার জন্যে দ্বিতীয় ঘরটি বরাদ্দ হল।

বেশ কয়েকটি নামের পর লোকটা চেঁচাল, 'সোমরা স্যামুয়েল।'

সোমরা এগিয়ে গেল।

'তুমি কি একা? তোমার পরিবার কোথায়?'

'নেই। আমি একা।'

লোকটা কাগজ দেখল, 'না। তোমার একটা ছেলে আছে।'

'না। আমার কেউ নেই।'

'সমস্যা। আর কেউ একা নেই, একজনই একা। ঠিক আছে, তুমি একেবারে শেষ ঘরটায় চলে যাও। যদি আর কেউ একা আসে তাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দেব। যাও।'

সোমরা এগোল। এখানে মশালের আলো পৌঁছাচ্ছে না। ঘরের ভেতর গভীর অন্ধকার।

পায়ের তলায় খড় পেয়ে সে সটান শুয়ে পড়ল। পিঠে কাঠি ফুটছে, অস্বস্তি। মাথার নীচে পুঁটুলিটা দিতে সেটা ভুলে গেল

সে। ঘুম আসছিল হু হু করে। কিন্তু বাইরে তখন চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। তার ঘরের দরজা খুলে গেল, 'ইধার আও।'

কোনওমতে উঠল সোমরা। দুটো লোক দাঁড়িয়ে আছে। একজনের হাতে ঝুড়ি। তা থেকে দুটো আম নিয়ে দ্বিতীয় লোকটা সোমরাকে দিয়ে এগিয়ে গেল পাশের ঘরের দিকে। ফলদুটো নাকের নীচে ধরতেই মিষ্টি গন্ধ পেল সোমরা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম উধাও, পেটে খিদে জানান দিল। প্রথমে দাঁত বসাতেই শক্ত খোসায় অস্বস্তি হল, কিছু রস গড়িয়ে গেল। বাইরে এল সে। এখন তারার আলোয় চোখ কিছুটা স্বচ্ছন্দ। অনেক ভেবে খোসা ছাড়াল সোমরা। তারপর কামড়াতেই জিভে অপূর্ব স্বাদ, নরম আমের অংশ গলা দিয়ে নামতেই শরীর জুড়িয়ে গেল। খুব দ্রুত দুটো আম খাওয়ার পরও মনে হচ্ছিল আরও কয়েকটা পেলে ভাল হত। কিন্তু এটাই যে রাত্রের খাবার তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। আঙুলগুলো চটচট করছে রসে, মুখেও অস্বস্তি। পেছনের দরজা খুলে সে ছোট ঘরটাকে দেখতে পেল। অন্ধকারে ঝুম মেরে পড়ে আছে। এখানে কোথাও মাটি নেই, শুধু ঘাস আর ঘাস। হঠাৎ কানে জলের শব্দ এল।

ঝোপঝাড় পেরিয়ে আসতেই ঝরনাটাকে দেখতে পেল সে। বেশি চওড়া নয়। প্রবল স্রোত, কিন্তু তারার আলোতেও বোঝা যাচ্ছিল পরিষ্কার জলের ঝরনা। নিচু হয়ে হাত-মুখ ধুয়ে মাথায় দিল খানিকটা, তারপর আঁজলা করে খেতে সরসর শব্দ শুনল। ডাঙা থেকে কীসব হুড়মুড়িয়ে জলে নেমে যাচ্ছে। ভয় পেল সোমরা, সাপ নয় তো। খানিকক্ষণ পরে সব চুপ, শুধু জলের শব্দ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। সামনেই জলের ধারে একটা বড় পাথর পড়ে আছে। কী মনে হতে শরীরের সব শক্তি দিয়ে পাথরটাকে সরাতেই একটা প্রাণীকে দেখতে পেল সে। বাঁ হাতে তাকে তুলেই ডাঙায় ছুড়ে দিল সোমরা। ঘাসের ওপর পড়েই সেটা ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করল আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। ওটা কাঁকড়া। এর চেয়ে অনেক ছোট কাঁকড়া কাল দুপুরে তার

আঙুল ক্লামড়ে ধরেছিল। একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে কাঁকড়াটাকে কবজা করে ওর দাড়া, পাগুলোকে ছিঁড়ে ফেলতে বুঝল প্রাণীটির ওজন আছে। সতর্ক ভঙ্গিতে কাঁকড়াটাকে ভাঙতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু মাংস এমনভাবে শক্ত খোলে আটকে আছে যে আলাদা করা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে জলে ফেলে দিল সে প্রাণীটাকে। কিন্তু এখানে তা হলে কাঁকড়া আছে, মাছ আছে। আগুন জ্বেলে জলে সেদ্ধ করলে মাংস বের করে খাওয়া যাবে। সোমরার মনে হল, এই অন্ধকারেও সে যা বুঝছে তাতে তাদের গাঁয়ের তুলনায় এই জায়গাটা স্বর্গ। সে ঘরে ফিরে এল। মানুষগুলো এখন লাইন দেওয়া ঘরগুলোতে ঢুকে চুপ মেরে গেছে। প্রত্যেকটা ঘরে একাধিক মানুষ, শুধু সে একা। শালা বউটা মরার সময় পেল না। কোনওমতে যদি এই পর্যন্ত আসতে পারত তা হলে হয়তো বেঁচে যেত, শরীরে মাংস লাগত। সোমরার মনে হচ্ছিল, লালমোহন তেলি তাদের মিথ্যে বলেনি। খড়ের ওপর শরীর এলিয়ে দিতেই তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

হেগসাহেবের বাড়িটা কাঠের। লম্বা মোটা খুঁটিগুলোর ওপর কয়েকটা ঘর। মেঝে দেওয়াল ছাদ সবই কাঠের তৈরি। ছাদের ওপর টালি সাজানো। বাড়ির বারান্দা থেকে প্রত্যেকটা ঘরে আলো জ্বলছে। যে কর্মচারীটি গাড়ির পেছনে আধবসা হয়ে এসেছিল তাকে কিছু বলে হেগসাহেব সিঁড়ি ভেঙে ওপরে চলে গেল।

কর্মচারীটি সুখীর কাছে এল, 'নামো। উতরাও।'

এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর এত আলোকজ্জ্বল বাড়ি দেখে সুখী হকচকিয়ে গিয়েছিল। তার চোখে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। সে গাড়ি থেকে নামল পুঁটলি নিয়ে। লোকটা তাকে ইশারা করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে নিয়ে গেল। সেখানে তিনজন কর্মচারী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। এই লোকটি তাদের

কিছু বলতেই তারা চোখের পলকে আড়ালে চলে গেল। একটা ছোট ঘরে সুখীকে নিয়ে গেল লোকটা, সেখানে হ্যারিকেন জ্বলছে। ঘরের একপাশে একটা তক্তাপোশের ওপর বিছানা পাতা, টেবিলের ওপর জলের জাগ, গ্লাস, দেওয়ালে আয়না। একটা আলনায় অনেকগুলো পোশাক ঝুলছে। মেয়েদের পোশাক।

লোকটা বলল, 'শোনো, আমাদের সাহেব খুব রাগী। কথা না শুনলে ও খুন করতে পারে। এর আগে দুটো লোককে গুলি করে মেরেছে। সাহেবের বউ এসেছিল দেশ থেকে, মেমসাহেব। কী ফরসা গায়ের রং, কিন্তু রোগা, খুব রোগা। কথার অবাধ্য হওয়ায় সাহেব তাকে এমন চড় মেরেছিল যে অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সাহেব তাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ?'

সুখী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে লোকটা খুশি হল।

'কিন্তু যদি সাহেবের কথা শোনো, একটুও অবাধ্য না হও, তা হলে এই বাংলোয় তুমি দু'নম্বর লোক হবে। সবাইকে হুকুম করবে তুমি।' লোকটা হাসল।

টেকোমাথার কথা মনে পড়ে গেল সুখীর। সে এই রকমই বলেছিল।

'কিন্তু সাহেব বলেছে তোমার শরীরে খুব নোংরা। যে কাপড়টা পরে আছ তা থেকে যে গন্ধ বের হচ্ছে তা আমিও এখানে দাঁড়িয়ে পাচ্ছি। তোমাকে পরিষ্কার করতে হবে। তুমি এখন এখানে চুপ করে বসো।' লোকটা বেরিয়ে গেল।

ঝিমুনি আসছিল সুখীর। কিন্তু চারপাশের এই বৈভবের আলাদা প্রভাব আছে। তাই সে চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে পাশের ঘরে শব্দ হল। জল ঢালার। তারপর লোকটা দরজা খুলে তাকে ডাকল, 'এসো। জল গরম হয়ে গিয়েছে। আমার নাম আলি। তুমি আমাকে আলিভাই বলে ডাকবে। এসো।'

সুখী এগিয়ে গেল। ছোট ঘরটায় একটা ড্রামে ঠান্ডা জল আর একটা লম্বা কান-উঁচু পাত্রে গরম জল ভরেছে। আলি বলল, 'তুমি আগে ওই পাদানিতে বসে যা কিছু করার করে নাও। পাশের মগে জল আছে। আমি ততক্ষণ পাশের ঘরে আছি। সব হয়ে গেলে আমায় ডাকবে।'

নিজেই দরজা ভেজিয়ে আলি পাশের ঘরে চলে গেল। লোকটা যা বলল তা বুঝতে অসুবিধে হল না সুখীর। কিন্তু জলবিয়োগ ছাড়া তার শরীর অন্য কোনও প্রয়োজন বোধ করল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঘরটাকে দেখছিল। এই ঘরেও আয়না টাঙানো আছে। গ্রামে তার এক চিলতে আয়না ছিল। বর্ষার পর গাঁওবুড়ো লালমোহন তেলির দোকান থেকে কিনে এনে দিয়েছিল অনেক বছর আগে। সেই আয়নায় মুখ লম্বা দেখায়। এখন এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে দেখল। চুলে জটা পড়ে যাচ্ছে, মুখচোখ যেন কী রকম, এই সময় আলি 'হয়েছে' জিজ্ঞাসা করে দরজা খুলল।

'তোমাকে এখন পেতনির মতো দেখাচ্ছে। তবু সাহেবের মনে যখন লেগেছে—।' আলি হাসল, 'শোনো, আমি তোমার বাপের বয়সি। আমার কাছে তোমার কোনও লজ্জা করার কারণ নেই। তা ছাড়া তুমি কিছুই জানো না। কিছু শিখতে হলে লজ্জা ছাড়তে হয়। এখন ওই গরম জলের মধ্যে গিয়ে বসো। খুব অল্প গরম।'

সুখী পুতুলের মতো আদেশ পালন করতে যাচ্ছিল কিন্তু আলি হায় হায় করে উঠল, 'তুমি ওই নোংরা কাপড় সমেত জলে নামবে নাকি। ছি ছি। ওটা খোলো।'

সুখী বিপদে পড়ল। শক্ত হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আলি এগিয়ে এল, 'বলছি, আমি তোমার বাপের বয়সি। তা ছাড়া আমার মতলব খারাপ হলে সাহেব ছাল ছাড়িয়ে নেবে।' বলতে বলতে কাপড়ের গিঁট টেনে খুলল আলি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সুখী দু'হাতে মুখ ঢাকল। কাঁধে চাপ দিয়ে

গরম জলে বসিয়ে দিয়ে মগে জল তুলে মাথায় ঢালতে লাগল আলি। তার গলা পালটে গেল, 'আই বাপ। শুধু নোংরা না, উকুন আছে একশোটা। সাহেব শুনলে লাথি মেরে ফেলে দেবে বাংলো থেকে। ছি ছি ছি।'

সমানে গজগজ করে যাচ্ছিল আলি। সোডা গুলে মাথায় ঢেলে ছোবড়া দিয়ে রগড়াতে লাগল মাথা, ঘাড়। মুহূর্তে জলের রং বদলে গেল। জোর করে সুখীর হাত মুখচোখ থেকে সরিয়ে বলল, 'দ্যাখ, তাকিয়ে দ্যাখ, জলের কী অবস্থা হচ্ছে। জন্মাবার সময় যে রক্ত তোর শরীরে লেগেছিল তাও এতকাল কেউ ধুয়ে দেয়নি, ছি।' মধ্যবয়সি একটি নারী, প্রকৃতি যার শরীর এত অভাবে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেনি, তাকে শিশুর মতো মালিন্যমুক্ত করার চেষ্টা করে গেল আলি অক্লান্তভাবে। একটা সময় এল যখন জলের দিকে তাকানো গেল না। টব থেকে সুখীকে তুলে কালো জল বের করে দিয়ে নতুন ঠান্ডা জল ঢেলে আর এক প্রস্থ রগড়ানো চলল। এবার আধটুকরো সাবান যা সাহেব তাঁর দেশ থেকে এনেছেন তাই দিয়ে শোধনপর্ব শেষ হল। চোখ জ্বলছিল সুখীর। চোখ খুললে জ্বলুনি বাড়ছিল। বুঝতে পেরে তার চোখ ধুয়ে দিল আলি। তারপর জল থেকে তুলে একটা পরিষ্কার কাপড় ওর শরীরে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'ভাল করে সমস্ত শরীর শুকনো করে নে। চুলে যেন এক ফোঁটা জল না থাকে।'

আলির মুখের ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল তার সামনে একটি দু'বছরের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে যার শরীরে কোনও সুতোর আড়াল নেই। সুখী যখন শরীর মুছছে তখন আলির নজর পড়ল ওর নখে। বড় হয়ে বেঁকে গেছে সেগুলো। নখ কাটার নরুণ আনতে হবে কাল। সাহেবের ঘরে আছে। সাহেব বেরিয়ে না গেলে তার ওঘরে ঢোকা নিষেধ।

চুলের জল যাচ্ছিল না, আলি কাপড়টা নিয়ে সুখীর পেছনে গিয়ে ঘষে ঘষে চুল জলমুক্ত করল। মেয়েটার চুল বেশি নেই,

বড়জোর কোমর পর্যন্ত তাও অযত্নে সৌন্দর্য হারিয়েছে। আলি ঘরে ঢুকল। আলনা থেকে একটা স্কার্ট আর জামা তুলে সুখীকে বলল, 'এবার দয়া করে এটা পরে ফ্যাল। সাহেব জিজ্ঞাসা করলে বলবি নিজে নিজে স্নান করেছিস। আমি করিয়ে দিয়েছি শুনলে তোকে তো মারবেই আমাকে মেরে ফেলবে।'

যার স্কার্ট সে সম্ভবত লম্বা ছিল না কারণ তার প্রান্ত সুখীর হাঁটুর ওপর পৌঁছাল। জামাটাও টাইট হল বেশ। একটা ভোঁতা কাঁচি এনে সুখীর পেছনে গিয়ে আলি পিঠের মাঝ বরাবর চুল কেটে ফেলল। তারপর চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে চিরুনির সঙ্গে চুলের মারপিট লেগে গেল। সুখী চিৎকার করতে গিয়েছিল কিন্তু আলি ওর মুখ চেপে ধরল। সেটা বুঝে দাঁতে দাঁত চাপল সুখী। যতটা সম্ভব জট ছাড়িয়ে সুখীকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল আলি।

সুখী হতভম্ব। আয়নায় এ কাকে দেখছে সে? নিজের গালে আঙুল ছোঁয়াল সুখী। তার চেহারা এতটা বদলে গিয়েছে! কী সুন্দর, কত অল্পবয়সি দেখাচ্ছে তাকে। নীল স্কার্ট আর হলদে-সাদা জামায় যে তাকে এমন দেখাবে তা কল্পনাতেও ছিল না। আলির ঠোঁটে হাসি ফুটল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আয়নার সামনে থেকে সরে যেতে ইচ্ছে করছিল না সুখীর। এরকম একটা দিন তার জীবনে যে আসবে তা কে জানত। গাঁয়ে থাকলে—শিউরে উঠল সে। এবং তখনই গাঁওবুড়োর মুখ মনে পড়ল তার। এখন যদি তাকে দেখত তা হলে লোকটা কী ভাবত! চোখ ট্যারা হয়ে যেত, হয়তো চিনতেই পারত না। তবে লোকটা এখন একা নেই। এতোয়াকে ওর সঙ্গে দেখেছে। হোক বাচ্চা ছেলে, কিন্তু মানুষ তো। সবসময়ের সঙ্গী ছাড়া বুড়ো মরে যেত।

আলি ঢুকল, হাতে প্লেট, জলের গ্লাস, 'নে, খেয়ে নে।'

সুখী তাকাল, ভাত আর ওটা কী? মাংস? প্লেট হাতে নিয়ে

সে দ্রুত খেতে লাগল, আঃ। কী আরাম। তবে মাংসটায় কিছু বেশি দিয়েছে ঝাল। জিভ জ্বলছে কিন্তু খেতে ভাল লাগছে। আলি ওর খাওয়া দেখছিল। অভুক্ত জন্তুরা এরকম ভাবে খায়। খাওয়া হয়ে গেলে আলি ওকে বলল বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে আসতে। এইভাবে জল অপচয় করার কথা ওরা গ্রামে কল্পনাই করতে পারে না।

চুল শুকিয়ে গিয়েছিল। আলি তাতে চিরুনি চালিয়ে গুছিয়ে এবং ফুলিয়ে দিয়ে বলল, 'আজ তোকে অনেক শেখালাম। কাল থেকে সাহেব থাকবে না তখন কয়েকটা ইংরেজি কথা শিখিয়ে দেব। শুনে শুনে আমি শিখে গিয়েছি। এখন আমার সঙ্গে সাহেবের ঘরে যাবি। সাহেব যা করতে বলবে করবি। যদি তোকে মারে তা হলে কাঁদবি না, হাসবি। সবসময় হাসি হাসি মুখে থাকবি। বুঝতে পারছিস? চল।' আলি ইশারা করে বারান্দায় পা রাখল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝোলানো হ্যারিকেনের আলো ঘিরে পোকারা নৃত্য করছে।

বাংলোর সদর দরজা দিয়ে আলি সুখীকে নিয়ে এল ড্রইং রুমে। উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে একটা বিশাল হ্যারিকেন। একটি লোক বন্ধ দরজার সামনে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যেন পাহারা দিচ্ছে।

আলি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'সাহাব?'

বন্ধ দরজা দেখিয়ে দিল লোকটা।

আলি দরজায় মৃদু টোকা দিল। কিন্তু কোনও সাড়া এল না। আলি দ্বিতীয়বার আওয়াজ করতেই প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে এল। ভয় পেয়ে লোকটা সরে গেল অনেকটা।

'আলি স্যার।' কুণ্ঠিত গলায় বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বলল আলি।

'ঠিক হ্যায়।'

আলি মাথা নেড়ে সুখীকে ইশারা করল ভেতরে যাওয়ার জন্যে। দরজাটা ঠেলে ফাঁক করে দিল সে। চিৎকার শুনে

বুকের ভেতরটা নড়ে গিয়েছিল সুখীর। আলি তার কাঁধ ধরে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা টেনে দিল।

দুটো হ্যারিকেন জ্বলছে ঘরের দুই প্রান্তে। বালিশে হেলান দিয়ে হেগসাহেব মদের গ্লাস হাতে নিয়ে তাকালেন। তাঁর চোখে বিস্ময়! যাকে দেখছেন তাকে যেন আগে দ্যাখেননি।

বললেন, 'হু আর ইউ?' তাঁর গলার স্বর জড়ানো।

সুখী কেঁপে উঠল।

সাহেব গ্লাসের মদ একসঙ্গে গলায় ঢেলে সোজা হয়ে বসলেন, 'তুমি কৌন?'

সুখী তাকাল, 'সুখী।'

'সুখী? সুখী সুসান! মাই গড। হোয়াট এ চেঞ্জ?' ইশারায় মদের বোতল দিতে বললেন হেগসাহেব। কাজ করার সুযোগ পেয়ে যেন বেঁচে গেল সুখী। দ্রুত হুকুম পালন করল। গ্লাসে মদ ঢেলে বোতল সুখীর হাতে ফেরত দিয়ে আবার তাকালেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে কাছে ডাকলেন। কাঁপা পায়ে সুখী কাছে যেতে ওর শরীরের গন্ধ শুঁকলেন শব্দ করে, তারপর বললেন, ঠিক হ্যায়।

হেগসাহেবের পরনে একটা সাদা শর্টস। পেশিবহুল বাকি শরীর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। গ্লাস হাতে খাট থেকে নামতে গেলেন তিনি। কিন্তু টাল সামলাতে পারলেন না। হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন কাঠের মেঝেতে। হাতের গ্লাস ছিটকে চলে গেল দূরে। পড়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করে রইলেন। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল সুখী। লোকটা কি মরে গেল? পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেও আলি ছুটে আসছে না কেন? সে ভাবল ওদের খবর দেবে। কিন্তু—!

না। হেগসাহেবের হাত নড়ছে। তার মানে মরেনি। সুখী পাশে গেল। বেকায়দায় পড়ে থাকা শরীরটা কোনওমতে সোজা করল। তারপর চিত করে শুইয়ে দিল। এতবড় শরীরকে খাটে তুলে দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। গ্লাসের মদে প্যান্ট ভিজে গেছে। এখন লোকটাকে একটুও রাগী বলে মনে

হচ্ছে না। বরং তার মনে মায়া এল! ঠোঁটের পাশে কিছু লেগেছিল, হাত দিয়ে মুছিয়ে দিল সে। তারপর একটা বালিশ খাট থেকে এনে মাথার নীচে গুঁজে দিল।

বেঘোরে ঘুমাচ্ছে হেগসাহেব। পাশে বসে পড়ল সুখী। এখন তারও ঘুম পাচ্ছে কিন্তু ঘুমানো উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছিল না। জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ হুক্কা হুয়া শব্দ কানে আসতেই সে চমকে হেগসাহেবের কাছে গেল। একটা নয়, অনেকগুলো প্রাণী যেন দরজার ওপারে চলে এসে ডাকছে। আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছিল। ওই চিৎকারেই হেগসাহেব চৈতন্যে ফিরলেন। চোখ মেলতেই শরীরের পাশে সিঁটকে থাকে সুখীকে দেখতে পেলেন। ঘন্টাখানেকের বিশ্রাম তাঁর শরীরকে আবার চাঙ্গা করে দিয়েছিল। তিনি সুখীর চুলের মুঠি ধরে মাথাটাকে টেনে নামালেন। তারপর শায়িত অবস্থায় সুখীর যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে নজর দিলেন। সেই মুহূর্তে আলির উপদেশ স্মরণে আনায় সুখী যন্ত্রণা ভুলে ঠোঁটে হাসি ফোটাতে চাইল। ব্যাপারটা মুগ্ধ করল হেগসাহেবকে। তিনি আগ্রাসী হলেন। তাঁর চুম্বনের শব্দ শেয়ালগুলোর আওয়াজকেও ছাপিয়ে গেল।

সকালে অনেকগুলো চমক ছিল। মাংরার ছোট ছেলেটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে শুয়েছিল মাথার পাশে দরজার ধারে। হাওয়া ঢুকবে বলে দরজা খুলে রাখা হয়েছিল। ভোরবেলায় মাংরার বউ দ্যাখে সে নেই। সদ্য হাঁটার পা হয়েছে। হয়তো বাইরে বেরিয়ে গেছে ভেবে সে উঠে বসতেই দেখতে পেল খানিকটা রক্ত মাটিতে পড়ে শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার। মাংরা ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এল। পাশের ঘরগুলোর মানুষদের ডেকে তুলল। কিন্তু বাচ্চাটা কোথাও নেই। সবাই বুঝল কাল রাত্রে কোনও জন্তু এসে বাচ্চাটাকে নিয়ে গিয়েছে। অতটা রক্ত যখন

পড়েছে তখন বাঁচার সম্ভাবনা নেই।

নতুন জায়গায় প্রথম সূর্যোদয়ের মাঝে মাংরার বউ কাঁদল। কেউ আপত্তি জানাল না। পেছনে ঝরনা আছে, শরীর শুকিয়ে যাবে না। সবাই ঠিক করল, এখানে দরজা খুলে শোওয়া যাবে না। গাঁয়ের মতো নিরাপদ জায়গা এটা নয়।

ক্রমশ শোক একটি পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে গেল। বাকিরা অবাক হয়ে জায়গাটাকে দেখতে লাগল। সবুজ ঘাস, প্রচুর পাতাওয়ালা গাছ, গাছে পাখি ডাকছে। পেছনে একটু হাঁটলেই ঝরনা, ঝরনার জল নাচতে নাচতে ছুটে যাচ্ছে। দৃশ্যটি দেখে মন জুড়িয়ে গেল তাদের। তারপরই আবিষ্কৃত হল, প্রত্যেকের ঘরের পেছনে যে ছোট ঘর আছে তাতে প্রচুর কাঠের টুকরো, একটা বস্তায় চাল, ডাল, আলু আর লবণ রাখা আছে। পাথর জোগাড় করে উনুন তৈরি করল মেয়েরা। তাতে কাঠ ঢুকিয়ে আগুন জ্বালা হল। প্রথমে ধোঁয়া তারপর আগুন। মাটির হাঁড়িতে ঝরনার জল নিয়ে এসে গরম করে চাল ফেলা হল। মেয়েরা বাচ্চারা মুগ্ধ চোখে চালের ভাত হয়ে যাওয়া দেখছিল। আধসেদ্ধ ভাতে আলু আর ডাল ছেড়ে দিয়ে পাতা পেড়ে নিয়ে এল গাছ থেকে। সকাল সাড়ে সাতটায় পেট ভরে খেল সবাই আলুসেদ্ধ মেখে। বস্তুটা যে খিচুড়ির পর্যায়ে চলে গেল তা ওরা জানে না। একটু নুন স্বাদটাকে অমৃত করে দিয়েছিল।

ওরা বলাবলি করছিল। এখানে আসার আগে যাদের মনে সন্দেহ ছিল তাদের ঠাট্টা করছিল। এত সবুজ, মিষ্টি হাওয়া, ঝরনার মিষ্টি জলের কথা ওরা গাঁয়ে থাকলে ভাবতেই পারত না। আর সাতসকালে পেট ভরতি ভাত খাওয়া তো ওখানে কল্পনাই করা যেত না। যে বুড়োবুড়িগুলো গাঁয়ে থেকে গেল তাদের জন্যে কষ্ট হচ্ছিল। বেচারারা জানলই না এত সুখ পৃথিবীতে আছে। এসবের কথা না জেনেই ওরা পৃথিবী থেকে চলে যাবে। কোনও জোয়ান ছেলে বা মেয়ে ওখানে পড়ে নেই।

তাই এক বুড়ো মরলে অন্য বুড়োরা তার সৎকার করবে। এখন এই আরামের জায়গায় এসে মনে হচ্ছে ওরা বেশিদিন বেঁচে থাকবে না। বেঁচে থাকা যায় না। অবশ্য লালমোহন তেলি যদি সাহায্য করে তা হলে আলাদা কথা।

সবাই যখন ভাত রান্না করছে তখন একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল। মাংরা কিছুদূরে বসে আছে হতভম্বের মতো। যে ছেলেটা বেঁচে আছে সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। এইসময় দুখন আর তার বউ পাতায় করে ভাত এবং আলুসেদ্ধ নিয়ে এল তাদের জন্যে। এতকাল শুকনোর সময় যে-যা সংগ্রহ করত তাই সেদ্ধ করে খেত। অন্যকে খাওয়াবার কথা ভাবতেও পারত না। এখানে যে খাদ্যাভাবে মরতে হবে না এই বিশ্বাস তৈরি হওয়ায় দুখনরা মাংরার শোকের মূল্য দিল। মাংরার বউ দুখনের বউকে দেখে আরও জোরে কাঁদার চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত মাংরা যখন উদাসীন গলায় বলল, 'কেঁদে আর কী হবে! যে গেছে সে তো আর ফিরবে না।' তখন বউটির কণ্ঠ স্তব্ধ হল। দুখনও একই কথা বলল।

আশেপাশের সব ঘরে ভাত হচ্ছিল তা মাংরার বড় ছেলে জেনেছিল। এখন সামনে পাতা ভরতি ভাত পেয়ে কেউ আর সময় নষ্ট করল না। খেতে খেতে মাংরা বলল, 'বুঝলি দুখন, ছোটটার খুব বুদ্ধি ছিল, ওই বয়সে কেমন চটপট হাঁটতে শিখেছিল।'

দুখন বলল, 'ওই হয়। যারা ভাল তাদের বাবা ডেকে নেয় তাড়াতাড়ি।'

মাংরার বউ যেন গিলতে হয় তাই গিলছে এমন ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ও এই খাবার কখনও পেট ভরে খায়নি।'

এইসময় সোমরা এল। তার ঘুম ভেঙেছে দেরিতে। পাশের ঘরের লোক ফোটানো ভাত খেতে খেতে দুটো খবর দিয়েছে। এক, পেছনের ঘরে চালডাল আছে, ঝরনার জল নিয়ে এসে সোমরা ফুটিয়ে নিক। দুই, মাংরার বাচ্চা ছেলেকে কাল রাত্রে

এক ভয়ংকর প্রাণী এসে নিয়ে গেছে এত নিঃশব্দে যে কেউ টের পায়নি।

দ্বিতীয় খবরটা শুনে সোমরা চলে এসেছিল এখানে। সে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই দুখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কীরে! ভাত খেয়েছিস?'

মাথা নেড়ে না বলতেই দুখনের বউ বলল, 'চাল ডাল সব আছে তোমার ছোট ঘরে। যদ্দিন বিয়ে না করছ তদ্দিন তো নিজের রান্না নিজেই করবে।'

প্রসঙ্গে না গিয়ে সোমরা মাংরাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাচ্চাটাকে যে নিয়ে গিয়েছে তাকে তুই দেখিছিস? শেয়াল না তো? কাল রাত্রে এখানে অনেক শেয়াল ডাকছিল।'

'আমরা কেউ দেখিনি।' মাংরা ভাত চিবাচ্ছিল।

'এখন থেকে আমাদের সাবধানে থাকতে হবে।' সোমরা বলল।

'বাবা যা চাইবেন তাই হবে।' মাংরা বলল।

'বাবা? বাবা আর কী করে চাইবেন!' গম্ভীর হল সোমরা।

'মানে?' দুখন অবাক। বাবার বিরুদ্ধে কেউ কখনও কথা বলার সাহস পায় না।

'কাল রাতের পর আমাদের জন্যে বাবা ভাববেন না।' সোমরা বলল।

'কী বলছিস তুই?' দুখন চিৎকার করে উঠল।

মাংরা তার দিকে তাকাল, 'এখানে তোর নাম কী?'

'দুখন।'

'না। দুখন ড্যানিয়েল। আমার নাম সোমরা স্যামুয়েল, যিশু নামের একটা লোক এখন থেকে আমাদের দায়িত্ব নেবে। কাল শুনিসনি? সেই যিশু বলেছেন, তোমাদের কষ্ট হলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের শান্তি দেব। আমাদের যে নতুন নাম হল তা ওই যিশুর দলে যাওয়ার জন্যে। যিশুর সঙ্গে বাবার কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে থাকলে আমাদের যিশুকে মানতে

হবে।' সোমরা বেশ জোরে জোরে কথাগুলো বলল।

'না না। বাবা রেগে যাবেন। বাবা রেগে গেলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।' দুখন ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল।

সোমরা বলল, 'ঠিক। কিন্তু সেটা বাবার পৃথিবী, যেখানে আমরা থাকতাম। মানে হচ্ছে এই পৃথিবীটার এক একটা জায়গায় এক একজন বাবার আদেশ চলে। এখানকার বাবার নাম যিশু। যে গোঁয়ার সাহেবটাকে ভয়ংকর রাগী বলে মনে হয়েছিল সে-ও পর্যন্ত যিশুর থানে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। যিশুর শিষ্য কথা শেষ করলে আঙুল দিয়ে বুক কপাল ছুঁয়ে প্রণাম করল। তার মানে যিশুকে সে-ও মানে।'

এইসময় গাঁওবুড়ো আর এতোয়াকে দেখা গেল এদিকে আসতে। তাকে দেখে দুখন বলল, 'শুনেছ কথাটা? এখন থেকে আমাদের মাথার ওপরে বাবা নেই, যিশু নামে নতুন বাবাকে মানতে হবে।'

'তোদের মন যা চায় তাই করবি। গাঁওবুড়ো বলল, 'তোর ছেলেটাকে হারালি এখানে এসে?'

মাংরা মুখ নামাল।

গাঁওবুড়ো বলল, 'এত সুখ চারধারে দেখে আমার মনে হচ্ছে এ আমাদের সইবে না। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে জল নেই খাবার নেই, শুধু কষ্ট। কিন্তু জায়গাটা তো আমাদের ছিল। এই সুখের জায়গা আমাদের বাপঠাকুরদা দ্যাখেনি। এই সুখের দাম আমাদের দিতে হবে। আসামাত্রই দাম দিল মাংরা।' শব্দ করে শ্বাস ফেলল গাঁওবুড়ো।

দুখনের বউ জিজ্ঞাসা করল, 'ভাত খেয়েছ?'

'হ্যাঁ। এই ছোঁড়া দেখতে অতটুকু কিন্তু খুব কাজের।' এতোয়ার কাঁধে হাত রাখল গাঁওবুড়ো।

'কাল সুখী যিশুর থানে আমাদের পাশে এসে বসেছিল। কথা বললে না কেন?' সোমরা জিজ্ঞাসা করল। বোঝা গেল

প্রশ্নটা অন্যদের মনেও ছিল।

গাঁওবুড়ো মাথা নিচু করল, জবাব দিল না।

দুখন বলল, 'আমার মনে হচ্ছে সুখীকে ওরা জোর করে আটকে রেখেছে।'

গাঁওবুড়ো থুতু ফেলল, 'কেউ কাউকে জোর করে আটকে রাখতে পারে? গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেলে কী ক্ষতি হত?'

সোমরা বলল, 'এসব কথা বলার আগে তোমার উচিত সুখীর সঙ্গে কথা বলা। ও কেন তোমার কাছে আসতে পারছে না তা ওর মুখ থেকেই শোনা উচিত।'

এইসময় গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। শব্দটা কানে আসতেই ওরা হুড়মুড়িয়ে ঘরগুলোর সামনে চলে এল। গাড়িটা এসে দাঁড়াল সামনে। তাতে চারজন কর্মচারী বসেছিল। গাড়ি থামতেই একজন কর্মচারী উঠে দাঁড়িয়ে মুখে বাঁশি নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল। তার তীব্র আওয়াজে মানুষগুলো চুপ করল।

লোকটা এবার চিৎকার করল, 'বড় সাহেব বলেছেন চার্চের পাদরিসাহেবের অনুরোধে আজ তোমাদের কাজ করতে হবে না। আজ আরাম করো। তোমাদের খাওয়ার অভাব হবে না। কিন্তু কাল সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তৈরি হয়ে নেবে। এখন তোমাদের কাজ মাটি কোপানো, পাথর পরিষ্কার করা, জঙ্গল কাটা। সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই কাজ করতে হবে। যারা ঠিকঠাক কাজ করবে তারা প্রত্যেক মাসে একটা করে পয়সা পাবে। যে ঠিক কাজ করবে না তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে যে জীবনে ভুলবে না।'

লোকটা থামতেই সোমরা গলা তুলল, 'লালমোহন তেলি বলেছিল হপ্তায় হপ্তায় আমাদের পয়সা দেওয়া হবে।'

প্রধান কর্মচারী তাকাল সোমরার দিকে, 'তোমার নাম?'

'সোমরা।'

'আঃ। তোমার এখানকার নাম বলো যা কাল পাদরিসাহেব দিয়েছেন।'

'সোমরা স্যামুয়েল।'

'হ্যাঁ। স্যামুয়েল, কেউ যদি তোমাদের ওই কথা দিয়ে থাকে তা হলে ভুল দেয়নি। কিন্তু তোমাদের কাজ দেখে তবেই হপ্তায় হপ্তায় পয়সা দেওয়া হবে। তোমরা একশো আটজন পুরুষ এবং মেয়ে কাজে যাবে। প্রত্যেকটা দলে বারোজন করে থাকবে। এই বারোজনের একজন হবে দলের সর্দার।' প্রধান কর্মচারী সঙ্গীদের কিছু বললে তারা গাড়ি থেকে নেমে এদের সামনে চলে এসে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। তারপর আঙুল নেড়ে নয়জন পুরুষকে আলাদা করে দিল। এই নয়জনের মধ্যে সোমরা এবং দুখন ছিল কিন্তু মাংরা বা গাঁওবুড়োকে ওরা ডাকেনি। তারপর ওই নয়জনের দল ঠিক করে দিয়ে গাড়িতে ফিরে গেল ওরা।

প্রধান কর্মচারী আবার উঠে দাঁড়াল, 'তোমরা এখানে নতুন। এখানকার কিছুই তোমরা জানো না। তোমাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, অকারণে এই এলাকার বাইরে যেয়ো না। এখানে বাঘ, চিতাবাঘ, বিষধর সাপ, বাইসন ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর অভাব নেই। সন্ধের অন্ধকার নেমে এলে কেউ ঘরের বাইরে যাবে না। বুঝতে পারছ?'

সোমরা তার দলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, 'কাল আমাদের একজনের বাচ্চাকে কোন জন্তু নিয়ে গিয়েছে। রক্ত পড়েছিল।'

'নিশ্চয়ই ঘরের দরজা খুলে রেখেছিল। আত্মরক্ষার জন্যে সবাই একটা শক্ত বাঁশের লাঠি সঙ্গে রাখবে। আর হ্যাঁ, প্রত্যেক রবিবার সকালে সবাই লাইন দিয়ে চার্চে যাবে। সেখানে পাদরিসাহেব তোমাদের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা জানাবেন। আমাদের বড় সাহেব খুব ভাল মানুষ। তোমাদের পরনের পোশাক দেখে তিনি খুব দুঃখ পেয়েছেন। তাই সদরে লোক পাঠিয়েছেন নতুন পোশাকের জন্যে। সেগুলো যদি আজ বিকেলের মধ্যে এসে যায় তা হলে কাল কাজে যাওয়ার সময়

ওই পোশাক পরে যাবে।' প্রধান কর্মচারী নিজের সিটে বসে পড়লে গাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল মানুষগুলোর মধ্যে। এই সবুজ সুখের পৃথিবীটা হঠাৎ ভয়ংকর বলে মনে হতে লাগল সবার। ওই যে ঘন জঙ্গল, ওখানে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে হয়তো কোনও বাঘ তাদের লক্ষ করছে। মাংরার ছেলেকে যদি কোনও বাঘ নিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে তো তার মনে হবে রোজ রাত্রে একটা করে বাচ্চা খাই। দুখনের পরামর্শে সবাই ছুটল পাশের বাঁশঝোপের দিকে। উদ্দেশ্য বাঁশ ভেঙে লাঠি বানানো। শুধু মাংরা আর সোমরা গেল না।

মাংরা বলল, 'কী রে, যা। তুই তো সর্দার হয়ে গেলি, তুই গিয়ে লাঠি আন।'

সোমরা হাসল, 'তুই যাবি না।'

'না। আমার কী হবে? একটা বাচ্চা গেছে, আর একটা না হয় যাবে। আমাকে তো ওরা পাত্তাই দিল না। আমার ছেলে মরেছে শুনেও না।' মাংরা বলল।

ছেলে মরে যাওয়ায় মাংরার শোক কতটা প্রবল তা সোমরা বুঝতে পারেনি। কিন্তু সর্দার হতে না পেরে যে সে খুব মুষড়ে পড়েছে, তা বুঝতে অসুবিধে হল না। কিন্তু সে কী করতে পারে!

বাঁশগুলোকে ভাঙা যাচ্ছিল না। কয়েকজন মিলে দুমড়ে পেঁচিয়ে যখন কোনওক্রমে গোড়া থেকে আলাদা করতে পারল একটাকে তখন তার অবস্থা খুব করুণ। অতএব বাঁশের বিকল্প হিসেবে অন্য গাছের শক্ত ডাল সংগ্রহ করল ওরা। তারপর শুকনো পাতা, মরা ডাল কুড়িয়ে জমা করতে লাগল এক একটা ঘরের সামনে। বনের পশু যত হিংস্রই হোক, আগুন দেখলে ভয় পাবেই।

খিদে পাচ্ছিল সোমরার। সে ঝরনা থেকে জল আনতে গিয়ে কয়েকটা পুঁটিমাছ ধরে ফেলল। পাথরে ঘষে ঘষে তাদের আঁশ বের করে সমস্যায় পড়ল, কী করে কাটবে। শেষ পর্যন্ত

একটা ছুঁচলো পাথর ব্যবহার করল। তাতে মাছটা আলাদা হল বটে কিন্তু মাংস থেঁতলে গেল। নাড়িভুঁড়ি পিত্তি জলে ফেলে দিয়ে সে ফিরে এল জল আর মাছ নিয়ে। পাশের ঘরটা ছিল মোড়ির। সে আর তার মেয়ে গিয়েছে পাতা কুড়াতে। মোড়ির বউ সোমরার রান্না দেখতে দেখতে বলল, 'সরে যাও, আমি রান্না করে দিচ্ছি।'

সোমরা আপত্তি করল না। কেউ যদি তার উপকার করে নেবে না কেন?

বউটা ঠোঁটকাটা কিন্তু শক্ত শরীর। আগুন জ্বালিয়ে হাঁড়িতে জল বসিয়ে বলল, 'এখানে মাছ পাওয়া যায় বুঝি। আহা, কী ভাল।'

'ঝরনায় গিয়ে ধরে নিয়ে এসো।'

'যাবই তো। এখানে এসে আমি বেঁচে গেছি। নিজের ঘর, নিজের রান্না, পেট ভরে ভাত খাওয়া। এসব তো ওখানে ছিল না। তোমার বউটার কপাল খারাপ তাই এখানে আসতে পারল না। মাছগুলো কি এখনই জলে দেব?' বউটা আচমকা কথা ঘোরাল।

'না। না। আগে চাল সেদ্ধ হোক। তুমি না হয় একটা মাছ নিয়ো।'

বউটা হাসল, 'এবার একটা বিয়ে করো।'

'মেয়ে পাব কোথায়?' উদাস হল সোমরা।

'কেন? যাকে পুকুর থেকে তুলে খেতে দিয়েছিলে—।' বউ চোখের কোণে তাকাল।

বুধনির মুখ মনে পড়ল। সোমরা বলল, 'সে এখন কোথায় কে জানে। তা ছাড়া এত ছেলে থাকতে সে আমার কথা ভাববে কেন?'

'কেন? তুমি কম কীসে? তা ছাড়া তোমার যেমন বউ মরেছে, সে-ও তো বিধবা। খুব মিলবে। ওরও বাচ্চা নেই, তোমারও নেই। দাঁড়াও, আমি দেখছি।' বউ বলল।

'কী দেখবে?'

'আমাদের এখানে ওদের গাঁয়ের কয়েকজনকে ঢুকিয়ে দিয়েছে, কাল দেখেছি। ওদের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু—।' বউ হাসল।

'কিন্তু কী?'

'পাইয়ে দিলে আমি কী পাব?' বউ চোখ ছোট করল।

'আমার কী আছে যে দেব?'

'মাছ খাওয়াবে, মাছ। নদী থেকে ধরে তোমার এখানে রাঁধবে, আমি এসে খেয়ে যাব। ওদের কাউকে বলার দরকার নেই।' বউ কাজ করতে করতে কথা বলতে লাগল।

'কেন?'

'কেন আবার? শুনলে আমাকেই বলবে মাছ ধরে নিয়ে এসে ওদের খাওয়াতে। এরকম অলস লোক আমি জীবনে দেখিনি। আমার কপাল আমি জানি।'

শুধু রান্না করে নয়, ভাত বেড়ে দিয়ে একটা সেদ্ধ মাছ তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে চলে গেল ঘুমাতে। গাঁয়ে থাকার সময় এই সকালে ঘুমের কথা বউ ভাবতেও পারত না।

খাওয়া শেষ করে ঝরনায় এসে হাতমুখ ধুয়ে নিল সোমরা। জলে নিজের মুখ দেখল কিছুক্ষণ। তার দাড়িগোঁফ কম। বেশি বাড়েও না। মুখের কিছু কিছু জায়গায় দাড়ি গজায়নি। দাড়ি কামাবার রেওয়াজ তাদের গ্রামে নেই। বাজারের কেউ কেউ কামাত। লালমোহন তেলির মুখ সবসময় চকচক করে। ঘরে ফিরে এসে নিজের পুঁটুলি খুলল সে। দুটো খাটো ধুতি, একটা এখনও ফরসা। একটা শাড়ি, তার বউয়ের। এইটে তুলে রেখেছিল বউ, আগেরটা ছিঁড়ে গেলেও এটা বের করত না। ওখানে ফেলে না রেখে নিয়ে এসেছিল সোমরা। আর একটা পেতলের নথ। এটা মরে যাওয়ার পর বউয়ের নাক থেকে খুলে নিয়েছে। এই নথ বউ পেয়েছিল শাশুড়ির কাছ থেকে। আর একটা ছুরি। গত বর্ষায় ফসল ওঠার পর বাজার থেকে

কিনেছিল সে। অনেকটা ফসল দিতে হয়েছিল এর জন্যে। পুঁটুলিটাকে আবার বেঁধে রেখে ছুরিটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বের হল সোমরা।

বাইরে তখন ঝরা পাতার পাহাড় জমেছে ঘরগুলোর সামনে। প্রবল উৎসাহে সবাই সঞ্চয় করছে শুকনো ডাল আর পাতা। উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করল সোমরা। কিছুটা যাওয়ার পর জঙ্গল শুরু হয়ে গেল। এইসময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাতে এতোয়াকে দেখতে পেল। প্রথমে রাগ হল। এই ছেলেটা আবার তার পেছনে এসেছে? কিন্তু এতোয়া হাসতেই ওর রাগ কমে এল। 'অ্যাই, কী চাই?'

'কিছু না।' মাথা নাড়ল এতোয়া।

'তা হলে আমার পেছনে আসছিস কেন?'

ঠোঁট কামড়াল বাচ্চাটা। তারপর বলল, 'এমনি।'

মন বদলে গেল সোমরার। বলল, 'ঠিক হ্যায়। আয়।'

এতোয়া দৌড়ে কাছে এসে বলল, 'এখানে অনেক সাপ আছে, না?'

'সাপ?' অবাক হল সোমরা।

'সাপ ধরলে মাংস খাওয়া যাবে, সাপ ধরবে?' এতোয়া তাকাল।

'দুর। এখানে এসে সাপ খেতে যাব কেন? তার চেয়ে অনেক ভাল মাংস আছে।'

'কীসের মাংস?' এতোয়া তাকাল।

'পেছনের ঝরনায় যা, অনেক মাছ পাবি। মাছের মাংস খেতে অনেক মিষ্টি।'

এতোয়া নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। মাছ ধরার চেয়ে সাপ ধরতে বেশি আনন্দ বলে তার মনে হল যদিও কখনও মাছ ধরেনি সে।

এই জঙ্গলেও মানুষ চলার পথ আছে জেনে সোমরা অবাক হল। মাঝেমধ্যে হেঁটে গেলে, একই পথে হাঁটলে, জঙ্গল পথটা

বানিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের আগে এখানে কোনও লোক আসেনি, তা হলে হাঁটল কারা? নিশ্চয়ই জন্তুজানোয়ার। তাদের হাঁটাহাটির জন্যেই পথটা তৈরি হয়ে গেছে। সোমরা সতর্ক হল। যে-কোনও মুহূর্তেই ওরা আক্রমণ করতে পারে। এইসময় কয়েকটা বাঁদর গাছের ডালে বসে প্রবল চেঁচামেচি শুরু করল। এতোয়া তাদের লক্ষ করতে পেরে হুট হুট শব্দ করে লাফাতে লাগল। সোমরা তাকে ধমকাল, 'এ্যাই চুপ। আমার পেছনে হাঁট। সাবধান।'

পাখি ডাকছে। নানান রকমের ডাক। জঙ্গল এত ঘন হয়ে এসেছে যে ভালভাবে হাঁটা যাচ্ছে না। এইসময় একটা বাঁশঝাড় দেখতে পেল সোমরা। লাঠি চাই, শক্ত লাঠি। মিনিট দশেকের চেষ্টায় একটা বাঁশকে আড় থেকে আলাদা করতে পারল সে। ছুরির ধার অনেকটা চলে গেল কাজটা করতে গিয়ে। মোটামুটি লম্বা একটা শক্ত লাঠি তৈরি করে নিয়ে সামনের ঝোপে শক্তি পরীক্ষা করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সাঁ করে একটা কালো আগুন ফণা তুলতেই চকিতে তাকে আঘাত করল সোমরা। সাপটা পড়ে গেল ঝোপ থেকে। দ্বিতীয় আঘাতেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল। হাততালি দিয়ে লাফাল এতোয়া। খুব বড় সাপ নয়। কিন্তু কালো সাপ। এতোয়া ওটাকে তুলতে গিয়েছিল, চুল মুঠোয় ধরে সরিয়ে নিল সোমরা।

হাঁটতে ভাল লাগছিল ওর। এখন এখানে বিচিত্র শব্দ হচ্ছে। এর মধ্যে সাদা লম্বা কানওয়ালা ছোট্ট চেহারার এক ছুটন্ত প্রাণীকে মারতে পেয়েছে সোমরা। হাত দিয়ে বুঝতে পেরেছে মাংসটা বেশ নরম হবে। এইসময় ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ শুনে ওরা আতঙ্কিত হল। বাবার ওখানে যখন মেলা বসে তখন একটা লোক কোথা থেকে দু'-তিন রকমের প্রাণী নিয়ে আসত বিক্রি করার জন্যে। বাজারে কেউ হয়তো কিনত। সেখানে শুয়োর দেখেছে সোমরা। সেই ধরনের প্রাণীকে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল এখন। শুয়োরটাও বোধহয় এই জঙ্গলে

কোনও প্রাণী দ্যাখেনি। থমকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পেছন ফিরে দৌড় মারল, জঙ্গলের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

এতোয়া জিজ্ঞাসা করল, 'মারলে না কেন?'

'মারতে পারতাম না। এই লাঠি দিয়ে ওকে মারা যেত না।'

'কী দিয়ে মারলে মরবে?'

'লোহা চাই। বড় লোহা, সরু।'

'ওর অনেক মাংস, তাই না?'

'হুঁ।'

সোমরা ভাবল আর এগোনো ঠিক নয়। এখন বাঁদরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। শুয়োর যখন বের হয়েছে তখন আরও ভয়ংকর জন্তু সামনে চলে আসতে পারে। ওরা ফেরার জন্যে পা বাড়াল। কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর বুঝতে পারল ওই পথে ওরা আসেনি। অনেকটা সময় চলে গেল জঙ্গল সরিয়ে এগোতে, সূর্য দেখা যাচ্ছে না মাথার ওপর লম্বা গাছের ঘন পাতার আড়াল থাকায়। হঠাৎ জঙ্গলটা পাতলা হয়ে এল। এতক্ষণ যে উদ্বেগ জমছিল তা আচমকা সরে গেল। কিন্তু শেষ গাছটার কাছে পৌঁছে হতভম্ব হয়ে গেল সোমরা। খানিকটা দূরে একটা মানুষের বসতি। তাদের লাইন দেওয়া ঘরগুলো নয়। খাটো চেহারার কয়েকটা মানুষ অলস ভঙ্গিতে বসে কথা বলছে। তাদের শরীরে নেংটি ছাড়া আর কিছু নেই। গায়ের রং কালো নয় আবার সাহেবের মতো সাদাও নয়। ওদের স্বাস্থ্য রোগার দিকে। পেছনের ঘরগুলোর ওপর খড়ের ছাউনি, দেওয়াল মাটির। ঘরগুলোর চালে লতানো গাছ, আশেপাশে চাষ-করা ছোট ছোট গাছে অনেক ফল। দুটো বুড়ি, যাদের শরীরের মধ্যাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ছে।

সোমরা বুঝল এরা এখানেই থাকে। এখানকার মানুষ। কিন্তু ওরা সাহেবদের কাছে কাজ করছে না কেন? সাহেবরাও তো ওদের ধরে এনে কাজে লাগাতে পারত! সেটা যখন হয়নি তখন বুঝতে হবে এদের তেমন অভাব নেই। জোর করে ওদের

দিয়ে কাজ করানো সাহেবদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ওই লোকগুলোকে দেখে লড়াকু বলে কিছুতেই মনে হচ্ছে না।

সোমরা স্থির করতে পারছিল না আর এগোবে কিনা। ওদের দেখলে ওরা কী করবে তাও জানা নেই। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে বললে কি ওরা বুঝতে পারবে? যদি পারে তা হলে কোথায় যেতে চাইছে জানতে চাইলে তো সে বলতেও পারবে না। কিন্তু সূর্য এখন পশ্চিমে ঢলেছে। আর দেরি করা উচিত হবে না। জঙ্গলের ভেতর ছায়া ঘন হয়েছে। এতোয়াকে নিয়ে সে ফিরল।

সন্ধের মুখে একটু ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে এতোয়া চেঁচাল। আকাশে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। বাতাসে কিছু পোড়ার গন্ধ। ওরা সেই জড়ো করা ডালপাতায় আগুন জ্বালেনি তো! ইতিমধ্যে আরও দুটো কালো লম্বা প্রাণী শিকার করে ফেলেছে ওরা। তবে এ দুটো খয়েরি, সাদা নয়। লতায় বেঁধে একটা ডালে ঝুলিয়ে ডালটার দু'দিক ধরে হাঁটছিল ওরা। হাঁটার সময় অন্য হাতে লাঠি জঙ্গলের গায়ে মারতে মারতে চলছিল। আঘাতের আওয়াজের সঙ্গে মুখেও শব্দ করছিল। শব্দ শুনে যদি জন্তুরা ভয় পায়।

শেষ পর্যন্ত ঝরনাটাকে দেখতে পেল ওরা। অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় ওরা আগাছা যতটা এড়ানো যায় এড়িয়ে জোরে হাঁটল। এবার আগুন চোখে পড়ল। দুটো ঘর ছাড়া প্রায় সব ঘরের সামনেই আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে। সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে পরিচিত মুখগুলো পরম বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। আলো এত তীব্র যে ঘরের এপাশটাও দেখা যাচ্ছে।

সোমরার ঘরের পেছনে মৃত প্রাণীগুলোকে নামিয়েই ছুটে গেল এতোয়া।

এইসময় মাংরা এল, 'আরে ব্বাস, এগুলো কী?'

সোমরা হাসল, 'জঙ্গলে গিয়ে মারলাম।'

টিপে টিপে পরীক্ষা করে মাংরা বলল, 'নরম মাংস।'

'তুই একটা নিয়ে যা।'

'নেব? দিবি আমাকে।' সে অবাক।

মাথা নাড়ল সোমরা, 'নে। খা।'

'কীভাবে খাব?'

'ছাল ছাড়িয়ে পুড়িয়ে নে। একটু নুন দিলে ভাল লাগবে।'

'কী করে ছাল ছাড়াব?'

সোমরা আর কথা না বলে নিজের ছুরি দিয়ে একটার পেট চিরল। কয়েকটা টানেই ছালটা বেরিয়ে এসে মাথার কাছে আটকে গেল। মাথাটাকে বিচ্ছিন্ন করে নরম মাংসের দলাটা মাংরার হাতে দিয়ে বলল, 'পেটটা ধুয়ে নিবি ভাল করে।' মাংরা ছাড়াল।

ইতিমধ্যে হইহই আওয়াজ। সবাই আগুন দেখা ছেড়ে দৌড়ে এল মাংরার কাছে। এতোয়ার মুখে শুনেছে সাপের মাংস ফেলে দিয়ে আরও ভাল প্রাণী মেরে নিয়ে এসেছে সোমরা মাংস খাবে বলে। ছাল ছাড়ানো হচ্ছে দেখে সবার চোখ চকচক করছিল। সোমরা এতোয়াকে ডাকল, 'একটা নিয়ে যা, তুই আর গাঁওবুড়ো পুড়িয়ে খাবি।'

একজন বলল, 'একটু এক টুকরো খেতে দিবি এতোয়া, কখনও খাইনি।'

সোমরা ধমকাল, 'কেন দেবে? ও কষ্ট করে ধরে এনেছে তোকে খাওয়াবে বলে। আর তুই তো একা এখানে নেই। এই অল্প মাংস ক'জনকে দেওয়া যাবে? খেতে হলে যাও, নিজে জঙ্গলে গিয়ে ধরে এনে খাও। জঙ্গলে এরকম অনেক আছে।'

কেউ খুশি হল না। দুখন চেঁচিয়ে বলল, 'না। আমাদের ওপর হুকুম আছে বাইরে না যেতে। তুই হুকুম মানিসনি। উলটে ওখান থেকে শিকার করে নিয়ে এসে সবাইকে লোভ দেখাচ্ছিস। কাজটা তুই ভাল করিসনি।' কথাগুলো বলে দুখন চলে গেলে ভিড় সরে গেল। এতোয়া দাঁড়িয়েছিল মাংস হাতে নিয়ে। এবার সে দৌড়াল। ওদের ঘর অনেকটা দুরে।

বাইরে তখন আগুন জ্বালার খেলা চলছে। হঠাৎ কারও

চৈতন্য হল। সব পাতা যদি এখনই পুড়িয়ে দেওয়া হয় তা হলে রাত্রে আলো জ্বলবে কী করে। বড়রা ছোটদের নিষেধ করতে লাগল। আজ বিকেলের মধ্যেই ঘরে ঘরে রান্না শেষ হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে সেটা করার চেয়ে দিনের আলোয় করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে বুঝেছিল তারা। এখন নৈশভোজ শুরু হয়ে গেল।

ঝরনা থেকে জল এনে উনুন ধরিয়ে জল গরম করছিল সোমরা। জল ফুটলে মাংসের টুকরো তাতে ছেড়ে দেবে। কাঠের উনুনের আগুনে ছোট্ট রান্নাঘর বেশ আলোকিত। হঠাৎ কানে এল, 'অনেক হয়েছে, সরে যাও, আমি দেখছি।'

সে মুখ ফিরিয়ে পাশের ঘরের বউটাকে দেখতে পেল। পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে। আজ বোধহয় ঝরনার জলে স্নান করেছে, কাপড় ধুয়েছে।

সোমরা বলল, 'না না। অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে।'

'ইস। অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে! হোক খারাপ। আমি করছি।'

সোমরা যেন বেঁচে গেল। অন্ধকারে ডুবে থাকা ওদের ঘরের দিকে তাকাল। বাইরের আগুন কমে যাওয়ায় এদিকের অন্ধকার বেড়ে গেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে?'

'দিন থাকতে খেয়েছে ওরা। আমি এখনও খাইনি।' বউ গরম জলে মাংসের টুকরো ছাড়ল।

'কেন?'

'ইচ্ছে হয়নি। এটা কীসের মাংস?'

'জানি না। কখনও দেখিনি।'

'খেয়ে যদি মরে যাও।'

সোমরা হাসল, জবাব দিল না। বউটি জিজ্ঞাসা করল, 'জঙ্গলে গিয়ে কী দেখলে?'

'অনেক কিছু। পশু পাখি গাছ। মানুষ।' সোমরা বলল।

'মানুষ? জঙ্গলে মানুষ থাকে নাকি?'

'থাকে।'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারি না। ও হ্যাঁ, তোমার কপাল খারাপ। আমার মতো।'

'তার মানে?'

'ওই মেয়ের নাম বুধনি। ওর গ্রামের লোকের কাছ খবর নিয়েছি।' বউ বলল।

'কী খায়?'

'গ্রামের সমস্ত বুড়ো-ছোঁড়া ওর জন্যে পাগল কিন্তু ও সবাইকে খেলায়, ধরা দেয় না।'

'তাই নাকি?' ভাল লাগল সোমরার।

'শরীরে যার এত যৌবন সে কি উপোস করে বসে আছে! অনেকগুলো বলেই বোধহয় একজনকে বিয়ে করতে পারছে না। ও মেয়ের দিকে নজর দিয়ো না।'

সোমরা হাসল, 'নজর চলে গেলে কী করব?'

'ও মা। একবার দেখেই এই অবস্থা! বউ মরেছে ক'দিন হল?' ধমকাল বউ।

'শরীরে মরেছে ক'দিন আগে, কাজে মরেছে অনেককাল আগে।'

খিলখিল শব্দে হাসল বউ, 'ভাল বলেছ, কাজে মরেছে! তাই বুঝি তুমি খেপে উঠেছ? অনেক ফল দেখতে খুব সুন্দর, খেলে বিষ। এ মেয়ে তেমন হবে বুঝলে।'

'উলটোও তো হয়। কাল যে ফল খেলাম সেটা দেখতেও সুন্দর খেতেও খুব মিষ্টি। না খেলে বুঝব কী করে?' সোমরার কথা শেষ হওয়ামাত্র একটা কাশির শব্দ ভেসে এল। তারপর জড়ানো গলায় ও ডাক শোনা গেল।

বউ ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল, 'সেদ্ধ হলে নামিয়ে নিয়ে ভাত চাপিয়ো। আমি দেখে আসছি।' অন্ধকারেই পাশের ঘরে ঢুকে গেল বউ। সোমরার কৌতূহল হল। সে এগিয়ে গিয়ে ঘরের পাশে

দাঁড়াতেই বউয়ের ঝংকার শুনতে পেল, 'কী হল? ডাকছ কেন?'

'কোথায় ছিলি তুই?' স্বামীর প্রশ্ন।

'রান্না করছি।'

'রান্না করছিস? খাওয়া তো হয়ে গিয়েছে!'

'মাংস রান্না করে দিচ্ছি।'

'সোমরা তোকে মাংস রান্না করতে বলেছে?'

'বলেনি। আমি করে দিচ্ছি। গাঁয়ের সবাইকে তো বলে দিয়েছে, দেবে না। যদি রান্না করে দিই তা হলে আমাদের দিতে পারে।' বউ হাসল।

'বাঃ। তোর বুদ্ধি তো বেশ। চল, আমি যাই, গন্ধটা কেমন দেখি।'

'খবরদার। তুমি যাবে না।' বউ শাসাল।

'কেন? আমি গেলে কী হবে?'

'একটা টুকরোও পাবে না। তোমাকে দিলে অন্যদের দিতে হবে। তারা ছাড়বে কেন? মাংস যখন বেশি নেই তখন কাউকেই দেবে না।'

'ও। তা হলে?'

'চুপচাপ শুয়ে থাকো। আমি তোমাদের জন্যে দু'টুকরো চেয়ে নিয়ে আসব লুকিয়ে।'

'বাঃ। খুব ভাল। পরিশ্রম করছিস আজ তখন তোকে দিতে বাধ্য।'

'না। বাধ্য নয়। ও তো আমাকে খাটতে বলেনি। আমি ভাবলাম তোমরা তো অনেকদিন ভাল মাংস খাওনি তাই গায়ে পড়ে মাংসটা রাঁধতে চাইলাম।'

একটা আহ্লাদের শব্দ বের করে স্বামী হাসল। বোধহয় আবার শুয়ে পড়ে বলল, 'যদি ঘুমিয়ে পড়ি ডেকে তুলবি। বুঝলি?'

দ্রুত সরে এল সোমরা। দশটা টুকরো হয়েছে। তা থেকে দু'-তিনটে দেওয়াই যায়। কিন্তু বউটার মনে এই মতলব ছিল তা কে জানত।

'সেদ্ধ হয়েছে?' বউ ফিরে এল। এসে রান্নাঘরে ঢুকে জলে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'ওমা, হয়ে গেছে। তুমি কী, আকাশের তারা গুনছ না বুধনির কথা ভাবছ?'

সোমরা তাকাল। হাঁড়ি নামাচ্ছে বউ দুই হাতে। নামাবার সময় ছোট্ট আঁচল কাঁধ থেকে পড়ে গেল পাশে। কমে আসা কাঠের আগুন তার বুকে ঝাঁপিয়ে আভা ফেলতেই তা দৃশ্যমান হল। সেই অবস্থায় বউ ফিরে তাকাল, 'এ্যাই এদিকে কী দেখছ?'

'মাংস দেখছি!'

'ও, তাই বলো। কী সাধুপুরুষ।'

ভাত চাপিয়ে দিয়ে বউ বলল, 'তুমি কি ভাতের সঙ্গে খাবে। অনেকটা জল আছে।'

'তাই খাব। তুমি তিনটে টুকরো নিয়ে যাও।' সোমরা বলল।

'তিনটে টুকরো?'

'বাঃ। তোমরা তো তিনজন।'

'খুশি মনে দিচ্ছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'জানো, ওকে বলেছি রান্না হয়ে গেলে মাংস এনে দেব। তা হলে আমার ওপর আর রাগ করবে না। খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি না দিলে—।' বউ কথা শেষ না করে একটা পাতায় দুটো টুকরো তুলে অন্ধকারে হেঁটে চলে গেল।

কেন তিনটে নয়, দুটো টুকরো নিয়ে গিয়েছিল বউ তা বুঝতে পারল মিনিট দশেক বাদে।

সোমরার ভাত তখন ফুটছে, চমৎকার গন্ধ বের হচ্ছে। আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এইসময় বউ ফিরে এসে বলল, 'মানুষটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খেয়ে নিল।'

'তোমার ছেলে?'

'যেমন বাপ তেমন ছেলে।'

'তোমার মাংসের টুকরো নিয়ে যাও।'

'বাব্বা! তাড়িয়ে দিচ্ছ?' বউ সোমরার পেছনে এসে দাঁড়াল।

সোমরা হাসল! 'তোমার হলটা কী? গাঁয়ে তো আমার সাথে কথাই বলতে না।'

'তখন তোমার বউ ছিল। সরো, ভাত নামাচ্ছি।'

ভাত বেড়ে খেতে দিল বউ। অতটুকু জায়গায় বসে না খেয়ে সোমরা বাইরে বসে খেল। কী আরামের স্বাদ, মাংসটা এত তুলতুলে যে জিভে দেওয়ামাত্র গলে যাচ্ছিল। মাংসের জল দিয়ে ভাত মেখে সেদ্ধ আলু নুনে জড়িয়ে খেতে খুব ভাল লাগছিল। খেতে খেতে সে লক্ষ করল মাংসের টুকরো চিবোতে চিবোতে বউ তার খাওয়া লক্ষ করছে।

খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র একটা গোঙানির শব্দ কানে এল। সোজা হয়ে দাঁড়াল সোমরা। জন্তুর গোঙানি। লাঠিটাকে অন্ধকারে দেখতে পেল না সে। দ্রুত গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি ঘরে যাও।'

বউ বলল, 'কেন? কী হয়েছে?'

সেইসময় শেয়ালের চিৎকার শুরু হল। ভয়ংকর হয়ে গেল পরিবেশ। তার পরেই যে হুংকার কানে এল তাঁতে শরীর হিম হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। সোমরা কয়েক লাফে তার ঘরে চলে এসে বাইরের দরজাটা বন্ধ করল। এক পলকেই বুঝতে পারল ডালপাতার আগুন নিভে এসেছে। ভেতরের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে সে তখনও রান্নাঘরের সামনে বউটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উত্তেজিত চাপা গলায় বলল, 'ঘরে যাও, ঘরে যাও।'

বলামাত্র বউ দৌড়ে চলে এল তার দরজায়। আর তখনই একটা বিশাল প্রাণীকে লাফিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল রান্নাঘরের সামনে দিয়ে। বউকে টেনে ভেতরে এনে দরজা বন্ধ করে দিল সোমরা। প্রাণীটাকে সে ভাল করে দ্যাখেনি কিন্তু লম্বায় একটা গোরুর চেয়ে বেশি, গায়ের রং এত উজ্জ্বল যে অন্ধকারেও ঝিলিক মেরেছিল। বউ প্রাণীটার কথা জানে না

তাই হাসতে রইল, 'এত ভয় কেন?'

'তুমি মরে যেতে। এখনই মরে যেতে।' সোমরা ফিসফিস করল।

এইসময় হুংকারটা এত কাছ থেকে শোনা গেল যে বউ ভয় পেয়ে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। ধরে কাঁপতে লাগল। এই ঘর যে একটুও নিরাপদ নয় তা সোমরা বুঝতে পারছিল। ওরকম হুংকার যে দিচ্ছে সে সহজেই বাখারির বেড়া ভেঙে ঢুকতে পারে। রান্নাঘরের সামনে দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার সময় অত বড় শরীর সত্ত্বেও ওর পায়ের শব্দ শোনা যায়নি।

কিছুক্ষণ কোনও শব্দ হল না। এতবড় ভয়ংকর প্রাণী বাইরে গর্জন করছে কিন্তু কোনও ঘরের মানুষ ওকে তাড়াবার কথা ভাবছে না। যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা কি ওই গর্জনে জাগেনি। সারাদিন যে জায়গাটাকে কত সুখের বলে মনে হয়েছে রাত্রে তা যে এক ভয়ংকর হয়ে উঠবে কে জানত। এখন সে বুঝতে পারছে জঙ্গলে যাওয়াটা ঠিক কাজ হয়নি।

ঘর অন্ধকার। পায়ের তলায় খড়ের বিছানা। বউ দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল। মিনিট কয়েক বাদে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল সোমরা। কিন্তু বউ হাত খুলছে না। একটু জোর করতে গিয়ে সোমরার হাতে স্তনের স্পর্শ লাগল। বউয়ের ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনও কাপড় নেই। হঠাৎ যেন হাত অসাড় হয়ে গেল সোমরার। তারপর ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগল বউয়ের অপুষ্ট বুকে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে বউ দরজা খুলে দৌড়াল নিজের ঘরের দিকে। হতভম্ব সোমরা এরকম আচরণের কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না।

ভোর হওয়ামাত্র গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। তারপর ঘণ্টা বাজতে লাগল।

আলো ফুটেছে। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় মানুষগুলো পিলপিল করে এল বাইরে। একটা লরি এসে দাঁড়িয়েছে। একজন কর্মচারী লরির ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'কাল যে দল

তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল সেইমতো আলাদা আলাদা দাঁড়িয়ে যাও।'

এখনও প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলো শেষ করা হয়নি, রান্না তো দূরের কথা। তবু দাঁড়াতে হল, দাঁড়াবার সময় একটু গোলমালও হল। তেত্রিশটা বাচ্চা দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করল। ওদের সঙ্গে নিয়ে কাজে যাওয়া যাবে না। কিন্তু রেখে যাবে কার কাছে? সারাদিন কাটাবে কী করে? কী খাবে? কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব চাইবার সাহস হচ্ছিল না কারও। দু'জন কর্মচারী চাবুক হাতে ওদের আলাদা করল। শেষ পর্যন্ত গাঁওবুড়ো সাহসী হয়ে মুখ খুলল।

গাঁওবুড়োর কথা বুঝতে পারছিল না কর্মচারীরা। ওর গলা ভেঙে গিয়েছে। গাঁওবুড়ো যে দলে তার সর্দার কোনওমতে ব্যাখ্যা করল। কাজে যাওয়ার জন্যে একটু সময় চাই। প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে হবে, খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আর মালিকরা যদি অনুমতি দেয় তা হলে গাঁওবুড়ো থেকে যেতে পারে বাচ্চাদের পাহারা দেওয়ার জন্যে।

সব অনুরোধ বাতিল হয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে প্রধান কর্মচারীর নজর পড়ল এতোয়ার ওপর। এতোয়া বালক কিন্তু শিশু নয়। তাকে গাঁওবুড়োর কাছ থেকে বের করে এনে হুকুম দেওয়া হল শিশুদের দেখাশোনা করার জন্যে। তারপর ওরা ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

ন'টা দলে ভাগ হয়ে মেয়েপুরুষরা ছুটছিল। পেছনে লরিতে বসে আসছে কর্মচারীরা। একসময় সবাইকে দাঁড়াতে বলে লরি থেকে কাটারি নামানো হল। মেয়েদের দেওয়া হল হালকা হাসুয়া। এক এক জন সর্দারকে আলাদা করে জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হল। এই জায়গার যত জঙ্গল ঝোপ রয়েছে সব কেটে পরিষ্কার করতে হবে। ঝোপঝাড় কাটার পর গাছের গোড়াগুলো মাটি থেকে তুলে ফেলতে হবে। তবে সেটা এখন নয়, পরে।

সোমরার দলে ছেলেমেয়ের সংখ্যা সমান। ওকে যে অঞ্চলটা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল বুনো আগাছা, কাঁটাগাছ চাপ বেঁধে আছে। মাটিও ঢালু হয়ে নেমেছে। সোমরা একটু ভেবে নিয়ে সবাইকে বলল গাছের ডাল কেটে শক্ত লাঠি বানিয়ে নিতে। লম্বা লম্বা লাঠি তৈরি হয়ে গেলে ঝোপঝাড়ের ওপর আঘাত করা শুরু হল। যে কর্মচারী ওদের লক্ষ করছিল সে খুশি হল, 'খুব ভাল।'

লাঠির আঘাতে গাছের নরম ডাল ভাঙছে, পাতা খসছে কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ে বেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে কিছু ছোট প্রাণী। কাল যার মাংস খেয়েছিল তার মতো কয়েকটাকেও পালাতে দেখল সোমরা। হঠাৎ উত্তেজনায় একটা সাপ ফণা তুলেছে। তাকে পিটিয়ে মারা হল। রেখে দেওয়া হল একপাশে। দুপুরের মধ্যে বেশ কিছুটা জায়গার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল ওখান দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।

দুপুরে জিপে চেপে হেগসাহেব এলেন। মুখে চুরুট। সোমরাদের কাজ দেখে মাথা নাড়লেন। ঠিক তখনই একজন চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গিয়েও কাটারি চালাল। সোমরা ছুটে গেল ওর কাছে। বিশাল একটা বিছে তখন কাটারির ঘায়ে দ্বিখণ্ড হয়েও নড়ছে। কুচকুচে কালো বিছে। ওদের গাঁয়ে যেসব বিছে দেখা যায় তাদের রং ধূসর, এমন কালো নয়। লোকটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তখন হেগসাহেবকে এগিয়ে আসতে দেখে সে বিছেটাকে আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করল। হেগসাহেব চারপাশে তাকালেন। তারপর লোকটার নেংটির কাপড় টেনে ছিঁড়ে পায়ের ওপর দু' জায়গায় শক্ত করে বাঁধলেন। পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে খাপ খুলে তার ধারালো মুখ দিয়ে লোকটার পায়ের আক্রান্ত জায়গায় গভীর করে কেটে দিতে গলগল করে রক্ত বের হতে আরম্ভ করল। সোমরা লক্ষ করল রক্তের রং ঠিক লাল নয়। লোকটা শুয়ে পড়ে গোঙাচ্ছিল। হেগসাহেব জঙ্গলের একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে হাতে চেপে রস

বের করে ক্ষতস্থানে বসিয়ে দিয়ে উঠে চিৎকার করে হুকুম করলেন কাজ করতে।

লোকটার নাম রেডিয়া। নতুন নাম রোলান্ড। ওর বউ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল স্বামীর দিকে। হেগসাহেবের হুকুম তার কানে পৌঁছাল না। অনেকেই সরে গেলে কয়েকজন তখনও রেডিয়ার অবস্থা বোঝার জন্যে থেকে গিয়েছিল।

হেগসাহেব তাঁর কর্মচারীদের হুকুম দিলেন, 'ওদের একটু বুঝিয়ে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন কর্মচারী লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জন মাটিতে ছিটকে পড়ল, বাকিরা মার খেয়ে পালাল। যারা মাটিতে পড়ল তাদের পেটে, পাছায় বুট পরা পায়ে লাঠি মারতে লাগল ওরা। শেষ পর্যন্ত কোনও রকমে উঠে দূরে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল লোক দুটো।

রেডিয়ার বউ এসব ঘটনার মধ্যে পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিল। একটা কর্মচারী ওর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে দূরে নিয়ে গিয়ে চিৎকার করল, 'কাম চালু!' হেগসাহেব চলে গেলেন অন্য দলের কাজ দেখতে। রেডিয়া পড়ে থাকল সেখানেই।

এখানে দুপুরের সূর্য কোমল নয়। ঘামে ভিজে, পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে একসময় ওরা ধুঁকতে লাগল। কর্মচারীরা দুপুরের খাবার খাচ্ছে একটা গাছের তলায় বসে। তারা হাত নেড়ে সোমরাকে ডাকল। সোমরা কাছে যেতে বলল, 'আধঘণ্টা বিশ্রাম করতে বলো সবাইকে। কিন্তু কেউ যেন এখান থেকে না যায়।'

সোমরা বলল, 'ভুখ লাগা সাব।'

'ভুখ লাগা?' কর্মচারীরা হেসে উঠল হো হো করে। মুখ তুলে গাছ দেখিয়ে বলল, 'খা।'

কথাটা সাহায্য করল ওদের। সোমরা দলে ফিরে গিয়ে বলল, 'এখন কিছুক্ষণ কাজ করতে হবে না। তোমরা সবাই

খুঁজে দ্যাখো এখানে কোনও ফলের গাছ আছে কিনা!'

সঙ্গে সঙ্গে রেডিয়ার বউ ছাড়া সবাই দৌড়াল। রেডিয়ার শুয়ে থাকা শরীরের কাছে যেতে সে সাহস পাচ্ছিল না। একটু কাছাকাছি এসে লক্ষ করল ওর হাত নড়ছে। সেটা দেখে শ্বাস ফেলল, সেও স্বস্তির। সে ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

জায়গাটার পেছনেই বড় গাছের জঙ্গল। ক্ষুধার্ত মানুষগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাছটা খুঁজে পেল। পাশাপাশি দুটো গাছে কাঁটাওয়ালা বড় বড় ফল ঝুলে আছে। ম ম করছে গন্ধ। একটা ফল ফেটে গেছে। তাকে ঘিরে মৌমাছিরা। এই ফল নদী পার হওয়ার সময় দেখেছিল ওরা। চটপট কয়েকটাকে ছিঁড়ে নামানো হল। কিন্তু যেগুলো শক্ত সেগুলোর ছাল ছাড়িয়ে কোয়া বের করা গেল না। ওরা বুঝল এগুলো এখনও কাঁচা। পাকা ফল টিপলেই ফেটে যাচ্ছে। তার ভেতরে সোনালি রঙের রসালো কোয়া। মুখে দিতেই মিষ্টি রসের স্বাদ। একটা ফল দু'জনে খেয়েও শেষ করা যাচ্ছে না।

পেট ভরে গেলে মাংরা বলল, 'আর কোনও চিন্তা নেই। দুপুরে আমরা এই ফল খাব। কিন্তু খবরদার কাঁচা ফল পাড়বি না। নরম হয়ে গেলে তবে নামাবি। কাঁচা ফলগুলোকে পাকতে দিতে হবে।' কথাটা সবাই সমর্থন করল।

সাদামাটা গাছ, ঝোপগুলোকে কাটারি চালিয়ে উৎখাত করতে করতে সূর্য চলে গেছে গাছেদের ওপাশে। গোড়ায় শক্ত শেকড় যাদের আছে তাদের শরীর বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বাকি জায়গাটা এখন পরিষ্কার। অন্য জায়গার তুলনায় একদম আলাদা দেখাচ্ছে। মাটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওখানে।

হুইস্‌লের আওয়াজ হল। আজকের মতো কাজ শেষ। সর্দারদের হুকুম দেওয়া হল দলের লোকজনদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আবার কাল ভোরে বেরুতে হবে। এখন শুধু জঙ্গল কেটে মাটি বের করাই চলবে।

শরীরের রক্ত অনেকটা বেরিয়ে যাওয়ার পরে রেডিয়ার

পক্ষে হাঁটা সম্ভব ছিল না। সোমরার নির্দেশে দু'জন তাকে চ্যাংদোলা করে তুলল। কর্মচারীরা জানাল এখন থেকে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাটারিগুলো সর্দারের কাছে জমা থাকবে। ওদের গাড়ি ফিরে গেল।

এখনও অন্ধকার নামেনি। দলগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে ফিরে যাচ্ছিল তাদের ঘরের দিকে। কিন্তু চারধারে কীরকম একটা থমথমে ভাব, যেন এখনই কোনও অঘটন ঘটে যাবে। আর তারপরেই পাখির চিৎকার শুরু হয়ে গেল। হাজার হাজার পাখি গাছে গাছে ফিরে এসে গলা খুলে চেঁচাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে কেউ বলল বিড়বিড় করে, 'ওরাও ঘরে ফিরল, আমরাও।'

হাতে সময় নেই। অন্ধকার গাঢ় হওয়ার আগে রান্না শেষ করে খেয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করতে হবে। পুরুষরা ঝরনা থেকে জল নিয়ে এল, মেয়েরা রাঁধতে বসল। ঝরনায় গিয়েছিল সোমরাও। সে দেখতে পেল দিন যত চলে যাচ্ছে জলের রং তত কালো হচ্ছে। সারাদিনের ধকলে শরীর টলছিল তার। একটু নির্জন ঝরনাতীরে সে ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়তেই খুব আরাম হল। দু'হাত দূরে জল কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর ধূসর আকাশ। আরামে চোখ জুড়ে গেল তার। ওখানে ওইভাবে শুয়ে থাকা যে নিরাপদ নয় তাও বিস্মৃত হল।

একেবারে কানের কাছে চিৎকার শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সোমরা দেখল চারপাশে ঘন অন্ধকার, কয়েকটা প্রাণী দৌড়ে দূরে সরে গেল। চোখে অন্ধকার সয়ে যেতে আকৃতি দেখে বুঝল প্রাণীগুলো ভিতু। তৎক্ষণাৎ গতরাতে শোনা গর্জনটার কথা মনে এল। সেই প্রাণীটা এখানে এলে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে খেয়ে ফেলত।

কিন্তু যে জন্যে ঝরনায় এসেছিল তার প্রয়োজন এখনও

আছে। প্রাকৃতিক ভাবে সাড়া দিয়ে পরনের কাপড় খুলে পাড়ে রেখে জলে নামল সে। কী ঠান্ডা জল। ঝুপ ঝুপ করে হাঁটুর একটু ওপরের জলেই ডুব দিল সে। এবং তখনই পা ফেলতে পায়ের তলায় পাথরের ওপর লম্বা কিছু ছটফট করে উঠল। হাত বাড়িয়ে তার শরীর ধরে পাড়ে ছুড়ে দিল সোমরা। জলের ওপর ওটাকে তোলার পর বুঝল বেশ ওজন আছে। সাপ হলে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু সাপের মতো দেখতে এই জলের প্রাণীটি ডাঙায় পড়ার পর শুধুই ছটফট করছে। নিজের ছুরি অথবা সাহেবের কাটারি ঘরে রেখে এসেছে সে। তাই একটা পাথর দিয়ে প্রাণীটার মাথা থেঁতলাতে হল। অন্ধকার এখন আর তেমন প্রতিবন্ধক নয়। আবছা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একধরনের মাছ। অর্থাৎ আজও ভাতের সঙ্গে মাংস খাওয়া যাবে।

পরনের কাপড়টা তুলতে গিয়ে সে অবাক। কাপড়টা নেই। যেখানে রেখেছিল সেখান থেকে কাপড়টা কী করে উধাও হয়ে যাবে। সে চারপাশে তাকাতে দূরে সাদা সাদা কিছু চোখে পড়ল। সেদিকে পা বাড়াতেই প্রাণীগুলো দৌড়ে মিলিয়ে গেল। ওদের একজনের মুখে তার কাপড় রয়েছে বুঝতে পারল সোমরা। কাপড়ের জন্যে দৌড়ানো বোকামি হবে। ওরা জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢুকে যাবে। ঘরে আর একটা কাপড় আছে। আর এখন তো অন্ধকার তার উলঙ্গ শরীরকে ঢেকে রেখেছে। লম্বা মাছ আর হাঁড়িতে জল নিয়ে সে নিজের ঘরের পেছনে পৌঁছে গিয়ে অবাক হল।

রান্নাঘরে নিভন্ত আগুন। তার ভাত-আলুসেদ্ধ রান্না হয়ে গিয়েছে। কে করল? নিশ্চয়ই পাশের ঘরের বউটা। ওকে আজ সারাদিন দ্যাখেনি। অন্য দলে থাকায় দেখার সুযোগ হয়নি। মনে মনে খুশি হল সোমরা। আগুনটায় আর দুটো কাঠ গুঁজে দিতে আলো বাড়ল। সেই আলোয় মাছটাকে দেখল। এক হাতের ওপর লম্বা, শরীর গোল। ছুরি নিয়ে এসে মাথা বাদ

দিয়ে টুকরো করল মাছটাকে। অনেকগুলো টুকরো হল। এই মাছের গায়ে আঁশ নেই। হাঁড়িতে জল দিয়ে উনুনে বসিয়ে দিল। আগে জল গরম হোক।

'এম্মা। একী।' অন্ধকারে চাপা স্বর ভেসে এল।

'এদিকে আসার কী দরকার? আমার কাপড় জানোয়ারগুলো নিয়ে গিয়েছে।'

'তাই বলে এমন বাচ্চা ছেলে হয়ে থাকবে নাকি? আর কাপড় নেই?'

'আমার বাড়িতে অন্ধকারে আমি যেভাবে ইচ্ছে থাকব, কার কী?'

'ইস। ভাত রেঁধে দিলাম যেচে তবু রাগ দেখানো হচ্ছে!'

পেছন দিকে না তাকিয়ে সোমরা বলল, 'কাল কী ব্যবহার করেছ মনে নেই?'

'বেশ করেছি। মনে মনে সেই বিধবা মাগির কথা ভাববে আর আমার সঙ্গে!'

'আমি কখন তার কথা ভাবলাম?'

'ভেবেছ। সারাক্ষণ ওর শরীর, চোখের চাহনি ভেবে যাচ্ছ। পরের মাথা খেয়ে বাচ্চা হয়নি বলে ওর শরীর ওরকম আছে। নইলে কী থাকত দেখতাম!' বউ ফোঁসফোঁস করে উঠল।

'দূর! সে কোথায় আছে তাই জানি না, তার কথা ভাবতে যাব কেন?'

'পুরুষদের বিশ্বাস করি না। এই যে ক'দিন আগে তোমার বউ মরে গেল তার কথা কি তুমি ভাবছ? আমি যে তোমার রান্না করে দিই তা ওর কথা ভেবে।'

'ও। খাওয়া হয়ে গিয়েছে?'

'ক-খ-ন!'

'এখনও ঘুমাওনি যে?'

'পাহারা দিচ্ছিলাম, যদি কোনও জানোয়ার ভাত খেয়ে যায়। ওটা কী?'

'মাছ। খাবে?'

'কত আছে?'

'অনেক।'

' তা হলে দুটো দিয়ো, ওদের খেতে দেব।'

'ওরা তো ঘুমাচ্ছে!'

বউ জবাব দিল না। বলল, 'সরো। ঘরে যাও। এই অবস্থায় আমাকে তোমার সঙ্গে দেখলে গাঁসুদ্ধ লোককে খাওয়াতে হবে।'

'কেন?'

'লোকে কী বলবে জানো না।'

'দুর। ওসব তো গাঁয়ের নিয়ম ছিল। এখানে চলবে না।'

'না চলুক। আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না। আলো লাগছে তোমার গায়ে।'

অতএব রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ঘরে চলে এল সোমরা। বউটার সাহস আছে। কাল রাত্রে ওই ভয়ংকর প্রাণীটার গর্জনের কথা ভুলে গেল কী করে? লাঠিটাকে হাতড়ে হাতড়ে পেয়ে গেল সোমরা। তারপর দরজার কাছে গিয়ে রান্নাঘরের দিকে মুখ করে বসল।

মাছ সেদ্ধ হয়ে গেলে একটা পাতায় দুটো টুকরো তুলে দৌড়ে নিজের ঘরে চলে গেল বউ। সোমরা ওদের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বউয়ের বর তখন উঁ উঁ করছে। চাপা গলায় বউ তাকে মাছের মাংস খেতে বলছে। শেষ পর্যন্ত কথা শুনে মনে হল বরের মুখে নিজের হাতে মাংস গুঁজে দিচ্ছে। নিজের ঘরে চলে এল সোমরা। বরকে সত্যি ভালবাসে বউটা। তার সঙ্গে যে রঙ্গরসিকতা করে তা নেহাতই একটু চপল বলে। যে বউ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীকে ভাল জিনিস পেলে খাইয়ে দেয় তাকে পাওয়া ভাগ্যের কথা। এইসময় দরজায় এসে দাঁড়াল বউ। 'খেয়ে নাও, সব হয়ে গিয়েছে।'

'যাচ্ছি। তুমি তোমাদের টুকরোগুলো নিয়ে যাও।'

'নিয়ে খাইয়ে দিয়ে এসেছি।' বউ হাসল।

সত্যি কথা শুনে ভাল লাগল সোমরার, 'খেয়ে বর কী বলল?'

'বলার মতো হুঁশ আছে নাকি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খেল। ওকে না খাওয়ালে মনে পাপ আসত। তাই খাইয়ে এলাম। আর কিছু বলতে পারবে না ও।' বউয়ের কথা শেষ হওয়ামাত্র দূরে গর্জন শোনা গেল। ভয় পেয়ে বউ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। সর্বনাশ। কী করে খাবে?'

'তোমার ঘরের দরজা বন্ধ আছে?'

'টেনে দিয়ে এসেছি। বাইরে থেকে আটকে দিয়েছি।' বউ অন্ধকারে পা বাড়াতেই পড়ে গেল সোমরার শরীরে হোঁচট খেয়ে। অনেক কষ্টে নির্লিপ্ত থাকছিল সোমরা। কিন্তু শরীরের স্পর্শ পাওয়ামাত্র বউ দু'হাতে সোমরার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি আর কারও কাছে যাবে না, কথা দাও।'

'না গেলে কী হবে?'

'না গেলে আমি রোজ তোমার রান্না করে দেব, আমি তোমার হব।'

'আর তোমার বর?'

'ও থাকবে ওর মতো। এসব ও এখন পারে না।'

'ঠিক আছে, তাই হবে।'

একটা ঝটকা লাগল। অন্ধকারেই সোমরা বুঝতে পারল বউ এখন তারই মতন, উন্মুক্ত।

সমস্ত শরীরে তীব্র যন্ত্রণা, প্রতিটি হাড় টনটন করছে। আজ সেই ভোর থেকে ঘুমাচ্ছে সুখী, কিন্তু ঘুম ভাঙলেই শরীর জানান দিচ্ছে। দুপুরবেলায় আলি এসে তুলল ওকে, 'প্রথম প্রথম ওরকম ব্যথা হবেই। ঘুমিয়ে যাও, পরে ঠিক হয়ে যাবে।'

'প্রথম প্রথম? এ আমার প্রথম প্রথম?'

'দুর! সাহেবের সঙ্গে তো প্রথম। সাহেবের তো তখন হুঁশ থাকে না। নেশা করে একেবারে টাইগার হয়ে যায় তাতেই তাঁর মজা।' আলি হাসল।

'আমি মরে যাব। একদম মরে যাব।' কেঁদে ফেলল সুখী।

'তাই? তোমাকে যদি সাহেব এখানে না নিয়ে আসত তা হলে কী করতে হত জানো? জঙ্গলে মাটির ঘরে থাকতে হত। আলুসেদ্ধ আর ভাত নিজে রান্না করে খেতে। ভোর পাঁচটা থেকে বিকেল পর্যন্ত জঙ্গলে কাটারি চালাতে হত। কাজ না করলেই চাবুক খেতে তুমি। সন্ধের মধ্যে ঘরে ফিরে গিয়ে রান্না করে খেয়ে দরজা বন্ধ করতে হত। ঘরে আলো জ্বলত না।' আলি বর্ণনা দিল।

'সারাদিনে একবার খাচ্ছে সবাই?'

'কাজে যাওয়ার আগে যে রান্না করতে পারবে সে দু'বেলা খাচ্ছে। আর এখানে তুমি পায়ের ওপর পা তুলে আছ। রোজ তোমার জামা কেচে দিচ্ছে চাকর। বাবুর্চির করে দেওয়া রান্না খাচ্ছ। সারাদিন ঘুমাচ্ছ। হুকুম করতে জানলে চাকররাও তোমাকে সেলাম করবে। হ্যাঁ, এসব ভোগ করার জন্যে রাত্রে সাহেব যখন মদ খেয়ে তোমাকে চাইবে তখন তাকে ভোগ করতে দিতে হবে। কোন কষ্ট বেশি তা তুমি ভেবে ঠিক করো। এখন ওঠো, স্নান করবে।' আলি হাত ধরে টানল।

এই ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে সুখী, অথচ আগে ভাবতেই পারত না। এখনও ঠান্ডা গরম জলের টবে তাকে বসিয়ে সাবান দিয়ে শরীর পরিষ্কার করে দেয় আলি। কিন্তু কখনওই ওর আঙুল অন্য কথা বলে না। একেবারে যন্ত্রের মতো সেবা করে যায়। গামছা দিয়ে যখন শরীর মুছিয়ে দেয় তখন শিশুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে সুখী। তার বুক-নিতম্বের সঙ্গে যেন টেবিল-চেয়ারের পার্থক্য নেই আলির কাছে। অথচ লোকটা তো বুড়োহাবড়া নয়।

হলুদ ফুলওয়ালা লম্বা ঝুলের ফ্রক পরিয়ে দিল আলি।

চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে এখন। ঘুরে ঘুরে আয়নায় নিজেকে দেখল সে। তারপর খাবার নিয়ে এল আলি। এই ঘরে আলি ছাড়া অন্য কেউ ঢোকে না, লক্ষ করেছে সুখী । প্লেটে ভাত ডাল ভাজা আর মুরগির মাংস, সঙ্গে পাকা আম। আলি কাঁটা চামচ ছুরি বের করল।

অবাক হয়ে তাকাল সুখী । আলি হেসে টেবিলটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এটা কী?'

'টেবিল। এটা চেয়ার।' গতকাল-শেখা শব্দ দুটো বলল সুখী।

'এখানে বসে খেলে হাত দিয়ে না খেয়ে এগুলো দিয়ে খেতে হয়। এই হাতে চামচ ধরবে, এই হাতে ছুরি। চেষ্টা করো।' আলি দেখিয়ে দিল।

কিন্তু কয়েকবার চেষ্টার পরেও যখন প্লেটটা প্রায় উলটে যাচ্ছিল তখন আলি বলল, 'ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্ত। হাত দিয়েই খাও।'

যেন মুক্তি পেল সুখী, বলল, 'তুমি খেয়েছ?'

'খাব। শোনো সাহেব যদি তোমাকে কিছু করতে বলে তুমি বলবে ইয়েস।'

'ইয়েস?'

'হ্যাঁ। ইয়েস মানে হ্যাঁ।'

'সবকিছুতেই হ্যাঁ বলব?'

'সবকিছুতেই। সাহেব যদি চায় তুমি না বলো তা হলে নো বলবে। না মানে নো।'

'ইয়েস হ্যাঁ, নো না?'

'ঠিক। ভুলবে না।'

মাথা নাড়ল সুখী। মাংসের ঝোলটা সে চেটে চেটে খেল। তারপর মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেব এখন কোথায়?'

'বাইরে। কাজ শুরু হয়ে গেছে তো।'

স্বস্তি পেল সুখী । বলল, 'এই জামাটাও সাহেবের বউয়ের?'

'হ্যাঁ। তোমার তো খুব ছোট হয়েছে। তা ভাল, ছোট জামা পরা ভাল।'

হাতমুখ ধুয়ে ফেলল সুখী। কয়েকটা নিমের ডাল কেটে এনে দিয়েছে আলি। রোজ সকালে-রাত্রে তো বটেই, কিছু খেলে সেই ডাল দিয়ে দাঁত ঘষতে বলেছে তাকে। তীব্র তেতো স্বাদ, কষা ফেনা, তবে ধুয়ে ফেলার পর মন্দ লাগে না।

আলি বলল, 'এবার যত পারো ঘুমাও।'

'আজ রাত্রেও সাহেব ডাকবে?'

'ডাকবে না? বাঘ যে রক্তের স্বাদ পেয়েছে।'

'আমি মরে যাব।'

আলি একটু চিন্তা করল, 'সাহেব কি তোমাকে মদ খেতে বলেছে?'

মাথা নেড়ে না বলল। তারপরই মনে পড়ে গেল সুখীর, 'সেই টেকোটা দিয়েছিল।'

'কোন টেকো?'

'যে আমাকে ওর ঘর-গাড়িতে করে গাঁ থেকে নিয়ে এসে সাহেবকে দিয়েছে।'

'চুপ! খবরদার একথা কাউকে বলবে না। সাহেব শুনলে তোমাকে মেরে ফেলবে।'

বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নাড়ল সুখী।

আলি বলল, 'সাহেব যখন তোমার সামনে মদ খাবে আর তুমি একটু খেতে চাইবে।'

'রাগ করবে না?'

'করতে পারে আবার না-ও পারে।' আলি বলল, 'মদ খেলে তোমার আর ব্যথা করবে না।' আলি চলে গেল।

আয়নায় নিজেকে আর একবার দেখল সুখী। এখন কোনও গাঁয়ের লোক তাকে চিনতে পারবে না। গাঁওবুড়োও না। হঠাৎ লোকটার জন্যে কষ্ট হল। ওকে কে রেঁধে দিচ্ছে? একবেলা খেয়ে কেমন আছে মানুষটা। টেকোমাথা বলেছিল সাহেব ওকে

এখানে নিয়ে আসবে, কিন্তু আসছে না কেন?

জানলায় গিয়ে দাঁড়াল সে। খানিকটা ফাঁকা জমি। তারপর জঙ্গল। বেশ রোদ উঠেছে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটো চারপেয়ে প্রাণী। একটার শিং আছে। গায়ের রং বিচিত্র। চোখ দুটো খুব সুন্দর। গোরুর চেয়ে ছোট প্রাণী দুটো এদিকেই তাকিয়ে। হঠাৎ চারধার কাঁপিয়ে গুড়ুম শব্দ হতে শিংবিহীন প্রাণীটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে স্থির হয়ে গেল। ওর সঙ্গী শব্দটা হওয়ামাত্র পেছন ফিরে এক লাফে জঙ্গলে মিশে গেল। হইহই শব্দ হল। সুখী দেখল দুটো লোক দৌড়ে গেল মৃত প্রাণীটার কাছে। ওদের মুখে হাসি, হরিণটাকে টেনে বনের আড়ালে নিয়ে গেল ওরা।

দুপুরে ভাল ঘুম হয়নি। যখনই ঘুম ভেঙেছে ততবার প্রাণীটার পড়ে যাওয়ার দৃশ্য মনে এসেছে। বিকেলে আলি এলে সে জানতে পারল প্রাণীটার নাম হরিণ। আজ রাত্রে হরিণের মাংস রান্না হচ্ছে। মনখারাপের কথা আলিকে বলল না সে। রাত নামল। সুখী ভাবছিল, সারাদিন বাইরে ঘুরে যদি সাহেবের শরীর খারাপ হয় তা হলে নিশ্চয়ই তার ডাক পড়বে না। কিন্তু আলি এল একটু আগেই, এসে বলল, 'দুটো বাঘ বেরিয়েছে। হরিণ মেরেছে।'

সুখীর মনে হল মানুষ যদি হরিণ মারে তা হলে বাঘ তো মারবেই।

আলি ডাকল, 'চলো।'

ধক করে উঠল বুক, 'সাহেব এসেছে?'

'অনেকক্ষণ। তোমাকে ডাকছে।'

অতএব অসাড় পা নিয়েই এগোতে হল। দরজায় টোকা দিল আলি। ভেতর থেকে হেগসাহেবের গলা ভেসে এল, 'ইয়েস।'

আলি ইশারা করল ভেতরে যেতে। সুখী ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল।

টেবিলে হ্যারিকেন। চেয়ারে বসে সাহেব কিছু লিখছিল।

পেছনে থাকায় সাহেব সুখীকে দেখতে পাচ্ছিল না। লেখা শেষ হলে গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল, 'সুসান।'

কিছু বলা উচিত। জড়ানো হলেও নিজের নামটা কানে আসায় সুখী বলল, 'ইয়েস।'

মুখ ফিরিয়ে তাকাল হেগসাহেব। চোখ বড় হল। এক চুমুকে মদ শেষ করে সামনে এগিয়ে এসে সুখীর পরনের জামা দেখল। তারপর আচমকা হুংকার দিল, 'আলি!'

পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল সুখী। সরে দাঁড়াল। দরজার বাইরে থেকে আলির ভীত গলা শোনা গেল, 'ইয়েস সাহাব।'

'কাম হিয়ার। ইধার আও।' হেগসাহেবের গলা আরও উঁচু পরদায় উঠল।

ধীরে ধীরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই হেগসাহেব বাঁ হাতে আলির জামার কলার ধরে তাকে ওপরে তুলল, 'ইউ বাস্টার্ড, সোয়াইন, মাদার ফাকার। এত সাহস তোর?'

ঝুলন্ত অবস্থায় আলি বলল, 'নো স্যার।'

তাকে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে বিশাল একটা লাথি মারল সাহেব পাছায়। আঘাত খেয়ে আলি কুঁকড়ে যেতে সাহেব তাকে টেনে তুলল, 'ওই ফ্রক ওকে পরিয়েছ কেন?'

'ওর কোনও জামা নেই, তাই—!'

'তাই তুমি আমার বউয়ের জামা পরাবে ওকে?'

'নো স্যার!'

'ওই জামা দেখলেই আমার নেশা কেটে যায়। সেই কঙ্কাল মহিলার কথা মনে পড়ে যায়। উঃ কী বিরক্তিকর ব্যাপার। কাল শহর থেকে ওর জন্যে জামা নিয়ে আসবে, ততক্ষণ ওর কিছু পরার দরকার নেই। ওটা খুলতে বলো ওকে।' সাহেব ফিরে গেল মদ ঢালতে।

আলি সুখীর কাছে দিয়ে বলল, 'জামাটা খোলো।'

সুখী মাথা নাড়ল, না।

'সাহেব দু'জনকেই মেরে ফেলবে না খুললে। খোলো।'

চোখ বন্ধ করে জামায় হাত দিল সুখী। চামড়া ছাড়ানোর মতো সেটা ওর শরীর থেকে খুলে নিয়ে আলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ হাততালির শব্দ হল। চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল সুখী।

'কাম হিয়ার।'

সুখী চোখ খুলল। আঙুল নেড়ে তার দিকে যেতে বলছে সাহেব, 'কাম হিয়ার।'

সুখী বলল, 'ইয়েস।' হো হো শব্দ ছিটকে বের হল হেগসাহেবের গলা থেকে।

একটা বিশাল সাপ হরিণকে গিলবার চেষ্টা করছে। হরিণের দুটো পা ওর পেটে ঢুকে গেলেও বড় শিং থাকায় বাকি শরীর রয়ে গেছে বাইরে। অদ্ভুত শব্দ বের হচ্ছে সাপের মুখ থেকে। জোরে জোরে লেজ নাড়ছে এবং তার ফলে গাছের ডালগুলো ভেঙে যাচ্ছে। কাজ থামিয়ে পুরো দলটা এই দৃশ্য দেখছিল। সাপটা ছিল একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পেঁচিয়ে। ডাল কাটতে কাটতে সেদিকেই যাওয়ার কথা ছিল ওদের। বোকা হরিণ ঝোপের মধ্যে মাথা গুঁজে ডাল কাটার শব্দ শুনছিল। শেষ পর্যন্ত মানুষের ভয়ে পালাতে গিয়ে সাপটার মুখে গিয়ে পড়েছিল। সোমরা ভাবছিল ওর বদলে যদি দলের কেউ সাপটার সামনে পৌঁছাত তা হলে সে এতক্ষণে অদৃশ্য হয়ে যেত।

এইসময় পাহারাদার কর্মচারী এগিয়ে এল। দৃশ্যটা দেখে কিছুই নয় ভঙ্গি করে ওদের ধমকাল। কাজ বন্ধ করে খেলা দেখা চলবে না। সোমরা এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। কোনওমতে বুঝিয়ে বলল, 'সবাই ভয় পাচ্ছে, একটা দৈত্য সাপ যখন এখানে আছে তখন সঙ্গীও থাকবে। ওই সাপ ধরলে কেউ বাঁচবে না।'

কর্মচারীটি একটু ভাবল। তারপর হুকুম দিল সবাই মিলে লাঠিপেটা করে সাপটাকে মেরে ফেলতে। যেহেতু ওর মুখ এখন হরিণের শিঙে আটকে আছে তাই কোনও ভয় নেই। কিন্তু লেজের যা দাপট তাতে ওর কাছে এগোনোই মুশকিল। সোমরা ওর মুখের দিকে চলে গিয়ে লাঠির বাড়ি মারতে লাগল মাথায়। তাই দেখে আরও কয়েকজন এগিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক মার খাওয়ার পর সাপটার প্রাণ বের হল। টানাটানি করে হরিণটাকে বাইরে নিয়ে আসার পর দেখা গেল, যে অংশটা ভেতরে ঢুকেছিল সেই অংশ একটু থেঁতলে গেছে মাত্র কিন্তু ছিন্নভিন্ন হয়নি।

এইসময় গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। কর্মচারী ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাইকে কাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু এরকম ব্যাপার যারা জীবনে দ্যাখেনি তাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না। ইতিমধ্যে হেগসাহেব এসে গেলেন। তাঁকে দেখে কর্মচারী ছুটে গিয়ে ঘটনার বিবরণ দিল। সাহেব সাপটাকে দেখলেন। তারপর হুকুম দিলেন ওর পেট থেকে একটা সরল রেখায় চামড়া কেটে সেটা শরীর থেকে বের করে ফেলতে। লম্বায় প্রায় পনেরো ফুট সাপের চামড়া যেন মাথা বাদ দেওয়ার পর বারো ফুট হয়। চামড়াটা বাংলোয় পাঠাতে হবে।

হেগসাহেব চলে গেলেন। সোমরা লক্ষ করল কাজ না করার জন্যে সাহেব আজ কোনও বকাঝকা করেননি। ওঁর মনটা কোনও কারণে ভাল বলে মনে হচ্ছে।

কর্মচারীর নির্দেশে সাপটার চামড়া শরীর মুক্ত করা হল। বিশাল চামড়া ভাঁজ করে দু'জন লোকের পক্ষে তোলা সম্ভব হচ্ছিল না। ওটাকে লরিতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ইতিমধ্যে দলের সবাই মাংস কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাটারি দিয়ে সাপের শরীর থেকে মাংস কেটে বড় বড় পাতায় রাখছে।

মেয়েরা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কী সাপ?'

'অজগর। সাপের রাজা।'

'খুব বিষ?'

'না। এই সাপের বিষ থাকে না। এ সব গিলে খায়।' কর্মচারী জবাব দিল।

'ওর শরীরে তা হলে বিষ ঢোকেনি?' মৃত হরিণটাকে দেখাল সোমরা।

'হরিণ? না। ওটাকে কাটো। ওর মাংস আমরা নিয়ে যাব।' কর্মচারী বলতেই দেখা গেল আরও দু'জন উর্দি-পরা কর্মচারী এসে উপস্থিত হয়েছে খবর পেয়ে। কীভাবে হরিণের চামড়া নষ্ট না করে ওটাকে বের করে আনতে হবে তার নির্দেশ দিতে লাগল ওরা। সোমরা শুনল ওরা ওই চামড়াও সাহেবের বাংলোয় পাঠাবে। মাংস না নিয়ে চামড়া নিয়ে সাহেব কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল সাপের চেয়ে এই প্রাণী, যার নাম হরিণ তার মাংস নিশ্চয়ই বেশি ভাল। নইলে এরা সাপের মাংসই নিত।

বড় বড় পাতায় পর্যাপ্ত মাংস দশটা ভাগে ভাগ করার পরেও যথেষ্ট থেকে গেল। কর্মচারী বলল, 'খুব ভাল মাংস। তুমি নেবে?'

ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল সোমরা।

'ব্যস। এখন কাজ শুরু করো। জলদি।'

এখন সূর্য পশ্চিমে ঝুঁকেছে। সোমরা চিৎকার করে সবাইকে আদেশটা জানাল। অনেকটা মাংস পাওয়ার ফলে সবাই খুশি হয়ে যখন আবার কাজ শুরু করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই হাড় কাঁপানো গর্জন শোনা গেল। কাছাকাছি জঙ্গল থেকে আওয়াজটা ভেসে আসছে।

কর্মচারী লাঠি তুলে সবাইকে থামতে বলল। অন্য দু'জন কর্মচারী দ্রুত চলে গেল তাদের দলের কাছে। সোমরা জিজ্ঞাসা করল, 'কী ওটা?'

'বাঘ। নিশ্চয়ই মাংস কাটার গন্ধ পেয়েছে বাতাসে। ও এখানে চলে আসার সাহস পাচ্ছে না, এলে খুব বিপদ হবে। এক

কাজ করো, সবাই হাতে হাত লাগিয়ে মাংস চামড়া নিয়ে চলো লরির কাছে। জলদি।' কর্মচারী আদেশ করল।

একবারে হল না। তিনবারে সব স্থানান্তরিত হল।

লরির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল দুটো চামড়া আর হরিণের মাংসের বান্ডিল। কর্মচারী বলল, 'ঠিক হ্যায়, আজ ছুটি। কাল বন্দুক নিয়ে আসতে হবে।'

পাতায় মোড়া কাঁচা মাংস নিয়ে সবাই দৌড়াচ্ছে লাইন দেওয়া ঘরের দিকে। এখনও দিনের আলো যথেষ্ট। বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে না।

রান্নাঘরে হরিণের মাংস রাখল সোমরা। এত মাংস দশজনে খেলেও শেষ হবে না। বউ দেখলে খুশি হবে। দু'দিন ধরে খেতে পারবে। তার পরেই মনে হল রেডিয়ার কথা। সে অসুস্থ বলে ঘরেই রয়ে গেছে। কিছুটা মাংস কেটে নিয়ে সোমরা রেডিয়ার ঘরের উদ্দেশে বের হল। খোঁজাখুঁজির পর ঘরটাকে বের করে রেডিয়াকে ডাকতে সাড়া পেল না।

ঘরে ঢুকল সে। রেডিয়া শুয়ে আছে চোখ বন্ধ করে। ওর পা খুব ফুলে গিয়েছে। গায়ের চামড়া এত গরম যে হাত পুড়ে যাবে মনে হল।

'রেডিয়া, এই রেডিয়া, মাংস খাবি? হরিণের মাংস।'

কথাগুলো কানে যাওয়ায় চোখ খুলল রেডিয়া। কিন্তু আবার বন্ধ করল। গাঁয়ে কারও শরীর খারাপ হলে গাঁওবুড়ো ওষুধ দিত। একটা টিনের বাকসে অনেক শেকড় ডাল শুকনো পাতা থাকত, তা থেকে রোগ বুঝে দিত। কেউ ভাল হয়ে যেত তাড়াতাড়ি, কেউ ভুগতে ভুগতে বেঁচে থাকত। কেউ মরে যেত। গাঁওবুড়ো নিশ্চয়ই সেই বাকসটা সঙ্গে নিয়ে আসেনি। কিন্তু এই জঙ্গলে কি সেইসব শেকড় ডাল পাতা নেই? গাঁওবুড়ো কাজ থেকে ফিরলে ওকে বলতে হবে। ততক্ষণে রেডিয়ার শরীর ঠান্ডা করা দরকার।

কলসি নিয়ে ঝরনায় ছুটল সোমরা। ঝরনায় তখন হঠাৎ

ছুটি-পাওয়ার আনন্দে স্নান করছে নারীপুরুষ। মেয়েদের শরীর প্রায়-বিবস্ত্র কিন্তু স্নানের আনন্দে তাদের মধ্যে কোনও সংকোচ নেই। জল নিয়ে ফিরে এসে রেডিয়ার মাথায়, কপালে ছড়িয়ে দিতে লাগল সোমরা। ওর বাচ্চা ঘরে নেই। এতোয়া ওদের নিয়ে বাইরে খেলা করছে। জলের স্পর্শ পাওয়ার পর একটু একটু করে রেডিয়ার মুখের চেহারা বদলাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বলল, 'খিদে পেয়েছে।'

রেডিয়ার বউ এখনও কাজে। ওদের ঘরে খাবার থাকার কথা নয়। মাংসটা রেডিয়াকে দেখিয়ে রেখে ফিরে এল সোমরা। তারপর আবার ঝরনা থেকে জল এনে উনুন ধরাল। প্রথমে কিছু মাংস সেদ্ধ করতে হবে, তারপর ভাত।

রান্না শেষ হতে-না-হতে সবাই ফিরে এল। পাশের ঘরের বর এসে হাসল 'শুনলাম তোমরা নাকি আজ অনেক মাংস পেয়েছ?' লোকটার নাম ছেগনা। ছেগনা ওঁরাও।

'হ্যাঁ। ঠিক সময়ে তোমার ভাগ পেয়ে যাবে।' সোমরা বলল।

'আমার ভাগ? আমি কী করে ভাগ পাব?' ছেগনা অবাক হল।

প্রশ্নটা শুনে একটু হকচকিয়ে গেল সোমরা। লোকটাকে তার বোকা এবং অলস বলে মনে হত। গাঁয়ে থাকতে তাদের দলে আসত না। প্রশ্নটার মধ্যে কোনও চালাকি আছে কিনা কে জানে।

সে বলল, 'তুমি আমার পাশের ঘরে থাকো, তোমার বউ দয়া করে আমার রান্না রেঁধে দেয়। তাই তোমাকে ভাগ দেওয়া আমার উচিত।'

'না না। আমার ভাগ কেন হবে? ওটা বউয়ের ভাগ। তা সাপটা খুব বড় ছিল?'

'হ্যাঁ। খুব।'

'অনেক মাংস?'

'সব মাংস কেটে নিয়ে আসতে পারেনি ওরা।'

'ইস। আগে যদি খবর পেতাম। অবশ্য পেয়ে কী লাভ হত। পাশের গাঁয়ের এক ছোকরা দেখতে যেতে চেয়েছিল, তাকে এমন চাবুক মারল যে শরীর ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে।'

এইসময় বউ এল। কোনও দিকে না তাকিয়ে সোমরার রান্নাঘরে ঢুকে ঠোঁট ওলটাল, ছেগনা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'এখানে আমাকে আর দরকার নেই। নিজের রান্না নিজেই করে ফেলেছে।' বউ বলল।

সোমরা হাসল, 'আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছি। তাই ভাবলাম! তোমাদের জন্যে অনেক মাংস আছে। নিয়ে যাও।'

'না। আমি সাপের মাংস খাব না। গাঁয়ের সাপ ছিল চেনাজানা। এই নতুন জায়গার সাপ খেয়ে যদি মরে যাই। তার ওপর শুনলাম, এই সাপ নাকি পুরোটা গিলে খায়।' বলে বউ চোখের কোণে তাকাল সোমরার দিকে।

'ভয় নেই। ওটা সাপের মাংস না, হরিণের মাংস। খেতে খুব ভাল। সাহেবরা খায়। ওহো, আমি একটু গাঁওবুড়োর কাছে যাব। রেডিয়ার শরীর খুব খারাপ, যদি ওষুধ থাকে—!'

ছেগনা বলল, 'তা হলে তুমি কিছুই শোনোনি? সাহেব গাঁওবুড়োকে নিয়ে গেছে।"

'কেন কোথায়?'

'তা জানি না। দুপুরে সাহেব এসে কর্মচারীকে কিছু বলতেই সে গাঁওবুড়োকে ডেকে নিয়ে গেল সাহেবের কাছে। তাকে দেখে খুব হাসল সাহেব হো হো করে। তারপর কিছু বলতে কর্মচারী গাঁওবুড়োকে সাহেবের গাড়ির পেছনে উঠতে বলল। গাঁওবুড়ো তো কিছুতেই যাবে না। কর্মচারী ওকে থাপ্পড় মারল। তারপর জোর করে গাড়িতে তুলে দিয়েছিল। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে গাঁওবুড়ো চলে গেল চিরকালের জন্যে।' ছেগনার মুখে শোকের ছায়া।

'কোথায় গেল?' সোমরা জিজ্ঞাসা করল।

'কেউ জানে না।'

বউ চুপচাপ শুনছিল, বলল, 'ভালই হয়েছে। যার বউ বেঁচে আছে কিনা ঠিক নেই তার চলে যাওয়াই ভাল। এখানে এসে তো মোড়লি করতে পারত না, তাই গজরাত।'

সোমরা দেখতে পেল এতোয়াকে। কখন এসেছে টের পায়নি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে গাঁওবুড়োর কথা শুনেছে ও। সোমরা ওকে ডাকল, 'এদিকে আয়।'

এতোয়া এসে দাঁড়াল।

'সারাদিন কিছু খেয়েছিস?'

এতোয়া নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

'বড় পাতা কুড়িয়ে আন। আমার সঙ্গে খাবি, মাংস আর ভাত। যা।' সোমরা বলল।

বাংলোর গেট পেরিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হেগসাহেব চিৎকার করলেন, 'আলি, আলি।'

দোতলার সিঁড়ি কয়েক লাফে অতিক্রম করে মাথা নিচু করে দাঁড়াল আলি, 'জি সাহাব।'

'এই লোকটা যেন কখনও ওপরে না যায়। যদি জানতে পারি ও উপরে উঠেছে তা হলে জঙ্গলে বেঁধে রেখে দেব। ভাল করে বুঝিয়ে দাও ওকে।'

'জি সাহাব।'

'ওকে জিজ্ঞাসা করো কী কাজ করতে পারবে। ওর বউ আমাকে আরাম দিচ্ছে বলে তো ওকে বসে বসে খাওয়াব না। সার্ভেন্ট কোয়ার্টার্সে ওর থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। নামাও ওকে।'

আলি এগিয়ে গিয়ে গাঁওবুড়োকে বলল, 'নীচে নেমে এসো।'

সাহেবের কথাগুলো গাঁওবুড়ো পরিষ্কার বুঝতে পারছিল না। এই বড় কাঠের বাংলোর সামনে এসে, এই গাড়িতে চড়ে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। আলির কথায় চট করে নড়ল না, আলিকে দ্বিতীয়বার বলতে হল।

গাঁওবুড়ো নেমে আসতেই হেগসাহেব আবার গাড়ি ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আধ মাইল দূরে চা বাগানের অফিস হয়েছে। সেখানে একজন বাঙালি কেরানি আর কর্মচারীরা কাজকর্ম করে। আজই একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের আসার কথা। ছোকরা আসছে আসাম থেকে। ইতিমধ্যে সেখানকার চা-বাগানে কাজ শিখেছে। স্কটল্যান্ডের ছেলে। নাম ম্যাথিউস। এখন এখানে মাটি তৈরির কাজ শেষ করতে হবে। কয়েক মাইল এলাকার জঙ্গল কেটে সাফ করে নির্দিষ্ট দূরত্বে ছায়াগাছ লাগাতে হবে। সেইসঙ্গে নার্সারি তৈরি করতে হবে। চা-গাছ সাবালক হতে সময় লাগবে কয়েক বছর। তখন প্রয়োজন হবে অনেক লোকের, বিশেষ করে কাজ জানা লোকের। কিন্তু এই এলাকায় হেগসাহেবই যে শেষ কথা তা ম্যাথিউসকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার প্রথম দিনেই। স্কটিশদের মাথায় তুলতে নেই।

হেগসাহেবের গাড়ি বেরিয়ে গেলে আলি স্বাভাবিক হল, 'তোমার নাম কী?'

'গন্নু ওঁরাও।' গাঁওবুড়ো বলল।

'গ্রামে কী কাজ করতে?'

'খেতি। আমাকে সবাই গাঁওবুড়ো বলে।'

শুনে হাসল আলি, 'এখানে চাষ করতে পারবে? ফুলগাছ লাগাতে পারবে মাটি কুপিয়ে? ফুলের বাগান তৈরি করতে পারবে?'

'গাছ কোথায় পাব?'

'পাবে। সব পাবে। শোনো, পেছনে থাকার ঘর আছে। সেখানে থাকবে। সকাল থেকে সন্ধে এখানে মাটি কুপিয়ে সমান করবে। তারপর বলে দেব কী কী করতে হবে।'

'আমি একা থাকব?'

'শালা। সবাই পৃথিবীতে একাই আসে। কিচেন থেকে ভাত ডাল তরকারি পাবে দু'বেলা। তাই খাবে। আর দুটো জিনিস একদম করবে না।' আলি তাকাল।

বুঝতে পারল না গাঁওবুড়ো। সে বারংবার তার প্যান্ট ওপরে টানছিল। এই নতুন পোশাক আজ সকালে সবাইকে দেওয়া হয়েছে। ছেলেদের দুটো করে খাকি হাফপ্যান্ট, মেয়েদের কালো সায়া আর জামা। প্যান্টটা বেশ বড় হওয়ায় বারংবার টানতে হচ্ছে।

সেটা লক্ষ করে আলি বলল, 'নারকোলের দড়ি আছে, সেটা দিয়ে বেঁধে নেবে প্যান্ট। শোনো, কখনও ভুল করেও ওই সিঁড়িতে পা রাখবে না। রাখলে মরে যাবে। আর কখনও বাংলোর গেটের বাইরে যাবে না। রাত্রে তো নয়ই, দিনেও না। গেলে মরে যাবে।'

বুঝতে না পেরেও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল গাঁওবুড়ো।

'সিঁড়িতে পা রাখলে সাহেব তোমাকে মেরে ফেলবে। আর বাইরে গেলে বাঘ তোমাকে খাবে। দিনেরবেলায় ঢোকে না, রাত্রে এখানেও চলে আসে ওরা। সাবধান।' আলি বলল। তারপর মনে পড়ে যাওয়ায় হাসল, 'তোমার বউ কোথায় জানো?'

মাথা নিচু করল গাঁওবুড়ো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

আলি তাকে বোঝাল, 'তুমি গাঁওবুড়ো ছিলে তোমার গ্রামে, তুমি তোমার বউয়ের মরদ ছিলে সেখানে। এখন এই নতুন জায়গায় তুমি তো আর গাঁওবুড়ো নও, সে-ও তোমার আর বউ নয়। তবু তুমি লাইনঘরে কষ্ট করে আছ, নিজে রান্না করে খাচ্ছ, সারাদিন জঙ্গলে পরিশ্রম করছ বলে মেয়েটার মনে দুঃখ হয়েছে। তুমি যাতে একটু আরামে থাকতে পারো তাই সে সাহেবকে বলে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এখানে তুমি নিজের মনে কাজ করবে, ভাল খাওয়া পাবে। কী খুশি তো?'

'সুখী কোথায়?'

'তোমার সেই সুখী কি আর সুখী আছে? তার নাম সুসান।'

'সুসান?'

'হ্যাঁ। সে এখন মেমসাহেব।'

হঠাৎ অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল গাঁওবুড়োর মুখে।

আলি বলল, 'চলো, তোমার থাকার জায়গা দেখিয়ে দিই।'

'সুখী কোথা আছে?'

'আবার সুখী! ওর নাম এখন সুসান। তাকে দেখতে চাও?'

গাঁওবুড়ো মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

আলি সমস্যায় পড়ল। সাহেব এটা পছন্দ করবে কিনা সে জানে না। না করলে অন্তত একুশবার চাবুক খেতে হবে তাকে। সে চারপাশে তাকাল। তিনজন কাজের লোক তাদের দেখছে। এদের অবশ্য সাহস হবে না সাহেবের কাছে চুকলি খেতে। এখন হঠাৎ যদি সাহেব ফিরে আসে তা হলেই মুশকিল।

আলি গাঁওবুড়োকে বাংলোর পেছনে নিয়ে এল। এখন ছায়া ঘন হয়েছে। পাখিরা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। ওকে দাঁড়াতে বলে পেছনের সিঁড়ি ভেঙে বাথরুমের পেছন দরজায় চলে গেল আলি। দরজাটা ভেজানোই ছিল। বাথরুমের ভেতর দিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকে দেখল সুখী ঘুমে কাদা হয়ে আছে। সে ওকে ডাকল।

তিনবার ডাকার পর সুখীর ঘুম ভাঙল। কিন্তু সে চোখ না খুলে জড়ানো গলায় বলল, 'কেন? সন্ধে হতে দেরি আছে।'

'এত ঘুমালে মোটা হয়ে যাবে!' ধমকাল আলি।

'সাহেব বলেছে আর একটু মোটা হতে।' নিজের নিতম্বে হাত রেখে বলল, 'এটা নাকি খুব রোগা। এসব তুমি বুঝবে না।' চোখ বন্ধ করেই বলল সুখী।

'সাহেবের সব কথা তুমি দেখছি বুঝতে পারছ!'

'একটু একটু।'

হঠাৎ আলির মনে হল, প্রথম দিনের সুখীর সঙ্গে এই মেয়েটার অনেকটাই অমিল। খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে।

'সুখী, ওঠো।'

'আমাকে সুসান বলে ডাকবে। সাহেব বলেছে।'

ঢোঁক গিলল আলি। যেন আচমকা চড় খেল।

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

এবার চোখ খুলল সুসান। কিন্তু উঠল না, 'বলো।'

'সাহেব গন্নু ওঁরাওকে বাংলোয় কাজ করার জন্যে নিয়ে এসেছে। তুমি সাহেবকে বলেছিলে, সাহেব কথা রেখেছে—!'

'গন্নু—।'

'গাঁওবুড়ো।' আলি বলল।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সুসান, 'কোথায়?'

'নীচে। তোমাকে দেখতে চাইছে। কিন্তু সাহেব জানলে রেগে যাবে।'

সুসান চলে গেল আয়নার সামনে। চিরুনি বুলিয়ে চুল ঠিক করল। করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী বলেছ?'

'ওপর থেকে একবার দেখা দাও।'

'ওকে এখানে নিয়ে এসো।'

'পাগল। সাহেব আমাদের তিনজনকেই শেষ করে দেবে।'

অসহায় চোখে আলিকে দেখল সুসান। তারপর কেঁদে ফেলল।

'আরে। কান্নার কী আছে। আমি ওকে বলেছি, ও যেমন এখন গাঁওবুড়ো নয় তেমনি তুমি ওর বউ নও। তোমার দয়ায় ও এখানে ভাল থাকবে।' আলি বলল।

চোখ মুছল সুসান। 'কোথায় ও?'

আলি বাথরুমের পেছন-দরজায় চলে এসে বলল, 'এখানে এসে দাঁড়াও। তবে বেশিক্ষণ নয়, আর কোনও কথা বলবে না।'

একদৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকিয়ে ছিল গাঁওবুড়ো। আলি নীচে নেমে আসতেই যে দরজায় এসে দাঁড়াল সে একজন মেমসাহেব। তবে গায়ের রং সাহেবের মতো নয়। সুন্দর জামা, ফাঁপানো চুল। আলি বলল 'কী বুড়ো, চিনতে পারছ?'

ততক্ষণে মুখটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল গাঁওবুড়োর। সুখী! কী রকম বদলে গিয়েছে বউটা। নিজের বউ বলে দূরের কথা তাদের জাতের কোনও মেয়ে

বলে মনেই হচ্ছে না। বাঁ হাত চুলে বোলাচ্ছে। খাটো চুল। এরকম চকচকে ফুরফুরে চুল ওর ছিল নাকি? মুগ্ধ হয়ে দেখছিল গাঁওবুড়ো। ইদানীং সুখীকে সুখ দিতে পারত না বলে বিছানায় তার কাছে আসতে চাইত না। কিন্তু কারও সঙ্গে ও ফস্টিনস্টি করেনি গাঁয়ে থাকার সময়ে। সেই মেয়ে এত বদলে গেল যে ওর দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে সাহস হচ্ছিল না গাঁওবুড়োর। আবার না তাকিয়েও পারছিল না।

'কী বুড়ো, দেখে কি মনে হয় ও কষ্টে আছে?' আলি জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নেড়ে না বলল গাঁওবুড়ো।

অনেকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে সুসান লোকটাকে দেখছিল। গা-ভরতি ময়লা, চুলে জটা, গালে খোঁচা দাড়ি কিন্তু পরনে খাকি প্যান্ট। এই একটা প্যান্টেই মানুষটার চেহারা বদলে গেছে। দুটো সরু ঠ্যাং, সরু সরু হাত, ছোট্ট বুকের খাঁচা। এই মানুষটার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। শ্বাস ফেলল সে। এখন আর মোটেই কান্না পাচ্ছে না। সে বলল, 'আলি ওকে সব বলে দিয়েছ?'

আলি মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'রোজ এইসময় ওকে এখানে এসে দাঁড়াতে বলবে, আমি দেখা দেব।'

আলি মাথা নেড়ে গাঁওবুড়োকে বলল, 'শুনলে তো। রোজ একবার দেখা পাবে। তোমার আর কোনও সমস্যাই থাকল না। চলো, ঘর দেখবে।'

গাঁওবুড়ো দেখল সুখী চলে গেল আড়ালে। থপথপে পা ফেলে সে আলিকে অনুসরণ করল। টিনের আর কাঠের ঘর। মেঝে সিমেন্টে বাঁধানো, দরজা খুলে আলি বলল, 'এই ঘরে তুমি থাকবে। আমাদের বাবুর্চি নোয়াস ওই খাটিয়ায় শোয়। তোমার জন্যে একটা খাটিয়া পরে আনিয়ে দেব। পেছনে স্নানের ঘর আর পায়খানা আছে। সেখানেই যাবে। আজ তোমাকে কাজ করতে হবে না। সন্ধের পর ভাত দিয়ে যাবে,

খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

আলি চলে গেলে মেঝের ওপর বসে পড়ল গাঁওবুড়ো। চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে যে কালো মেমসাহেবের মূর্তি ভেসে উঠল তাকে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল সে।

হেগসাহেব তাঁর অফিসে বসে কাজ করছিলেন। গতকাল লন্ডন থেকে গোটা চারেক চিঠি এসেছে। এখন থেকে কলকাতার অফিসের সঙ্গে তাঁকে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে বলা হচ্ছে। এইসব চিঠির উত্তর লিখতে হবে। তিনি বেল বাজালে বেয়ারা দরজায় দাঁড়িয়ে সেলাম করল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পড়ি কি মরি করে ঘরে ঢুকে যিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর বয়স চল্লিশের নীচে কিন্তু ইতিমধ্যেই মাথায় বিশাল টাক গজিয়েছে। ধুতির নীচে শার্ট গোঁজা, পায়ে জুতো, শার্টের ওপর ধূসর কোট। হেগসাহেব তাঁর দিকে চিঠিগুলো বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আজই উত্তর লিখে রাখবে। কাল সকালে পাঠাব।'

চিঠিগুলো নিয়ে বাবু বললেন, 'ইয়েস স্যার।'

'আমি যে তোমাকে দিয়ে চিঠি লেখাই তা নিশ্চয়ই কেউ জানে না?'

'নো স্যার।'

'গুড। তা হলে খবরটা ম্যাথিউসকেও জানানোর দরকার নেই।'

'ম্যাথিউস? হু ইজ ম্যাথিউস?'

'যে লোকটা অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হয়ে আসছে। তুমি নাম ভুলে যাও কেন?'

'আই উইল রিমেম্বার স্যার।'

'গো।'

বাবু চলে যাচ্ছিলেন, সাহেব আবার ডাকলেন, 'তোমার মতো ইডিয়টকে দিয়ে কী করে কাজ করাব? উত্তরগুলো কী

হবে তা জিজ্ঞাসা না করেই চলে যাচ্ছ?'

বাবু চিঠিগুলো দেখলেন। প্রতিটি চিঠির পাশে সাহেবের হাতে লেখা মন্তব্য আছে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আপনার গাইডেন্স পেয়েছিলাম, তাই—।'

'হোয়াট ইজ দ্যাট?'

'স্যার, এই চিঠির ভাল উত্তর হবে কারণ আপনি লিখেছেন গুড। এই চিঠির জবাবে একটু আপত্তি থাকবে কারণ—।' বাবু চুপ করে গেলেন।

'কারণ?' হেগসাহেব চোখ ছোট করলেন।

'স্যার, আপনি একটা চার অক্ষরের শব্দ লিখেছেন।'

'গুড। গো অ্যাহেড।'

বাবু চলে গেলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন হেগসাহেব। তারপর গুনগুন করে গাইলেন, 'আই রোট এ ফোর লেটার ওয়ার্ড বাট আই লাভ টু ডু দ্যাট।'

তখনই গাড়ির আওয়াজ কানে এল। তিনি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে জিপটাকে দেখা গেল। জিপ থামতেই দু'জন সাদা চামড়ার মানুষ নেমে এলেন। দু'জনের পরনে হাফপ্যান্ট, হান্টিং সাফারি শার্ট। একজনের বয়স হয়েছে অন্যজন যুবক।

'দিস ইজ হেগ। ওয়েলকাম জেন্টলমেন।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ স্যার। আমি ম্যাথিউস, জিমি ম্যাথিউস। ইনি মিস্টার রবার্ট ক্লার্ক।' ম্যাথিউস হাত বাড়ালেন, হেগ করমর্দন করলেন। তারপর ক্লার্কের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'ম্যাথিউসের আসার খবর আমি পেয়েছি, কিন্তু আপনার কথা জানতাম না।'

উত্তরটা ম্যাথিউস দিল, 'স্যার, কোম্পানি মিস্টার ক্লার্ককে পাঠিয়েছে সব ক'টা বাগান একবার ঘুরে দেখার জন্যে। উনি আমাদের হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি।'

হেগসাহেব করমর্দন করে বললেন, 'আগে জানতে পারলে আপনার জন্যে বিশেষ আতিথ্যের ব্যবস্থা করতে পারতাম।

আপনি অবশ্য জানেন এরকম সভ্যতাবর্জিত জায়গায় উপযুক্ত আতিথ্য দেওয়া খুব কঠিন ব্যাপার।'

'মিস্টার হেগ।. আমাকে অতিথি হিসেবে ভাবছেন কেন? আমি তো কোম্পানির লোক।'

ম্যাথিউস চারপাশে তাকাচ্ছিল। ছোকরার ঠোঁটের ওপরে যে গোঁফ রয়েছে তার পেছনে নিশ্চয়ই সময় দিতে হয়। ওকে পছন্দ হল না হেগসাহেবের।

অফিসঘরে নিয়ে এলেন ওঁদের। মিস্টার ক্লার্ক পাইপ ধরালেন।

হেগসাহেব বললেন, 'আমাদের এখানে চা এখনও পরিকল্পনার মধ্যে। তবে দার্জিলিংয়ের চা আমি আনিয়েছি। আপনারা যদি তার স্বাদ নেন।'

বেল বাজালেন তিনি। বেয়ারা সেলাম জানাতেই আদেশ দিলেন।

ক্লার্ক পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'দার্জিলিং, একটা উদাহরণ। আঠারোশো ছাপ্পান্নতে প্রথম চা বাগান তৈরি হয় সেখানে। মাত্র আঠারো বছরে চল্লিশটি লিমিটেড কোম্পানি, সতেরোটি অ্যাসোসিয়েশন, সত্তরটি নিজস্ব মালিকানা ছাড়া গোটা ছয়েক ল্যান্ড মর্টগেজ মালিকানায় চা-বাগান চালু হয়ে গিয়েছে।'

ম্যাথিউস বললেন, 'আসামে চা-বাগান চালু হয়েছে আঠারোশো উনচল্লিশে। দার্জিলিংয়ের সতেরো বছর আগে। আমার সঙ্গে আসামের চা আছে, আপনার জন্যে।'

'ধন্যবাদ।' হেগসাহেব মাথা নাড়লেন।

'আপনি তো লেবার পেয়ে গেছেন!' ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ। সবে এসেছে। কিন্তু লোকগুলো একে দুর্বল তার ওপর গবেট। তা ছাড়া এরা একগাদা বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। অথচ ভাল টাকা নিয়েছে এজেন্ট।' হেগসাহেব বললেন।

'সর্বত্র একই অবস্থা। কিন্তু কোম্পানি চাইছে না লোকাল লোকদের কাজে নিতে। অবশ্য ওরাও উৎসাহী নয়। এখন কী কাজ হচ্ছে?'

'জঙ্গল কাটানো হচ্ছে। খুব শক্ত কাজ। এক একর জমি ঠিক হয়ে গেলে প্রথমে নার্সারি বানাব, তারপর অন্য জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ চলবে।' হেগসাহেব জানালেন।

বাইরে তাকালেন ক্লার্ক। ছায়া ঘন হয়ে আসছে।

'এখানে সন্ধে হয় কখন?'

'হয়ে এল। কেন?'

'একবার লেবারদের কাছে যেতে চাই।'

'এখন যাওয়া ঠিক হবে না। সন্ধের পর বাঘের দৌরাত্ম্য খুব বেড়ে যায় এখানে। তা ছাড়া বাইসনও আছে প্রচুর।'

'ওয়েল, তা হলে কাল সকালে?'

'ভোর পাঁচটায় ওদের কাজের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এক একটা গ্রুপ বিভিন্ন জঙ্গলে আলাদা হয়ে কাজ করে। ওদের দেখা সেখানে পেতে পারেন।'

মিস্টার ক্লার্কের এই ইচ্ছের কারণ বুঝতে পারছিলেন না হেগসাহেব।

চা এল। টিপট, ভাল পেয়ালা প্লেট, আলাদা দুধ এবং চিনি।

ম্যাথিউস এগিয়ে গেলেন চা ঢালতে। হেগসাহেব লক্ষ করলেন ছোকরা তিনটে প্লেটে এক ফোঁটা চা ফেলল না।

চা খেতে খেতে ক্লার্ক বললেন, 'কোম্পানি চাইছে লেবারদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে। যারা কাজ করবে তাদের শরীর মজবুত হওয়া দরকার।'

হেগসাহেব হাসলেন, 'মিস্টার ক্লার্ক, লন্ডনে বসে আমাদের কর্তারা যেসব চিন্তা করেন তা এই গভীর জঙ্গলের আদিম পরিবেশে কতটা মানানসই একথা ওঁদের কে বোঝাবে। এখানে আমি একমাত্র ম্যানেজার, বাবু স্টাফও একজন। কর্মচারীর সংখ্যা বড়জোর পঁচিশ। অথচ লেবারদের সংখ্যা আমাদের

চার-পাঁচ গুণ। ওরা যদি শক্তিশালী হয়ে আমাদের আক্রমণ করে তা হলে কে বাঁচাবে? কেউ না, তবু, কথাটা আমি মনে রাখব।'

চা শেষ করে মিস্টার ক্লার্ক বললেন, 'আপনি জানিয়ে দিন আগামীকাল ভোর পাঁচটার বদলে সকাল সাতটায় ওদের কাজ শুরু হবে। তার আগেই আমি নিশ্চয়ই সেখানে যেতে পারব। কারণ কাল দুপুরেই আমাকে অন্য বাগানে যেতে হবে।'

লোকটার মতলব কী বুঝতে পারছিলেন না হেগসাহেব। কিন্তু তিনি ধৈর্য হারালেন না।

চা-পর্বের পর বাবু এবং কর্মচারীদের সঙ্গে ওঁদের আলাপ করিয়ে দিলেন। ম্যাথিউস বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডু ইউ নো ইংলিশ?'

মাথা নিচু করে বাবু জবাব দিলেন, 'আই ক্যান ম্যানেজ স্যার।'

'কতদূর পড়াশুনা করেছ তুমি?'

'নট মাচ স্যার। আপটু সেকেন্ড ক্লাস।'

'ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড অ্যান্ড স্কটল্যান্ড, এই তিনটে মিলে কী বলা যায়?'

'গ্রেট ব্রিটেন স্যার।'

'এই তিনটের মধ্যে কে সেরা?'

'ইংল্যান্ড স্যার।'

'হোয়াই? হোয়াই নট স্কটল্যান্ড?'

'কারণ সেখানে মহারানি থাকেন না।' বাবু, জবাব দিল।

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিলেন মিস্টার ক্লার্ক, 'ম্যাথিউস, এত ভাল উত্তর আমিও দিতে পারতাম না। মিস্টার হেগ, এরকম একজনকে পেয়ে নিশ্চয়ই তুমি উপকৃত হয়েছে।'

হেগসাহেব হুকুম করলেন, 'এখন তোমরা যে-যার কাজে যাও।' তারপর ওঁদের দিকে ঘুরে বললেন, 'জেন্টলম্যান। আমি জানি আপনারা আজ খুব পরিশ্রান্ত। কিছুদিন আগে আমরা

একটা গেস্টবাংলো বানিয়েছি, চলুন, সেখানে আপনাদের পৌঁছে দিচ্ছি।'

নিজের গাড়ি চালিয়ে পথ দেখিয়ে হেগসাহেব গেস্ট বাংলোতে ওঁদের নিয়ে এলেন। সেখানে শুধু চৌকিদার ছাড়া কোনও কর্মচারী নেই, দরকার পড়ে না বলে। হেগসাহেবের বাংলো থেকে এর দূরত্ব প্রায় সিকি মাইল। চারপাশের জঙ্গল যেন ঘিরে ধরেছে বাংলোটাকে।

গাড়ি থেকে মালপত্র নামানো হল। চৌকিদার আর ড্রাইভার সেগুলো ওপরে নিয়ে গেল। হেগসাহেব দেখলেন দুটো বন্দুক রয়েছে এদের মাঝে।

ঠিক হল নিজের বাংলো থেকে দু'জন কর্মচারীকে হেগসাহেব পাঠিয়ে দেবেন এখানে ফাইফরমাস খাটার জন্যে। খাবার আসবে হেগসাহেবের কিচেন থেকে।

ঘর দেখে পছন্দ হল ওঁদের। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের বাংলো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ম্যাথিউস এখানেই থাকবেন।

ঝুপ করে সন্ধে হয়ে গেল। হ্যারিকেন জ্বালানো হল।

বেতের চেয়ারে বসে মিস্টার ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করলেন, 'লেবারদের কাউকে বাঘ কি আক্রমণ করেছে? এনি ইনসিডেন্ট?'

হেগসাহেব মাথা নাড়লেন! ওরা রাত্রে ঘরের বাইরে যায় না।'

ম্যাথিউস বললেন, 'স্যার, আমার সঙ্গে স্কটল্যান্ডের হুইস্কি আছে, যদি একটু পান করেন তা হলে খুশি হব।'

হেগসাহেবের মন ভাল হয়ে গেল, 'গুড। বের করো। তোমার বয়স অল্প কিন্তু তুমি দেখছি ঠিক বুঝতে পারো কোন সময়ে কী দরকার। এই আদিম জায়গায় মদ ছাড়া সময় কাটানোই মুশকিল।'

মিস্টার ক্লার্ক বললেন, 'আপনি তো একাই থাকেন?'

'হ্যাঁ। আমার স্ত্রী এখানে থাকতে পারলেন না। অবশ্য পঞ্চাশ

মাইল দূরে ইউরোপিয়ান ক্লাবে গেলে কয়েকজন মহিলার দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা বিবাহিতা, স্বামীর সঙ্গে আসেন। শুনছি মিসেস ম্যাকডোনাল্ডের দুই বোন আসছেন। অবিবাহিতা। ম্যাথিউস, তুমি গিয়ে চেষ্টা করতে পারো। আমাদের তো বয়স হয়ে গিয়েছে।'

মিস্টার ক্লার্ক তাকালেন। কিছু বলতে গিয়েও বললেন না।

ম্যাথিউস বেশ গোছানো যুবক। তার কাছে শুধু স্কচ হুইস্কি নয়, ভাল কাজুবাদাম এবং কিসমিসও রয়েছে। অতএব রাত ন'টা পর্যন্ত মদ খাওয়া চলল। মিস্টার ক্লার্ক মাত্র দু'বার খুব সামান্য নিলেন। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে ম্যাথিউসের গলার স্বর ভারী এবং জড়িয়ে গেল।

হেগসাহেব সেটা বুঝেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ইন্ডিয়ায় এলে কেন? আর এলেই যদি এই প্রফেসনে কেন? হোয়াই টি প্ল্যান্টার?'

'মিস্টার হেগ। অনেস্টলি বলছি, আমি আসতে চাইনি। এরকম জায়গায় থাকা মানে সভ্যতা থেকে সম্পর্ক নষ্ট করা। এখানে আসার জন্যে আমি নিজেকে ঘৃণা করি।' ম্যাথিউসের কথা যেহেতু জড়ানো তাই সে উঁচু গলায় কথা বলছিল।

মিস্টার ক্লার্ক বললেন, 'স্টপ ম্যাথিউস। তোমার নেশা হয়ে গেছে।'

'নো স্যার। আপনি হেডকোয়ার্টার্সের লোক হতে পারেন কিন্তু শুনে রাখুন আমি এখানে স্বেচ্ছায় আসিনি। বেলি আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে।' ম্যাথিউস চোখ বন্ধ করল! 'ওঃ, কী বোকা ছিলাম আমি।'

'হু ইজ বেলি?' হেগসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'যে মেয়েটাকে আমি ভালবাসতাম। ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। যখন জানতে পারলাম ও আর একজনের সঙ্গে প্রেম করছে যে হাইস্কুল থেকে পাশ করেছে, অমনি মাথা খারাপ হয়ে গেল। গিয়ে বেধড়ক পেটালাম ওকে।

ওর বাবা পুলিশকে জানাল। পুলিশ সুপার ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। বেলির বাবাও খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। আমাকে অ্যারেস্ট করে কেস ফাইল করলে মিনিমাম দু'বছর জেলে থাকতে হবে। আমার বিরুদ্ধে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ এনেছিল ওরা। পুলিশ সুপার আমার বাবার অনুরোধে বেলির বাবাকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু পাঁঠাটা কোনও কথা শুনতে চাইছিল না। শেষে রাজি হল একটাই শর্তে, আমাকে ইন্ডিয়ায় যেতে হবে। ব্রিটেনে থাকা চলবে না। কোনওদিন যেন বেলি আমার ছায়াও না দেখে।' মুখ বিকৃত করে চোখ বন্ধ করল ম্যাথিউস।

'তারপর?'

গ্লাসের মদটা শেষ করল ম্যাথিউস, 'ওই পুলিশ সুপার ব্যবস্থা করে দিল। আমাদের কোম্পানির একজন ডিরেক্টরের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। প্রাণের দায়ে আমাকে ইন্ডিয়ার আসামে চলে আসতে হল টি প্ল্যান্টার হতে।' উঠে দাঁড়াল ম্যাথিউস, 'আরে দু'বছর জেলে থাকলে কী এমন হত! এ তো সারা জীবনের জন্যে জেল। কোনও ব্রিটিশ মেয়ে আমার ইতিহাস জানলে আমাকে বিয়ে করবে না। আসামের যে চা-বাগানে ছিলাম সেখানকার মেয়েদের দিকে তাকালে আমার বমি আসত। উঃ।'

মিস্টার ক্লার্ক উঠে দাঁড়ালেন, 'ম্যাথিউস, অনেক হয়েছে। তুমি ঘরে যাও।'

ইতিমধ্যে মিস্টার ক্লার্কের ড্রাইভারকে পাঠিয়ে ডিনার আনানো হয়েছিল। হেগসাহেব শুভরাত্রি বলে নীচে নেমে এলেন।

উপর থেকে মিস্টার ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস্টার হেগ; আপনার কোনও সমস্যা হবে না তো ফিরে যেতে?'

'কেন?'

'আপনি তখন বলেছিলেন রাত্রে বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।'

হেগ কাঁধ নাচালেন, 'এখনও বলছি। কিন্তু কাল দেখা হবে।'

গাড়ি চালাতে চালাতে হেগসাহেব ভাবলেন ক্লার্ক লোকটা কাল বিদায় হলে বাঁচবেন। কিন্তু ম্যাথিউসের মাতলামো দেখার পর ওর সম্পর্কে আর দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। মস্তিষ্ক হুকুম পাঠানোর আগেই দুটো পা সক্রিয় হয়ে ব্রেক এবং ক্ল্যাচ চেপে ধরতেই গাড়িটা তীব্র শব্দ করে থেমে গেল। হেডলাইটের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণবয়স্ক যে প্রাণীটি তার চোখ জ্বলছে। বাঁ হাত স্টিয়ারিঙে রেখে ডান হাতে হাতড়াতে লাগলেন হেগসাহেব বন্দুকটার জন্যে। ওটা পাওয়ামাত্র তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করলেন। ঠিক সেই সময় বাঁ দিকের শূন্যে কিছু ভেসে আসছে অনুভব করামাত্র সেদিকে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপলেন। যে আসছিল সে মাটিতে পড়ে গোঙাতে গোঙাতে জঙ্গলে মিলিয়ে যেতে হেগসাহেব দেখলেন সামনের বাঘটিও উধাও হয়েছে। দ্রুত অ্যাক্সিলেটার চেপে বেরিয়ে এলেন তিনি। এরই মধ্যে তাঁর জামা ঘামে ভিজে গেছে। একেবারে বাংলোর গেটে পৌঁছে হর্ন দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক লাঠি হাতে ছুটে এসে গেট খুলে দিল।

গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে থাকলেন হেগসাহেব। বন্দুকের নলটা না ঘোরালে দুটো বাঘ এতক্ষণে তাঁর শরীরটা আরাম করে খেত। এত কাছে মৃত্যু চলে এসেছিল বুঝতে পেরে এখন শরীর ঝিমঝিম করছে। তার পরেই খেয়াল হল। সন্ধে থেকে মদ্যপান করেও তাঁর তেমন নেশা হয়নি। হলে লাফিয়ে আসা দ্বিতীয় বাঘটাকে টেরই পেতেন না। তাঁর নেশা হল না অথচ ম্যাথিউসের কথা অসংলগ্ন হয়ে গিয়েছে। এটা প্রমাণ করছে ওই ছোকরা কখনওই তাঁর সঙ্গে মদের টেবিলে পাল্লা দিতে পারবে না।

সাহেব নামছে না দেখে আলি নেমে এসেছিল সিঁড়িতে। শেষ পর্যন্ত বন্দুক হাতে নিয়ে হেগসাহেব নামতেই সে উপরে উঠে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হেগসাহেব বাইরের অন্ধকার

দেখলেন। কত বাঘ, বাইসন, হাতি চারপাশে ছড়িয়ে আছে। ওদের দুর করে তাঁকে এখানে চায়ের গাছের চাষ করতে হবে। খুব শক্ত কাজ, খুব।

স্নান করে শোওয়ার ঘরে ঢুকে চিৎকার করলেন হেগসাহেব, 'আলি!'

আলি দরজার ওপাশেই দাঁড়িয়েছিল, 'জি সাহাব।'

'নয়া পানি দিয়া?'

'জি সাহাব।'

'সুসান।'

এক মিনিটের মধ্যে সুসান যখন ঘরে ঢুকল তখন গ্লাসে মদ ঢেলে ফেলেছেন হেগসাহেব। সুসানের দিকে তাকালেন তিনি। এখন মেয়েটা অনেক স্বচ্ছন্দ। হাসছে। পরনে সাদা জামা সাদা স্কার্ট। মেয়েটার জন্যে প্যান্টি আনাতে হবে।

আঙুলের ইশারায় কাছে ডাকলেন তিনি। সুসান হাতের নাগালে আসতে ঝটপট ওকে পোশাকমুক্ত করে ওর বুকে মাথা চেপে ধরলেন। আঃ, কী আরাম। এখন সুসানের বুক কী ঠান্ডা। কিছুক্ষণ মাথা রেখেই ম্যাথিউসের কথা মনে পড়ল। বাস্টার্ডটা বলেছে এ দেশের মেয়ে দেখলে ওর ঘেন্না হয়। সুসানকে দেখলে কী বলবে?

মুখ তুললেন হেগসাহেব, 'ওয়েল, তোমার বরের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

মাথা নেড়ে না বলল সুসান।

খুশি হলেন হেগসাহেব, 'ওকে নিয়ে এসেছি। নীচে কাজ করবে। কিন্তু ও তো একটা বুড়োহাবড়া। ও তোমাকে কীভাবে সুখ দিত?'

হেগসাহেবের ইংরেজি হিন্দি মেশানো কথা বুঝতে পারছিল না সুসান। আলির শিখিয়ে দেওয়া শব্দ উচ্চারণ করল সে, 'নো, নো হাজব্যান্ড।'

'গুড।' খপ করে সুসানের চুল মুঠোয় ধরে হাসলেন

হেগসাহেব, 'ইউ আর মাই ডল। বাট টু নাইট আই অ্যাম টায়ার্ড, ডগ টায়ার্ড। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?' চুলের গোড়ায় তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও দাঁতে দাঁত চেপে রইল সুসান। সেই অবস্থায় হেগসাহেব তাকে চুমু খেয়ে যাচ্ছেন। যন্ত্রণাটা ভুলে তাকেও চুমু খেতে হচ্ছে। আলি বলেছে সাহেব ওটাই পছন্দ করেন।

তখনও অন্ধকার গাছের মাথায়, পাখিরা দিনশুরুর আনন্দে গলা খুলেছে। মিস্টার ক্লার্ক তাঁর গাড়িতে, ড্রাইভারের পাশে। পেছনে ওই বাংলোর চৌকিদার যে এই জায়গাটা জানে। বাংলো থেকে বেরুবার আগে তিনি ম্যাথিউসকে ডেকেছিলেন কিন্তু সাড়া পাননি। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে ছেলেটা। ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওর পক্ষে এখানে কতদিন থাকা সম্ভব হবে কে জানে। তবু এদের তিনি বুঝতে পারেন। পড়াশুনা হয়নি, দেশে ইতিমধ্যে অপরাধীর খাতায় নাম তুলে ফেলেছে, অতএব তাকে পাঠিয়ে দাও এশিয়ায়। নতুন চা-শিল্প হচ্ছে, টাফ ম্যান দরকার। মোটা মাইনে পাবে, থাকার বাংলো পাবে আর অন্যায় করার প্রবণতা থাকলে তা মিটিয়ে নিতে পারে, কেউ প্রশ্ন করবে না। শুধু কোম্পানিকে খুশিতে রাখলেই হল।

মিস্টার ক্লার্ক বুঝতে পারেন না হেগসাহেবদের। কোনও পিছুটান নেই, এরকম জায়গায় দিব্যি থাকেন এঁরা। নিজেকে সম্রাট বলে মনে করেন। অথচ দেশে এঁদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, কোনও অপরাধ করেননি সেখানে।

হেগসাহেবের বাংলোর গেটের সামনে পৌঁছে ড্রাইভারকে হর্ন বাজাতে বললেন মিস্টার ক্লার্ক। দ্বিতীয়বার বাজানোর পর একটা লোককে বারান্দায় দেখা গেল। গেট থেকে বাংলোর দূরত্ব অনেকটা, চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই। লোকটা ভেতরে চলে গেল। মিনিট দুয়েক পরে হেগসাহেব বেরিয়ে এলেন বারান্দায়, হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে বললেন।

খুব শান্ত চারধার। গাছগুলো যেন মাথা নুইয়ে আছে। মিষ্টি

হাওয়া বইছে। এই সময়টা খুব ভাল লাগে মিস্টার ক্লার্কের।

মিস্টার হেগ নেমে এলেন কাজের পোশাকে। নিজের গাড়িতে উঠলেন। আর তখনই দৃশ্যটা চোখে পড়ল মিস্টার ক্লার্কের। বাংলোর বারান্দা দিয়ে একটি যুবতী হেঁটে যেতে যেতে তাঁর দিকে তাকাতেই দৌড়ে অন্য দিকের আড়ালে চলে গেল। সাদা পোশাক বুকের কাছে জড়ো করা অর্ধ-নগ্ন যুবতীটি যেন হঠাৎই লজ্জা পেল। মেয়েটির চামড়ার রং কালো। মিস্টার ক্লার্ক হাসলেন, তা হলে মিস্টার হেগের সময় মন্দ কাটছে না।

'গুড মর্নিং।' হেগসাহেবের গাড়ি গেটের ওপাশে, চৌকিদার গেট খুলে দিল।

'গুড মর্নিং।' মিস্টার ক্লার্ক বললেন।

'এত ভোরে?'

'আপনাকে গতকাল বলেছিলাম লেবারদের সঙ্গে দেখা করা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। যেহেতু দুপুরে বেরিয়ে যেতে হবে তাই আর সময় পাব না।'

'আমি ভেবে পাচ্ছি না ওদের সঙ্গে দেখা করে কী লাভ হবে। ওরা তো আপনার ভাষা বুঝতেই পারবে না। একেবারে আদিম মানুষের দল।' হেগসাহেব বললেন।

মিস্টার ক্লার্ক তাঁর গাড়ি থেকে নেমে এলেন, 'আপনার পাশে বসতে পারি?'

'ও, সিয়োর। প্লিজ—!'

ড্রাইভারকে এই গাড়িকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিতেই হেগসাহেব গাড়ি চালু করলেন। মিস্টার ক্লার্ক পাইপ ধরালেন, 'চমৎকার জায়গা।'

'এখনও চমৎকার হয়নি। চা-বাগান কমপ্লিট হলে হবে। কাল রাত্রে ফেরার সময় দু'-দুটো বাঘের সামনে পড়েছিলাম।' গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন হেগসাহেব।

'আচ্ছা! গুলির আওয়াজ কানে এসেছিল—।'

'আমিই ছুড়েছিলাম। মরেনি কেউ। ম্যাথিউস কী করছে?'

'ঘুমাচ্ছে। ডাকলাম, ঘুম ভাঙল না।'

'আপনি যাওয়ার আগে ওকে বুঝিয়ে বলবেন যাতে কাজে মন দেয়।'

মিস্টার ক্লার্ক হাসলেন। হেগ কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, 'আমি অনুমান করছি প্রত্যেকটা মান্থলি রিপোর্টে আপনি ওর সম্পর্কে ভাল শব্দ লিখতে পারবেন না।'

জঙ্গলের আড়াল সরতেই ওদের দেখা গেল। দু'জন মানুষ খুব কাঁদছে, ভিড়টা হয়েছে তাদের ঘিরেই। কর্মচারীরা লাঠি উঁচিয়ে হুকুম করতেও সেটা গ্রাহ্য করছে না এই মুহূর্তে। মিস্টার হেগ গাড়ি থামাতেই দু'জন কর্মচারী ছুটে এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

হেগসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে?'

'কাল দুটো বাচ্চাকে বাঘ নিয়ে গিয়েছে। তাই ওরা কাঁদছে, কাজে যেতে বলছি কিন্তু—।'

'একটা বাঘ দুটো বাচ্চাকে নিয়েছে?'

'না সাহাব। দুটো বাঘ।'

'ঠিক আছে। ওদের আরও এক ঘণ্টা কাঁদতে দাও। তারপর যেন সবাই কাজে যায়।' হেগসাহেবের হুকুম শুনে দু'জন কর্মচারী ইশারায় বাকি কর্মচারীদের জনতার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। মিস্টার ক্লার্ক চুপচাপ শুনছিলেন। এবার গাড়ি থেকে নামলেন। তাঁর নিজের গাড়ি পেছনে এসে দাঁড়াল সশব্দে।

'আপনি কি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চান মিস্টার ক্লার্ক?' হেগসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'নিশ্চয়ই। আমাদের জন্যে কাজ করতে এসে ওদের এতবড় ক্ষতি হল, এটা তো পূরণ করা যাবে না, কিন্তু আমরা যে দুঃখিত এটা ওদের বোঝানো দরকার।' মিস্টার ক্লার্ক এগিয়ে গেলেন। পাশে হেগসাহেব।

দুই সাহেবকে আসতে দেখে ওদের কান্না থেমে গেল। অতগুলো মুখ ভয়ে ভয়ে তাকাল। পুত্রহারা পিতার কাঁধে হাত

রাখলেন মিস্টার ক্লার্ক। ইংরেজিতে যেটা বললেন তা বোধগম্য হল না লোকটার, কিন্তু স্পর্শে সহানুভূতি টের পেতেই লুটিয়ে পড়ল মিস্টার ক্লার্কের পায়ে। তার গলা থেকে আবার কান্না বের হল।

জানা গেল ভোরের আলো ফুটতেই বাচ্চা দুটো ঝরনার ধারে গিয়েছিল প্রাকৃতিক প্রয়োজনে। সেখান থেকে বাঘ তাদের মুখে নিয়ে চলে গেছে ঝরনার ওপাশে।

মিস্টার ক্লার্ক বললেন, 'ওই বাঘ দুটোকে আজই মেরে ফেলুন মিস্টার হেগ।'

হেগসাহেব হাসলেন, 'প্রথম কথা, ঠিক কোন বাঘ দুটো বাচ্চা খেয়েছে তা আইডেন্টিফাই করা যাবে না। তা ছাড়া আমি বললেই বাঘ দুটো সামনে এসে দাঁড়াবে না।'

'কিন্তু আজ মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে ওরা ম্যানইটার হয়ে যাবে। আরও মানুষ মারতে চাইবে। আপনি এদের নিরাপত্তা দিতে পারবেন?' মিস্টার ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিস্টার ক্লার্ক। এজেন্টদের বলা হয়েছিল, ওদের দু'বেলা খাবার, মাথার ওপর ছাদ আর প্রচুর জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এজেন্টরা ঠিক এই কথাই ওদের বলেছে। আমরা কখনওই ওদের নিরাপত্তা দেব বলে কথা দিইনি। দে শুড টেক কেয়ার অফ দেমসেলভ। তাই না। রাত্রে ঘরের বাইরে না যেতে বা ভোরে দল বেঁধে ঝরনায় গেলে বাঘ সাহস পেত না কিছু করার। ওদের এটা মনে রাখা উচিত ছিল।' হেগসাহেব স্পষ্ট বললেন।

মানতে হল মিস্টার ক্লার্ককে। হ্যাঁ, কোম্পানি কোথাও বলেনি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। তবে না বললেও এটা উহ্য থাকে।

তিনি ঘরগুলোর দিকে তাকালেন, 'চলুন, ওদিকটা ঘুরে দেখি।'

একটি ঘর দেখার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ঘরে বর্ষার সময়ে এরা কি থাকতে পারবে? ডুয়ার্সের বর্ষা তো

কুখ্যাত। এই খড় ভিজে কাদা হয়ে যাবে।'

'এটা টেম্পোরারি ব্যবস্থা। চার্চের ফাদারের সঙ্গে আলোচনা করে করেছি। পাকা কনস্ট্রাকশন করার জন্যে যে টাকার দরকার তা যদি আপনি কোম্পানিকে বলে স্যাংশন করিয়ে দেন তা হলে তাই করা হবে।' হেগসাহেব গম্ভীর।

'ওটা কী?'

'কিচেন।'

'মাইগড। ওই কিচেন থেকেই তো বাঘ ওদের নিয়ে যেতে পারে।'

'ওদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় দিনের আলো থাকতেই। বলা হয়েছে রাত নামবার আগেই যেন রান্না শেষ করে। দিনের আলোয় বাঘ কিছু করতে সাহস পাবে না।' হেগসাহেব দাঁড়ালেন। ওপাশের একটা ঘর থেকে গোঙানি ভেসে আসছে। দরজায় পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'

পেছন থেকে একটি মেয়ে ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তারপর রেডিয়াকে টেনে টেনে বাইরে নিয়ে এল। চমকে উঠলেন মিস্টার ক্লার্ক। বীভৎস ফুলে গিয়েছে রেডিয়ার পা। সেই সঙ্গে জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। হেগসাহেব চিনতে পারলেন লোকটাকে।

মিস্টার ক্লার্ককে ঘটনাটা বললেন।

'ও তো মারা যাচ্ছে।' মিস্টার ক্লার্ক বিড়বিড় করলেন।

'কিছু করার নেই। অফিসার্স ক্লাব থেকে প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে, অন্তত তিনটে চা-বাগানের জন্য একটা ছোটখাটো হাসপাতাল করে দিতে কিন্তু সরকার এখনও রেসপন্স করেনি।' হেগসাহেব বললেন।

'জেলার প্রধান শহরে তো হাসপাতাল আছে, সেখানে পাঠিয়ে দেননি কেন?'

'গাড়ির অভাব। যে গাড়িটা যাবে তাকে সারাদিন পাওয়া যাবে না।'

মিস্টার ক্লার্ক ফিরে এলেন গাড়ির কাছে। তারপর পাইপ ধরিয়ে বললেন, 'আপনার হয়তো মনে হচ্ছে আমি জেসাসের বাণী প্রচার করতে এসেছি। নো। নট অ্যাট অল। কিন্তু চা-বাগান তৈরি করতে হলে এই লোকগুলোকে বাঁচাতে হবে। আমাদের প্রয়োজনেই ওদের সুস্থ রাখা দরকার। তাকিয়ে দেখুন, ওদের ঘরগুলো থেকে জঙ্গল মাত্র কয়েক পা দূরে। অন্তত একশো গজ জঙ্গল এখনই কেটে ফেলা দরকার। জায়গাটা মাঠ হয়ে গেলে বাঘ আসতে ভয় পাবে। আর হলেও ওরা দেখতে পাবে। গাছগুলোকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে এরা।'

'বেশ। তাই হবে।'

'দু'দিন বাগানের কাজ বন্ধ রেখে এই কাজটা করতে বলুন ওদের।'

হেগসাহেব আপত্তি করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীদের ডেকে নতুন আদেশ জানিয়ে দিলেন।

মিস্টার ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদের বেতন কি সপ্তাহের শেষে দিচ্ছেন?'

'এখনও দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া পয়সা পেলে ওদের তো কাজে লাগবে না।'

'কেন?'

'এখানে কোনও দোকান নেই যে কিছু কিনতে পারবে।'

'আপনি কোম্পানিকে জানিয়েছেন এদের সপ্তাহে এক পয়সা বেতন দিলেই খুশি হবে। আপনি কি জানেন আসামের শ্রমিকরা আঠারোশো তেপ্পান্ন সালে বেতন পেত মাসে আড়াই টাকা। আঠারোশো ষাট সাল থেকে প্রতিটি পুরুষ হাতে পাচ্ছে মাসে পাঁচ টাকা আর নারী এবং অপ্রাপ্তবয়স্করা পাচ্ছে চার টাকা এবং তিন টাকা।' মিস্টার ক্লার্ক তাকালেন হেগসাহেবের দিকে।

'শুনেছি। তবে চাল, ডাল, নুন, তেলের দাম ওই মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হত।'

'হ্যাঁ, এখনও হয়। মাথা পিছু দেড়টাকা কাটা হয়। বাকিটা ওরা হাতে পায়।'

'আমি কোম্পানির খরচ বাঁচাচ্ছি, এতে তো আপনাদের খুশি হওয়া উচিত।'

'নিশ্চয়ই হতাম। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে লেখালেখি হচ্ছে। হাউস অফ কমন্সে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কোম্পানি এ ব্যাপারে কোনও বৈষম্যমূলক আচরণ করতে চায় না। টাকা হাতে পেলে কিনতে পারবে না বলে মাইনে দেওয়া হচ্ছে না এটাও ঠিক নয়। আপনি মাথা পিছু দেড় টাকা কেটে নিয়ে সাড়ে তিন, আড়াই, দেড় টাকা মাসিক মাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এই ব্যাপারে কোম্পানির লিখিত নির্দেশ আমার কাছে আছে, যাওয়ার আগে সেইসব কাগজপত্র আপনাকে দিয়ে যাব।'

নতুন আদেশ শুনে মানুষগুলোকে উল্লসিত হতে দেখা গেল। কাটারি হাতে দৌড়ে গেল জঙ্গলের দিকে। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে গাছগুলোর শরীরে আঘাত করতে লাগল। দেখে মনে হচ্ছিল বাঘের বিরুদ্ধে যাবতীয় আক্রোশ ওরা এইভাবে মিটিয়ে নিচ্ছে।

ম্যাথিউসকে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত দেখাচ্ছিল না। চৌকিদারের কাছ থেকে অফিসের হদিস জেনে সে বেশ হাসিমুখেই গুড মর্নিং বলল অফিসে এসে।

মিস্টার ক্লার্ক তখন হেগসাহেবের সঙ্গে কাগজপত্র নিয়ে বসেছিলেন। বললেন, 'গুড মর্নিং। রাত্রে কী রকম ঘুম হয়েছে?'

'চমৎকার।' ম্যাথিউস চেয়ারে বসল।

'মিস্টার ম্যাথিউস, এখানে কাজ শুরু হয় ভোরবেলায়'

ম্যাথিউস বলল, 'শেষ হয় কখন?' হেগসাহেবের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্লার্ক।

'বিকেল চারটের সময়।' হেগসাহেব গম্ভীর।

'ওয়েল, এটা আপনারও ডিউটি আওয়ার্স।' মিস্টার ক্লার্ক

ম্যাথিউসের দিকে তাকালেন।

'সম্ভবত ওই সময় কুলিরা জঙ্গল সাফাই করতে যায়। সেটা দেখার জন্যে নিশ্চয়ই কিছু স্টাফ আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমার তো কিছু করার নেই। তাই না?'

'আপনি আসামের চা-বাগানে কখন কাজ শুরু করতেন?'

'ঠিক ন'টায়। লাঞ্চ খেতাম একটায়। আবার তিনটে থেকে পাঁচটা।'

'আসামের সঙ্গে ডুয়ার্সের পার্থক্য অনেক। আপনি ভোরেই স্পটে যাবেন। সেখানে গিয়ে কী করতে হবে তা আপনাকে আপনার ম্যানেজার জানিয়ে দেবেন।' মিস্টার ক্লার্ক বললেন, 'মিস্টার হেগ। আমার সব কথা আপাতত শেষ। কাগজগুলো আপনি পেয়ে গেছেন। আমি ভেবেছিলাম লাঞ্চের পর নেক্সট বাগানে যাব। কিন্তু আমাকে এখনই বের হতে হবে।' উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার ক্লার্ক।

'সেকী! আপনি তো ব্রেকফাস্টও করেননি।' হেগসাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

'আমার সঙ্গে কিছু খাবার আছে। আর হ্যাঁ, আপনার অনুমতি পেলে আমি লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। এখন রওনা হলে বোধহয় ঘন্টা চারেকের মধ্যে আমরা সদরে পৌঁছে যেতে পারব।' মিস্টার ক্লার্ক পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখলেন।

'কার কথা বলছেন?' হেগসাহেব বুঝতে পারলেন না।

'যে লোকটা এখানে থাকলে দিন দুয়েকের মধ্যে মারা যাবে। হয়তো কোন লাভ হবে না, তবু শেষ মুহূর্তে সদর হাসপাতালের ডাক্তার যদি কিছু করতে পারেন।' বলে হাসলেন মিস্টার ক্লার্ক, 'মোটেই ভাববেন না সেবাই আমার ধর্ম, নো। কিন্তু ওই লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি বলেই চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি শোনার পর অন্য শ্রমিকরা ভরসা পাবে। তাদের জন্যে কোম্পানি চিন্তা করে বুঝে আরও অক্লান্ত থাকবে। ফলে কাজ ভাল হবে।' মিস্টার ক্লার্ক হাত বাড়ালেন করমর্দনের জন্যে।

হেগসাহেব হাতে হাতে মেলালেন। ম্যাথিউসও।

হেগসাহেব বললেন, 'কিন্তু ওদের চোখে আমরা ছোট হয়ে যাব। ওরা ভাববে আমরা কিছু করিনি, আপনি এলেন বলেই বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে।'

'না। ওরা জানবে আপনি আমাকে আনিয়েছেন। ভুলে যাবেন না, আপনি, আপনারা কোম্পানির অঙ্গ। তার চেয়ে বড় কথা এখানে আপনারাই কোম্পানির প্রতিনিধি। আপনার ইচ্ছে না থাকলে আমি নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে যেতে পারতাম না।' মিস্টার ক্লার্ক অফিস থেকে বেরিয়ে তাঁর গাড়িতে বসলেন। ম্যাথিউসকে নিয়ে হেগসাহেব নিজের গাড়িতে ওঁকে অনুসরণ করলেন। ম্যাথিউস বলল, 'মানুষটা অদ্ভুত।'

গাড়ি চালাতে চালাতে হেগসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী রকম?'

'টি প্ল্যান্টার্স হওয়ার যোগ্যতা নেই। পলিটিক্স করা উচিত ছিল ওঁর।'

হেগসাহেব হাসলেন, কোনও মন্তব্য করলেন না।

শুধু রেডিয়া নয়, তার স্ত্রীকেও গাড়িতে তুললেন মিস্টার ক্লার্ক। হেগসাহেব কর্মচারীদের মাধ্যমে সবাইকে জানালেন রেডিয়াকে বাঁচানোর জন্যে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোম্পানি এটাকে কর্তব্য বলে মনে করে।

কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেখানে কী চিকিৎসা হবে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই মানুষগুলোর। ওরা জেনেছিল রেডিয়া মারা যাচ্ছে। হয় আজ নয় কাল। রেডিয়ার বউও এটা মেনে নিয়েছে। ফলে ওর সম্পর্কে কারও আগ্রহ ছিল না। এখন বাঁচানোর চেষ্টা করছে সাহেবরা, যদি বাঁচে তা হলে তো ভালই। সবাই যে যার কাজে ফিরে গেল। ইতিমধ্যে বেশ কিছু গাছ ধরাশায়ী হয়েছে। একটা শুয়োরকে মারতে পেরেছে দুখনরা।

ম্যাথিউস এইসব দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানেই কি নার্সারি করব?'

হেগসাহেব বললেন, 'না। বাঘ যাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওদের ওপর লাফিয়ে না পড়তে পারে তাই জঙ্গলটাকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজ বাঘ দুটো বাচ্চাকে নিয়ে গিয়েছে।'

'কিন্তু এই লোকগুলো আজ কোনও কাজ করছে না। কোম্পানির কাজ।'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ওদের আজকের দিনের জন্যে মাইনে দেওয়া উচিত নয়।'

'মাইনে দিতে হবে। মিস্টার ক্লার্ক কোম্পানির অর্ডার দিয়ে গেছেন।'

'এখানে ওরা কত মাইনে পায়?'

'এখনও পায়নি। সবে এসেছে। আসামে কত দেওয়া হয়?'

'পাঁচ, চার, তিন। পুরুষ, নারী আর বাচ্চাদের রেট এটা। রেশনের দাম মাইনাস করা হয় ওই টাকা থেকে। এদের কত দেবেন বলে প্রমিস করা হয়েছে?'

'নাথিং। আমি কোনও প্রমিস করিনি। এজেন্টরা বলেছে মাসে এক আনা করে পাবে। মিস্টার ক্লার্ক বলে গেলেন আসামের রেটে ওদের মাইনে দিতে হবে।' হেগসাহেবের গলায় যে বিরক্তি তা টের পেয়ে হাসল ম্যাথিউস। হাসলে তাকে আরও বেশি ধূর্ত দেখায়?

বলল 'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'কী রকম?'

'আপনি যদি চান তা হলে কোম্পানি জানবে ওরা আসামের রেটেই মাইনে পাচ্ছে। কিন্তু পাবে এজেন্ট যা প্রমিস করেছে।' ম্যাথিউস বলল।

'কী করে সম্ভব?'

'চলুন, অফিসে ফিরে গিয়ে বলছি।'

অফিসে ফিরে বাবুকে ডাকা হল। কুলিদের নামের লিস্ট

দেখে নিয়ে ম্যাথিউস তাকে বলল, 'মেল, ফিমেল আর চাইল্ডের লিস্ট আলাদা করুন। প্রত্যেক মাসের জন্যে আলাদা লিস্ট। লিস্টের ওপর লিখবেন পাঁচ টাকা, চার টাকা, তিন টাকা। যেদিন মাইনে দেবেন সেদিন ওদের এখানে আসতে হবে। নাম ধরে ধরে ডেকে আঙুলের ছাপ নেবেন যা প্রমাণ করবে ওরা টাকা নিয়েছে। বুঝতে পারছেন?'

'ইয়েস স্যার।'

'ঠিক আছে, যেতে পারেন।'

অবাক হয়ে শুনছিলেন হেগসাহেব। ম্যাথিউস অপেক্ষা করল বাবুর চলে যাওয়ার জন্যে। তারপর বলল, 'আপনি ওদের এক আনা করেই দেবেন স্যার। কিন্তু খাতায় প্রমাণ থাকবে ওরা আমাদের রেটেই মাইনে নিচ্ছে।'

হেগসাহেব মাথা নাড়লেন। মুখে কিছু বললেন না। ম্যাথিউস বলল, 'আসামের বেশ কিছু চা-বাগানে এটাই রীতি। কোম্পানি জানে না। আপনার ক্লার্ক কি বিশ্বস্ত?'

'তাই তো মনে হয়।'

'মুশকিল হল, ওকে এড়িয়ে তো কাজটা করা যাবে না।'

'হুঁ।'

ম্যাথিউস উঠে দাঁড়াল, 'আপনার গাড়িটা আমি একটু ব্যবহার করতে পারি?'

'কোথায় যাবে?'

'পাশের বাগানে। ওখানে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হয়ে আছে আমার এক পরিচিত, আগে আসামে ছিল। একটু দেখা করে আসি।'

'বেশ।' ঘড়ি দেখলেন হেগসাহেব 'বিকেল চারটের মধ্যে ফিরে এসো।'

মাথা নেড়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাথিউস, 'স্যার, মিস্টার ক্লার্ক বলেছিলেন আসামের সঙ্গে এখানকার অনেক পার্থক্য আছে। জানি না। তবে ওখানে উদ্বৃত্ত টাকার ফর্টি

পার্সেন্ট অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারকে দেওয়া হয়।' ম্যাথিউস বেরিয়ে গেল।

ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। হেগসাহেব কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। ছেলেটি যা বলে গেল তা এতদিন তিনি কল্পনাও করেননি। কোম্পানির টাকা বাঁচানোর জন্যে অনেক পথ বের করেছেন কিন্তু বেঁচে যাওয়া টাকা আত্মসাৎ করার কথা চিন্তাও করেননি। ম্যাথিউসকে নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে। শ্রমিকদের সামান্য অর্থে যে ভাগ বসাতে চায় তার নজর তো অন্য দিকেও পড়বে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল ম্যাথিউস। মনে হল বন্দুকটাকে সঙ্গে আনলে ভাল হত। রাস্তাটা মাটির, একটু এবড়োখেবড়ো। গাড়ি লাফাচ্ছিল। হঠাৎ একেবারে নাগালের মধ্যে হরিণটাকে দেখতে পেল সে। পূর্ণবয়স্ক হরিণ অবাক চোখে দেখছে। হাত নিসপিস করতে লাগল ম্যাথিউসের। বন্দুক ছাড়া আর কখনও বের হবে না। সে গাড়ি থামাতেই হরিণটার যেন চৈতন্য ফিরল। এক লাফে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

পাশের বাগান দশ মাইল দূরে। সেখানে তখন জঙ্গল কাটার কাজ চলছে। গাড়ির শব্দ শুনে শ্রমিকরা ফিরে তাকাল। ম্যাথিউস দেখল শীর্ণ চেহারার কালো মানুষগুলো ইতিমধ্যেই ঘামে ভিজে গিয়েছে। হঠাৎ একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়ল তার। মেয়েটি লম্বা এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সঙ্গীদের থেকে অনেক ধনী। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখছে মেয়েটা।

'হেলো ম্যাথিউস! তুমি কোত্থেকে এখানে?'

গলা শুনে পেছনে তাকাতে জনকে দেখতে পেল ম্যাথিউস। হাফপ্যান্ট, সাফারি শার্ট, কেডস, হাতে মোটা ছড়ি। জনের বয়স তারই মতো। গাড়ি থেকে নেমে ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ম্যাথিউস বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। পাশের

বাগানে ট্রান্সফারড হয়েছি।'

'পাশের বাগান? মিস্টার হেগ?'

'ইয়েস। লোকটা কেমন?'

'কোম্পানির লোক। একশো ভাগ। তবে লোকটা সাদা চামড়ার মেয়ে পছন্দ করে না।'

'তাই নাকি! তোমার কী খবর?'

'নির্বাসনে যেভাবে থাকতে হয় তাই আছি।' জন হাসল।

'যা বলেছ। নির্বাসন।'

'একটু অপেক্ষা করো, কিছুক্ষণ পরে লাঞ্চ হবে, একসঙ্গে লাঞ্চ খাব।'

'ধন্যবাদ। তোমার ম্যানেজার কী রকম?'

'ওঁর নাম ডগলাস। উনি আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন।'

'বাঃ। ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন?'

'না। ওঁর ফ্যামিলি ক্যালকাটায়। মাঝে মাঝে গিয়ে রিনিউ করে আসেন।'

শব্দ করে হাসল জন।

ম্যাথিউস আবার শ্রমিকদের দিকে তাকাতেই দেখল তারা পূর্ণশক্তিতে কাজ করছে শুধু, সেই লম্বা মেয়েটি হাসতে হাসতে তার পাশের মেয়েটিকে কিছু বলছে।

'ওই মেয়েটি কে?' ম্যাথিউস জিজ্ঞাসা করল।

'কয়েকদিন আগে এসেছে ছোটনাগপুর থেকে। তোমার তো এদের পছন্দ নয়।'

'বাট শি ইজ ডিফারেন্ট। একে আমাদের বাগানে পাঠিয়ে দাও।'

এইসময় চেঁচামেচি শোনা গেল। দু'জন চৌকিদার একটি শ্রমিককে বেধড়ক লাঠিপেটা করছে। জন হুকুম দিল লোকটাকে ওর সামনে নিয়ে আসার জন্যে।

টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হল লোকটাকে। চৌকিদারদের একজন জানাল, গুনতিতে ওকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করে

পাওয়া গিয়েছে জঙ্গলের ভেতর। সেখানে লোকটা ঘুমাচ্ছিল। শোনামাত্র জন সজোরে লাথি মারল লোকটার পাছায়। সেইসঙ্গে গালাগালি। অন্য শ্রমিকরা কাজ থামিয়েছিল, কিন্তু চৌকিদাররা চেঁচিয়ে ওঠায় আবার তাদের হাত চলল।

'একে খাঁচায় রেখে দাও তিনদিন। নো ফুড, নো ওয়াটার।' জন হুকুম দিতেই লোকটাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া হল।

ম্যাথিউস জিজ্ঞাসা করল, 'খাঁচা মানে?'

'লাঞ্চ খাওয়ার সময় দেখাব।' জন বলল।

লোকগুলো গাছ কাটছে। দৃশ্যটা বেশির ভাগ জায়গায় যা হয়ে থাকে এখানেও তাই হচ্ছে। আগ্রহ নেই ম্যাথিউসের। এইসময় মিস্টার ডগলাস এলেন। জন ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ম্যাথিউসের।

ডগলাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের বাগানে কত লোক জ্বরে আক্রান্ত?'

'জ্বর? জ্বরের কথা শুনিনি তো। বাঘের আক্রমণে কুলির বাচ্চা মরেছে।'

'বাঘের চেয়ে ম্যালেরিয়া অনেক বেশি শক্তিশালী। আমার ওখানে বারোজন ইতিমধ্যে আক্রান্ত। ট্রিটমেন্ট না করলে মারা যাবে। আর একবার ম্যালেরিয়া স্প্রেড করলে কাউকে বাঁচানো যাবে না। জন!'

'ইয়েস স্যার।'

'তোমাকে এখনই শহরে যেতে হবে। সিভিল সার্জেনের সঙ্গে কথা বলে ওষুধ আনাতে হবে। যাও, তৈরি হও।' ডগলাস বললেন।

'স্যার, এখন রওনা হলে ফিরতে পারব?'

'যত রাত হয় হোক ফিরতেই হবে। দুটো লোককে সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'ঠিক আছে, লাঞ্চের পর রওনা হচ্ছি।'

'নো জন, বি সিরিয়াস। অনেক চেষ্টা, টাকা খরচ করে ওই লোকগুলোকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এদের একটা লোক মারা গেলে আমাদের কাজ পিছিয়ে যাবে। সঙ্গে লাঞ্চ ক্যারি করো। রাস্তায় খেয়ে নিয়ো।'

জন ম্যাথিউসের দিকে তাকাল, 'সরি ম্যাথিউস। তোমাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছিলাম। বুঝতেই পারছ। এটা ইমার্জেন্সি।'

'সিয়োর। তুমি সংকোচ কোরো না।' ম্যাথিউস বলল।

জন চলে গেলে ডগলাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'আসামে ম্যালেরিয়া কী রকম স্প্রেড করেছে?'

'ম্যাথিউসের মুখ দেখে মনে হল উত্তরটা তার জানা নেই। সে বলল, 'তেমন নয়। আমরা তো ওখানে মশারির মধ্যে ঘুমাতাম।'

'আজ কি মিস্টার হেগ শ্রমিকদের ছুটি দিয়েছে? এই সময় তুমি এখানে বলেই বলছি।'

ম্যাথিউস হাসল, 'ছুটিই বলতে পারেন। বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে শ্রমিকদের ঘরের আশেপাশের জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে বলেছেন আজ।'

'শুনলাম জন তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াবে বলেছিল। তুমি আমার বাংলোয় আসতে পারো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাইছি।'

'আলাপ করে ভাল লাগল। সামনের শনিবার ক্লাবে এসো। দেখা হবে।'

'অবশ্যই। একটা কথা।'

'বলো।'

'আমি ভাবছিলাম শ্রমিকদের শুধু পরিশ্রম না করিয়ে একটু আনন্দ দেওয়াও দরকার।'

'এনি প্ল্যান?'

'ওরা তো সব একই জায়গা থেকে এসেছে। এসে এখানে আলাদা হয়ে গেছে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। যদি

কয়েক ঘণ্টার জন্যে ওরা মিলিত হতে পারত তা হলে নিশ্চয়ই খুশি হত। ধরুন, আমাদের বাগানের শ্রমিকরা এখানে এল, অথবা ওরা এখানে গেল।' ম্যাথিউস খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল।

'নট ব্যাড। তবে এর খারাপ দিকও আছে। নিজেদের সঙ্গে দেখা হলে ওরা কমপেয়ার করার চেষ্টা করবে। কে ভাল আছে, কে খারাপ।'

'সেটা স্যার ছেলেরা করবে। এই বাগানের মেয়েরা আমাদের বাগানে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে করে দেখা আসুক। তাতে দুই বাগানের পুরুষরা খুশি হবে।' ম্যাথিউস হাসল।

'এটা হতে পারে।' ডগলাস বললেন, ঠিক আছে। কাল সানডে, আমি এখানকার কিছু মেয়েকে তোমাদের বাগানে পাঠাব কয়েক ঘণ্টার জন্যে। মিস্টার হেগকে জানিয়ে রেখো। আচ্ছা, চলি।' নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন ডগলাস। হাত নেড়ে ইশারা করলেন চৌকিদারদের লাঞ্চ ব্রেক ঘোষণা করতে।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে জানিয়ে দেওয়া হল। ডগলাস চলে গেলেন।

ম্যাথিউস এবার মেয়েটিকে খুঁজল। কাজ বন্ধ করার হুকুম হওয়ামাত্র অনেক মেয়ের সঙ্গে সে-ও উধাও হয়ে গেছে। সম্ভবত জঙ্গলে ঢুকে গেছে। ওকে খুঁজে বের করে কাছ থেকে দেখতে চাইলে কেউ বাধা দেওয়ার নেই। নিজের চা-বাগান হলে সেটা স্বচ্ছন্দে করা যেত। কিন্তু ডগলাস লোকটাকে ঠিক বোঝা গেল না। শ্রমিকদের সুস্থ করতে যেভাবে জনকে এইসময় সদরে পাঠাল তাতেই কিছুটা মালুম হচ্ছে। ম্যাথিউস ঠিক করল সামনের রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে তাকে।

গাড়ি চালিয়ে এলোমেলো ঘুরতেই অফিসবাড়ির কাছাকাছি খাঁচাটাকে দেখতে পেল ম্যাথিউস। লম্বা লোহার খাঁচায় তালা

ঝুলছে। মাথার ওপর ছাদ নেই, লোহার শিকের আড়াল। ভেতরে মড়ার মতো পড়ে আছে তিনজন শ্রমিক। তিনজনের শরীরে রক্তের দাগ, লম্বা লম্বা ক্ষত। কয়েকটা বাঁদর গাছ থেকে নেমে খাঁচার ওপর বসে চিৎকার করছে। আইডিয়াটা ভাল। ফিরে গিয়ে মিস্টার হেগকে বলতে হবে।

খিদে পেয়েছে খুব। বেশ জোরে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করল ম্যাথিউস। রাস্তার জন্যে স্পিড বাড়ানো যাচ্ছে না। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। একটা বাঁক নিতেই সে সজোরে ব্রেক চাপল। পঞ্চাশ গজ দূরে গোটা পাঁচেক বিশাল চেহারার হাতি নিরীহ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গাছের ডাল ভাঙছে। কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বিরক্ত হল ম্যাথিউস। ব্যাটাদের সরে যাওয়ার ইচ্ছেই নেই। সে হর্ন বাজাল। ইঞ্জিনের আওয়াজ করল যাতে ভয় পেয়ে ওরা সরে যায়। কিন্তু ওদের মধ্যে একজন বিরক্ত হল। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল গাড়ির দিকে। ম্যাথিউস বুঝল সে বিপদে পড়েছে। এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে সে পেছন দিকে দৌড়তে লাগল। দৌড়াতে দৌড়াতেই শুনল হাতিটা গাড়ি ভাঙছে।

অনেকটা দৌড়াবার পর ম্যাথিউস দাঁড়িয়ে পড়ল শ্বাস নেওয়ার জন্যে। প্রচণ্ড ঘেমে গিয়েছিল সে। গাড়িতে বসে থাকলে এতক্ষণে তার কী অবস্থা হত কল্পনাও করতে পারছিল না সে। মাথার ওপরে সূর্য। কড়া রোদ। নিজেদের বাগানে এখন যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু ডগলাসের বাগানে যেতে কয়েক মাইল হাঁটতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। বিরক্ত হয়ে সে হাঁটা শুরু করেই থেমে গেল। ওপাশের জঙ্গল থেকে গর্জন ভেসে আসছে। তারপর কয়েকটা বিশাল চেহারার বাইসনকে ছুটে রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকের জঙ্গলে ঢুকে যেতে দেখল।

চারপাশে তাকিয়ে যে গাছটাকে দেখতে পেল ম্যাথিউস, তার ডাল ধরা যায়। কোনও সময় নষ্ট না করে ডাল ধরে

শরীরটা ওপরে তুলল সে। তারপর আরও নিরাপদ জায়গার আশায় ওপরে উঠে একটা চওড়া ডালে গিয়ে বসল। হাতি বা বাঘ যাই হোক না কেন এখানে এসে তাকে আক্রমণ করতে পারবে না।

আধঘণ্টার মধ্যেই ম্যাথিউস অস্থির হয়ে উঠল। কোত্থেকে পিলপিল করে পিঁপড়ে বেরিয়ে এসে ওর শরীর আক্রমণ করছে। মেরে মেরেও তাদের সরানো যাচ্ছে না। হাত-পা ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তার পরেই সে আবিষ্কার করল পিঁপড়ের বাসার কাছে বসেছিল সে। দ্রুত অন্য ডালে চলে যেতে গর্জনটা কানে এল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল বেশ বড়সড় বাঘ মুখ তুলে তাকে দেখল। কয়েকবার গাছে ওঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে গাছটাকে ঘিরে পাক দিল তিনবার। তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেছে। হাতে পায়ের শক্তি নিঃশেষিত। মাথা ঘুরতে লাগল ম্যাথিউসের। মনে হচ্ছিল যে-কোনও মুহূর্তে পড়ে যাবে নীচে। তার সর্বাঙ্গ চুলকাচ্ছিল। পৃথিবীতে আজই তার শেষ দিন, এ ব্যাপারে আর সন্দেহ ছিল না।

মিস্টার ক্লার্কের গাড়িটা ফিরে আসছিল শহর থেকে। সন্ধে হব হব। রেডিয়াকে ভরতি করা হয়েছে হাসপাতালে। কিন্তু তার বউকে ওখানে রাখতে চায়নি কর্তৃপক্ষ। রোগীর সঙ্গীর থাকার দরকার আছে বলে ওরা মনে করছে না। মিস্টার ক্লার্ক নিজে সিভিল সার্জেনের সঙ্গে দেখা করে রেডিয়ার যাতে সুচিকিৎসা হয় সেই অনুরোধ জানিয়েছেন। ডাক্তারদের অনুমান, রেডিয়ার একটা পা বাদ দিতে হবে। সেই দৃশ্যটি দেখার জন্যে স্ত্রীকে হাসপাতালে রেখে দেওয়া অর্থহীন।

ডগলাসের বাগান ছাড়িয়ে মিস্টার হেগের বাগানের দিকে এগোতেই একটা আর্ত চিৎকার কানে এল। চিৎকারটা কাছেই

কেউ করছে তবে তার গলা ভেঙে গেছে। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললে সে বাধ্য হল কিন্তু জানাল, এখানে এই সময় গাড়ি দাঁড় করালে বিপদ হতে পারে।

বন্দুক হাতে নিয়ে নীচে নামলেন। অন্ধকার নামছে কি(দৃষ্টি এখনও আটকাচ্ছে না। যে গাছের ওপর থেকে শব্দটা আসছিল তার তলায় পৌঁছে তিনি হকচকিয়ে গেলেন। নীচ থেকে মুখ তুলতে পারছেন না কিন্তু লোকটা যে সাদা চামড়ার তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ভাঙা গলায় হেল্প হেল্প বলে চলেছে।

মিস্টার ক্লার্ক চিৎকার করে ডাকলেন, 'নেমে আসুন। কোনও ভয় নেই।'

কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলেন লোকটার নীচে নেমে আসার ক্ষমতা নেই। তিনি ড্রাইভারকে ডাকলেন। প্রায় জোর করেই তাকে গাছের ওপরে পাঠালেন।

ম্যাথিউসকে যখন ড্রাইভার নীচে নামিয়ে নিয়ে এল তখন মিস্টার ক্লার্কের চোখ বিস্ফারিত। ফুলে বীভৎস হয়ে গেছে ম্যাথিউসের মুখ। চোখ দেখা যাচ্ছে না। ফুলেছে হাত-পা। কথা বলার ক্ষমতাও নেই ওই মুহূর্তে। গাড়িতে তুলে ড্রাইভারকে জোরে চালাতে বললেন। কয়েক মিনিট জোরে গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভার হেডলাইট জ্বেলে ব্রেক চাপল, বলল, 'সাহাব, রাস্তা বন্ধ্।'

রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে একটা গাড়ির ধ্বংসাবশেষ। চাকা না থাকলে সেটা বুঝতে পারা কঠিন ছিল। কার গাড়ি? প্রশ্নটা মাথায় আসতেই ম্যাথিউসের দিকে তাকালেন মিস্টার ক্লার্ক। এবার তিনি অনুমান করতে পারলেন। তা হলে ম্যাথিউস মিস্টার হেগের গাড়ি নিয়ে এদিকে এসেছিল। কিন্তু এভাবে একটা আস্ত গাড়ি থেঁতলে দিতে পারে কোন জীব? যে করেছে সে তো এখন কাছেপিঠে থাকতে পারে। গাড়ি থেকে নামতে নামতে তিনি ড্রাইভারকে ডাকলেন, 'এসো! রাস্তা পরিষ্কার করি।'

আজ সন্ধের পরেও মিস্টার হেগ অফিসে ছিলেন। তাঁর বাবু একটু আগে তিন পাতার চিঠি লেখা শেষ করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। পড়া শেষ হলে কাগজগুলো হাতে নিয়ে মিস্টার হেগ সই করলেন, 'তুমি শেক্সপিয়ার পড়েছ দেখছি।'

'ইয়েস স্যার।'

'আমি শুনেছি হি ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট। তুমি তাঁর কবিতার লাইন গদ্য করে দিয়েছ। তাতে অবশ্য চিঠিটা ভালই শোনাচ্ছে।'

'ওগুলো শেক্সপিয়ার নিজেই লিখেছেন। তাঁর নাটকে।'

'নাটক? শেক্সপিয়ার নাটক লিখতেন নাকি?' অবাক হলেন মিস্টার হেগ।

বাবু মাথা নাড়লেন, 'আমি ঠিক জানি না। মানে উনি নিজে লিখতেন কিনা তা জানি না স্যার।'

মিস্টার হেগ হাসলেন, 'আমি ওর দেশের লোক, আমি জানব না কী করে ভাবছ?'

'ইয়েস স্যার।'

এইসময় গাড়ির আওয়াজ হতেই তিনি চিঠির কাগজগুলো ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে বললেন, 'ম্যাথিউস ফিরল। চিঠির কথা ওকে বলার দরকার নেই। তুমি এখন এখান থেকে যাও, ওর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

বাইরে হর্ন বাজল। মেজাজ গরম হয়ে গেল মিস্টার হেগের। ম্যাথিউসকে কড়া ধমক দেবেন বলে বাইরে এসে মিস্টার ক্লার্ককে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

মিস্টার ক্লার্ক সংক্ষেপে রেডিয়ার কথা বললেন। ওর স্ত্রীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনতে বলেও সিদ্ধান্ত বদল করলেন। তারপর ম্যাথিউসের কাহিনী শোনালেন।

খুব অবাক হয়ে মিস্টার হেগ গাড়িতে উঁকি মারতেই মিস্টার ক্লার্ক ম্যাথিউসের মুখে টর্চের আলো ফেললেন। মিস্টার হেগের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, 'মাই গড।'

'ওর শরীরের তাপ বেড়ে গেছে। আপনার কাছে ব্যথা কমার কোনও ওষুধ আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'এখনই কিছু করা সম্ভব নয়। সদরে যেতে নদী পার হতে হবে। শুনে এলাম দশটার পর নৌকোচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আপনি ওকে ব্যথা বা জ্বরের ওষুধ দিন। রাতটা ঘুমাক। আমার ড্রাইভার ওকে গেস্ট বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে আসুক। কিন্তু ওখানে ওকে একা রাখা কি ঠিক হবে?' মিস্টার ক্লার্ক দ্বিধাগ্রস্ত।

মিস্টার হেগেরও মনে হল ওকে এই অবস্থায় একা রাখা অমানবিক হবে। তিনি বললেন, 'তা হলে আমার বাংলোয় থাকুক। লোকজন দেখাশোনা করবে।'

'তা হলে তো খুবই ভাল হবে।'

মিস্টার ক্লার্কের গাড়িতেই সবাই চলে এলেন মিস্টার হেগের বাংলোয়। নির্দেশ দিতে আলি এবং আর এক পরিচারক ম্যাথিউসকে ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। মিস্টার ক্লার্ক ফিরে যাচ্ছিলেন কিন্তু মিস্টার হেগ থাকে অনুরোধ করলেন এই রাত্রে না যাওয়ার জন্যে। মিস্টার ক্লার্ক গোঁয়ারতুমি করলেন না। শুধু ড্রাইভারকে বললেন কুলিদের ঘরে রেডিয়ার বউকে পৌঁছে দিয়ে আসতে।

ড্রাইভার একা যেতে ভয় পাচ্ছে দেখে একজন চৌকিদারকে সঙ্গে যেতে বললেন মিস্টার হেগ।

ওপরে উঠে ওঁরা ম্যাথিউসকে দেখতে এলেন। ছটফট করছে ছেলেটা। জ্বর এবং ব্যথার ওষুধ বের করে আলিকে বললেন মিস্টার হেগ ওকে খাইয়ে দিতে।

তারপর স্নান শেষ করে মিস্টার ক্লার্ক আর মিস্টার হেগ মদ্যপান করতে বসলেন। ম্যাথিউসের অবস্থা পিঁপড়ে বা ওই জাতীয় কিছু কামড়ানোর কারণে যতটা কাহিল তার চেয়ে অনেক বেশি কারণ হল ভয় পাওয়া এ ব্যাপারে ওঁরা দ্বিমত হলেন না। এখন সমস্যা হল গাড়ির কী হবে? এখানে গাড়ি

ছাড়া কোনও কাজ করা সম্ভব নয়। অবশ্য লরি আছে দুটো। কিন্তু লরিতে চেপে তো সর্বত্র ঘোরাঘুরি করা যায় না।

মিস্টার ক্লার্ক বললেন, 'কাল সকালে আমি ডগলাসের বাগানে যাব। ওদের দুটো গাড়ি আছে কারণ অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার কিছুদিন আগে আসায় তার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। আপনি যতদিন না নিজের গাড়ি পাচ্ছেন ততদিন ওদেরটা ব্যবহার করতে পারেন।'

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মিস্টার ক্লার্ক ডিনার করতে চাইলেন। অত তাড়াতাড়ি খাওয়ার অভ্যেস না থাকলেও মিস্টার হেগ তাঁকে সঙ্গ দিতে বাধ্য হলেন। রাত ন'টার মধ্যেই মিস্টার ক্লার্ক ঘরের দরজা বন্ধ করতে মিস্টার হেগ নিজের ঘরে এলেন।

ডিনারের পর মদ খেতে তাঁর ভাল লাগে না। অথচ মদ না খেলে তাঁর ঘুম আসবে না। তিনি চিৎকার করলেন, 'আলি!'

সঙ্গে সঙ্গে ভেজানো দরজা ঠেলে উঁকি মারল আলি, 'জি সাহাব।'

'সুসান!'

'জি সাহাব।'

সুসানকে এই ঘরে নিয়ে আসতে দেরি হল। ঘরে ঢুকল সুসান।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় তার গালে পড়তেই সে উলটে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

হিসহিস করলেন হেগসাহেব, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি? গায়ে খুব তেল হয়েছে, না?'

মাথা ঘুরছিল, চোখে অন্ধকার। মেঝে থেকে ওঠার ক্ষমতা চলে গিয়েছিল সুসানের। সেই অবস্থায় ওর চুলের মুঠো ধরে তুললেন হেগসাহেব,' আমি আজ নেশা করিনি। তোর কাজ হবে শরীর দিয়ে আমাকে নেশা করানো। জামা খোল।'

টলছিল সুসান। চুলের মুঠো ছেড়ে দেওয়ার পর পড়তে

পড়তে সামলাল।'

ঠিক তখন বাইরে চেঁচামেচি শোনা গেল এবং তার পরেই আলির গলা, 'সাহাব!'

তাঁর ধমক শেষ হতেই মিস্টার ক্লার্কের গলা শুনতে পেলেন। 'আই অ্যাম সরি মিস্টার হেগ, আমিই বলেছি ওকে আপনাকে বিরক্ত করতে।'

চমকে উঠলেন হেগসাহেব। দরজা খোলার আগে সুসানকে সরিয়ে দিলেন একপাশে যাতে খোলা দরজা দিয়ে মিস্টার ক্লার্ক তাকে দেখতে না পান।'

'কী ব্যাপার মিস্টার ক্লার্ক?'

'ম্যাথিউসের অবস্থা ভাল নয়। ওর কাঁপুনি হচ্ছে।'

'ওঃ।' হেগসাহেব হতভম্ব, 'চলুন।'

ম্যাথিউস শুয়ে আছে কুঁকড়ে। তার মুখ থেকে কুঁই কুই আওয়াজ বের হচ্ছে। ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব শীত করছে তার। মিস্টার হেগ কয়েকটা কম্বল ওর ওপর চাপিয়ে দিয়ে মিস্টার ক্লার্কের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে ম্যালেরিয়া। সর্বনাশ হয়ে গেল।'

পাশের ঘরের বউয়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে। সোমরা চেষ্টা করেছে কয়েকবার, বউ বলেনি। এখন এতোয়া সোমরার সঙ্গে থাকে। সে থাকায় স্বামী ঘুমিয়ে পড়ার পরে বউয়ের পক্ষে এই ঘরে আসা সম্ভব হচ্ছে না। প্রথম দিকে সে একা পেতেই সোমরাকে বলেছে এতোয়াকে অন্য কারও ঘরে পাঠিয়ে দিতে, তা ছাড়া বাপ-মা মরা ছেলের তো শক্ত হওয়াই উচিত। যে ছেলে সাপ ধরতে পারে সে কেন গাঁওবুড়োর ঘরে একা থাকতে পারবে না! সোমরা হেসেছে কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পাশের ঘরের বউ তাকে শরীরের যে সুখ দিয়েছে তা নিজের বউয়ের কাছেও পায়নি সে। কিন্তু বউটার বর যখন তার সঙ্গে সরল মুখে কথা বলে তখন খুব খারাপ লাগে তার।

আজ বিকেলে দুখন মাংরা কয়েকজনকে নিয়ে ওর কাছে এসেছিল। বর্ষা এলে এই ঘরগুলোতে থাকা যাবে না। খড় ভিজে গেলে শোওয়া যাবে না। জঙ্গলে অনেক বাঁশ আছে। তাই কেটে যদি মাচা বেঁধে নেওয়া যায় তা হলে সমস্যা থাকবে না। কিন্তু সেটা করতে গেলে সাহেবের অনুমতি নিতে হবে। সোমরা যদি ওই কাজটা করে। সাহেবের মুখ মনে করলেই বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে। স্বচ্ছন্দে সে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করতে পারত। কিন্তু তখন মনে হল, দায়িত্ব নিলে সে এদের প্রধান হয়ে যাবে। গাঁওমোড়ল বলে এখানে কিছু নেই বটে কিন্তু তার কথামতো সবাই কাজ করবে ভাবতেই রাজি হয়ে গেল। সবাই মিলে আলোচনা করল, দেশে ভাল ছিল না এখানে। এ ব্যাপারে সবাই একমত, এখানে পরিশ্রম করতে হচ্ছে বটে কিন্তু দেশের থেকে অনেক আরামে আছে, অন্তত জল আর খাবার নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হচ্ছে না।

এতোয়া তার সঙ্গে থাকায় উপকারই হচ্ছে। রান্নার দায়িত্ব ও নিয়েছে। এমনকী বিকেলে কাজ থেকে ফেরার আগেই রাত্রের রান্না করে রাখে। রোজ ঝরনা থেকে মাছ ধরে আনে। আগামীকাল রবিবার। কাউকে কাজ করতে হবে না কিন্তু সবাইকে চার্চে যেতে হবে। সেখানে পাদরি প্রার্থনা করবেন তাদের জন্যে।

ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। এতোয়া ঘুমিয়ে আছে মড়ার মতো। এসময় গাড়ির আওয়াজ কানে এল। এখন কেন গাড়ি? তবে কি সাহেব এলেন? প্রধান হিসেবে তার উচিত সাহেবের সামনে যাওয়া। তড়াং করে উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে সে হেডলাইটের আলো দেখতে পেল। দু'জন লোক একটা মেয়েমানুষকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে দ্রুত ফিরে গেল।

সোমরা হাঁকল, 'কে?'

তার গলার স্বর শুনেই কয়েকজন বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সাহস বাড়ল সোমরার। মেয়েমানুষটা কাছে এসে বলল, 'আমি।'

চিনতে পারল সোমরা, 'তুমি? রেডিয়া কোথায়?'

সারাদিন ধরে মেয়েটা কথা বলেনি। মিস্টার ক্লার্কের ড্রাইভার ভাত আর তরকারি এনে দিয়েছিল, সেটা খেয়েছে। সারাদিন চেপে চেপে এখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন তীব্র হওয়ায় সোমরার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মেয়েটা অন্ধকারে দৌড়াল। তারপর ভার মুক্ত হয়ে ফিরে এসে বলল, 'ওকে রেখে দিয়েছে।'

দুখন জিজ্ঞাসা করল, 'কে রেখেছে?'

সোমরা দুখনকে ধমকাল, 'সবাই মিলে প্রশ্ন করিস না। আমি কথা বলছি। হ্যাঁ, কে রেডিয়াকে কোথায় রেখে দিয়েছে?'

'খুব বড় বাড়ি। বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। সাদা ধবধবে বিছানা। ডাক্তাররা ওকে ওষুধ দিচ্ছে। বলল, ভাল হয়ে গেলে ফিরিয়ে দেবে।'

সোমরা ঘুরে দাঁড়াল, 'শুনলে তোমরা? আমাদের গ্রামে এরকম হলে রেডিয়া বাঁচত? সাহেব আমাদের কত যত্ন করছে। যাও ঘরে যাও তুমি।'

সবাই চলে গেলে হঠাৎ আকাশের প্রান্তে নজর গেল সোমরার। জঙ্গলের মাথায় একটা শীর্ণ চাঁদ উঁকি মারছে। এখন থেকে রাতগুলো আলোকিত হবে।

চার্চের মাঠে দাঁড়িয়েছিল ওরা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইবেল থেকে উপদেশ পড়ে যাচ্ছিলেন ফাদার। তারপর ড্রাম থেকে হাতায় তুলে পবিত্র মদ পান করানো হল সবাইকে। এক আঁজলার বেশি চাইতে গিয়ে ধমক খেল অনেকে। পবিত্র মদ বেশি খেতে নেই।

এইসময় মিস্টার ক্লার্কের গাড়িতে মিস্টার হেগ, বাবু এবং দু'জন কর্মচারী সেখানে এলেন, ফাদারের পক্ষে সেখানে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। দশ মাইল দূরের বাগানে যে চার্চ

হয়েছে সেখানে তাঁকে প্রার্থনা করতে যেতে হবে। তাঁর নিজস্ব গাড়িতে তিনি চলে গেলেন।

কর্মচারীরা জনতাকে লাইনে দাঁড় করাল। বস্তায় কয়েন নিয়ে কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে। মিস্টার হেগের নির্দেশে একজন কর্মচারী ঘোষণা করল, সাহেব খুশি হয়ে তোমাদের মাইনে প্রতি সপ্তাহে এক পয়সা থেকে বাড়িয়ে আধুলি করে দিচ্ছেন। বড়রা আধুলি, ছোটরা সিকি।'

মিস্টার ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করলেন, 'হু ইজ লিডার? আস্ক হিম টু কাম হিয়ার।'

সংলাপের অনুবাদ শোনবার পর মাংরা সোমরাকে বলল, 'তুই যা। সাহেবকে বল।'

ভয়ে ভয়ে সোমরা এগোল। মিস্টার হেগ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুম বড়া সর্দার?'

সোমরা মাথা নেড়ে, হ্যাঁ বলল।

'নাম বাতাও।'

'সোমরা।'

'নো। ওর আসল নাম কী?' প্রশ্নটা বাবুকে।

বাবু কাগজ দেখে বলল, 'স্যামুয়েল সোমরা।'

'ডোন্ট ফরগেট ইয়োর নেম। মৎ ভুলনা। স্যামুয়েল সোমরা।'

বাবু ইশারা করলে সোমরা এগিয়ে গেল। তার আঙুল চালিয়ে প্যাড চেপে কাগজে ছাপ নিয়ে নেওয়া হলে সাহেব একটি আধুলি তুলে দিলেন ওর হাতে, 'ইয়োর স্যালারি। স্যালারি মিলল—, বাবু—?'

'তনখা।' বাবু বলল।

ওরা যখন নিজেদের আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে তখন সোমরাকে ঠেলল বুধন, 'যা।' কয়েক পা এগিয়েও থেমে গেল সোমরা। শেষ পর্যন্ত ঠিক করল বাবুকে বলবে। লোকটাকে তার রাগী বলে মনে হচ্ছে না।

বাবু মুখ তুলল, 'কী ব্যাপার?'

নিজের ভাষায় যতটুকু বলা সম্ভব বলল সোমরা। বাবু দু'-তিনটে প্রশ্ন করে ব্যাপারটা বুঝে মিস্টার হেগের কাছে গেল। মিস্টার হেগ তখন মিস্টার ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ম্যালেরিয়া হয়েছে ম্যাথিউসের। ওকে এখানে রাখা ঠিক নয়। মিস্টার ক্লার্ক এখনই ওকে নিয়ে যাবেন পাশের বাগানে। সেখান থেকে সদরের হাসপাতালে পাঠাবেন।

বাবুকে আসতে দেখে বিরক্ত হলেন মিস্টার হেগ, 'হোয়াটস দি ম্যাটার?'

বাবু বলল। শুনে মিস্টার ক্লার্ক বললেন, 'ইন্টারেস্টিং।'

মিস্টার হেগ মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু বাঁশ কেটে মাচা বানাতে তো সময় লাগবে। কখন করবে ওরা? টেল দেম আজই করুক।'

মিস্টার ক্লার্ক বললেন, 'আজ ছুটির দিন। কাল লাঞ্চের পর না হয় ওদের আধবেলা সময় দিন মাচা বানানোর।'

'উইদাউট পে?' ভাঁজ পড়ল মিস্টার হেগের।

'নো। আধবেলার মাইনে কেটে নেবেন।' মিস্টার ক্লার্ক বললেন।

বাবু ঘোষণা করতে সবাই উল্লসিত হল। কিন্তু আধবেলার মাইনে কাটা যাবে বলে বাবু জানাল না। এখন প্রত্যেকের হাতে পয়সা, এরকম দিনের কথা ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি। সোমরা আদেশ দিল, 'এখনই বাঁশ কাটতে হবে।'

হঠাৎ দেখলে মনে হবে মানুষগুলো উৎসবে মেতেছে। নারীপুরুষ হইহই করে জঙ্গলে ঢুকে বাঁশের ঝাড় মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছে। টুকরো করে নিয়ে আসছে যার যার ঘরের সামনে। গতকালের কাটা গাছের ডালও রাখছে তার পাশে। এবার ঘরের ভেতর বাঁশের খুঁটি মজবুত করে পুঁতে তার গায়ে মাচা বাঁধা হবে। সেটা থাকবে মাটির দু'ফুট উঁচুতে। কীভাবে সেটা করতে হবে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেল একজন কর্মচারী। কিন্তু

কাজটা শুরু করা গেল না আজ।

দুপুরের আগে ওদের সামনে হাজির হল একটা লরি। লরির তিন পাশের দেওয়াল নীচে নামিয়ে দিতেই দেখা গেল থরে থরে সাজানো নানান জিনিস। রান্নার তেলমশলা থেকে গায়ে মাখার সাবান, কাপড় কাচার সাবান, ডাল, গামছা, রঙিন জামা। ভেঁপু বাজিয়ে লরিওয়ালা ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করামাত্র হইহই করে ছুটে গেল ওরা। লরি ঘিরে ধরতেই লরিওয়ালা হাঁক দিল, 'কেউ কোনও জিনিসে হাত দেবে না। প্রত্যেক সপ্তাহে তনখার দিনে আমরা এই বাজার নিয়ে তোমাদের কাছে আসব। যার যা চাই তা দাম দিয়ে কিনে নাও। খুব সস্তা, খুব সস্তা।'

গ্রামের জীবনে ফসল উঠলে ওরা বাজারে যেত। একা লালমোহন তেলির নয়, আরও কয়েকটা দোকান আছে। ফসলের বিনিময়ে সেখান থেকে পছন্দের জিনিস পাওয়া যেত। ফসলের বিনিময়ে যেদিন পয়সা জুটত সেদিন কী আনন্দ!

এতোয়া ধমক খেল একটা লাল বলে হাত দিচ্ছিল বলে। ওর মুখ করুণ হয়ে গেল। দেখে খারাপ লাগল সোমরার। সে এগিয়ে গিয়ে বলের দাম জিজ্ঞাসা করল। ফেরিওয়ালার লোক বলল, 'এক পয়সায় একটা বল। আর কী চাই?'

সোমরার মনে হল শুধু একটা বল চাইলে ওরা বিক্রি করবে না। অন্য কিছু নিতে হবে। সে সাবানের দিকে আঙুল তুলল। লোকটা বলল, 'একআনায় দুটো সাবান নিলে বলের দাম দিতে হবে না।'

হাফপ্যান্টের পকেট থেকে আধুলিটা বের করে লোকটার হাতে দিতে সে ছয় আনা আর তিনটে জিনিস বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পড়ল। সোমরা প্রথম ক্রেতা। এতোয়ার এখন কান পর্যন্ত হাসি। রবারের বল হাতে পেয়ে সে গন্ধ শুঁকতে লাগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। সাবান দুটো পকেটে রেখে সোমরা দেখল সবাই এবার বাচ্চাদের জন্যে বল কিনছে। সে তেলের টিনটার দিকে আঙুল তুলতেই লোকটা চেঁচাল, 'খাঁটি

সরষের তেল। এই তেলে যা ভাজবে, যা রান্না করবে তাই অমৃত হবে। এক পোয়া তেলের দাম দু'আনা। তবে ওই তেল নিতে হলে পাত্র আনতে হবে।'

সোমরা এতোয়াকে বলল মাটির পাত্র নিয়ে আসতে। এখন তার রান্নাঘরে গাঁওবুড়োর খাওয়া মাটির পাত্র দুটো চলে এসেছে। এক ছুটে পাত্র নিয়ে এল এতোয়া। দু'আনা দিতেই কাঁচা সোনার মতো তরল পদার্থ তার পাত্রে ঢেলে দিল লোকটা। সন্তর্পণে সেটা নিয়ে গেল সোমরা রান্নাঘরে। আধঘণ্টার মধ্যে মানুষগুলোর হাত খালি হয়ে গেল। কখনও দ্যাখেনি এমন জিনিসও কিনেছে কেউ কেউ। পাশের ঘরের বর তার বউকে কিনে দিয়েছে ফুলতোলা জামা। বউ কিনেছে কাপড় কাচার সাবান আর গামছা। খদ্দেরদের সামনে সপ্তাহের লোভ দেখিয়ে ফেরিওয়ালারা গেল। এখন সামনের মাঠে বাচ্চারা বল খেলছে চেঁচামেচি করে। এ-ওর জিনিস দেখছে পরম আগ্রহে। মাংরা বলল, 'এখানে না এলে এসব হত?'

মাংরার বউ ঠোঁট ওলটাল, 'কক্ষনও না। ওখানে থাকলে মরে যেতাম।'

দুখন বলল, 'সামনের রবিবার একটা জামা কিনতে হবে। সেই জামা পরে কাজে যাব।'

মাংরা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'গাঁয়ে যখন ছিলাম তখন বাবার পূজা করতাম। কিন্তু বাবা কী দিয়েছেন আমাদের?'

দুখনের কড়া গলা শুনে কেউ একজন আপত্তি জানাল, 'অ্যাই চুপ। বলিস না। পাপ হবে।'

'যা সত্যি তাই বলছি। এখানে এসে যিশুর পুজো করতেই কত কী পেয়ে যাচ্ছি। তার কারণ আমি এখন ড্যানিয়েল দুখন।'

কথাটা সত্যি বলে মনে হলেও বাবাকে বাতিল করতে পারছিল না বাকিরা।

এখনও একটা সিকি তার সঞ্চয়ে আছে। এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রান্নাঘরের মাটিতে সে পুঁতে রাখল সিকিটা। এখানে থাকলে কেউ টের পাবে না।

এতোয়ার মাথায় বুদ্ধি আছে। মাছ ধরার জন্যে সে একটা অস্ত্র বের করেছে। একটা বাঁশের মুখ চিরে ভেতরে পাথর ঢুকিয়ে দিয়ে অনেকগুলো সরু ধারালো মুখ ছড়িয়ে গেছে গোল হয়ে। মাছের দিকে সজোরে ছুড়ে মারলে একটা না একটা ওর ভেতরে আটকে যায়। ঝরনায় গিয়ে গোটা চারেক পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে এল সোমরা। আঁশ ছাড়িয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে উনুন জ্বালল ও। তারপর মাটির একটা পাত্র সেই উনুনে চাপিয়ে তাতে একটু তেল ঢালল। দু'মিনিটের মধ্যে তেল চিড়বিড় করতে লাগল। ফুটছে তেল। এবার মাছ চারটে তার মধ্যে ছেড়ে দিল। একটা দিক ভাজা হচ্ছে। গন্ধ বের হচ্ছে বেশ। কিন্তু যা গরম, আঙুল দিয়ে ওলটানো যাচ্ছে না ওদের। চটপট একটা কাঠি খুঁজে নিয়ে মাছগুলোকে ওলটাল সে। বাঃ চমৎকার ভাজা হয়ে গেছে। তেল কমে গেছে অনেকটা। আবার তেল ঢালবে কিনা ভাবছিল সোমরা। না। তাতে তেল তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। সে অল্প জল ঢালল পাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলো ভাজতে লাগল। তারপর জলটাও গরম হয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। এবার একটু নুন ফেলে দিল ওর মধ্যে। তারপর নামিয়ে আনল পাত্রটা। জল ঢালার জন্যে আফশোস হল সোমরার। আর একটু তেল দিলে ভাজা খাওয়া যেত। এখন তো সেই সেদ্ধ হয়ে গেল। ভাত চড়াল সে। চাল শেষ হয়ে এসেছে। কানে এসেছে সোমবার সোমবার চাল আলু নুন দেবে সাহেব। সোমবার মানে তো কাল।

ভাত রান্না হয়ে গেলে এতোয়াকে ডাকার জন্যে বাইরে আসতেই লরির আওয়াজ কানে এল। আবার বোধহয় একটা লরিওয়ালা আসছে জিনিসপত্র বিক্রি করবে বলে। মানুষজন

অবাক হয়ে দেখল লরির ওপর পনেরো-ষোলোজন বিভিন্ন বয়সের মেয়ে। ওরা নামতেই ভিন্ন গ্রামের যারা ওখানে আছে, তারা ছুটে গেল। হাসি হাসি মুখে মেয়েরা এগিয়ে এল। জড়িয়ে ধরল নিজের গ্রামের মেয়েদের। একত্রিত হলে দুখন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের এখানে পাঠাল কেন?'

একজন বয়স্ক বলল, 'আমাদের সাহেব বলল তোমাদের কাছে বেড়াতে যেতে। তাই এলাম।'

'বাঃ। সাহেবটা তো খুব ভাল। এসো, এসো। এখানেই বসো। এই এখানে আমরা থাকি। তবে ঘরগুলো যেমন দেখছ তেমন থাকবে না। ওই যে বাঁশ কাটা হয়েছে, ওগুলো দিয়ে মাচা তৈরি হবে, মাচার ওপর শোব আমরা। পেছনে একটা ঝরনা আছে, তাতে অনেক জল। আজ আমরা মাইনে পেয়েছি। ছেলেরা গোটা আধুলি, মেয়েরা সিকি। তোমরা কেমন আছ?'

আমাদের সাহেবটা ভাল তবে ছোট সাহেবটা খারাপ। খুব খারাপ। দোষ দেখলেই চাবুক চালায়। একটা লোহার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তিনদিন জলও খেতে দেয় না। আমাদের কারও কারও জ্বর হয়েছে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। বড় সাহেব ওই ছোট সাহেবকে দিয়ে ওষুধ আনিয়ে ওদের খাইয়েছে। আমরা এখনও মাইনে পাইনি। তোমরা যখন পেয়ে গেছ তখন নিশ্চয়ই বড় সাহেব আমাদেরও দেবে। আমাদের ঘরগুলো অবশ্য তেমন ভাল নয়। তোমরা বাঁশ কেটে মাচা বানাবে, এ কথাটা বড় সাহেবকে বলতে সাহস হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, গাঁয়ে যেভাবে ছিলাম তার থেকে অনেক ভাল আছি আমরা।'

সোমরা দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিল কথাবার্তা। তার চোখ এবার বুধনিকে আবিষ্কার করল। ভাল শাড়ি পরেছে মেয়েটা। চেহারাতেও জুলুস এসেছে। টেরিয়ে টেরিয়ে তাকে দেখছে। চোখাচোখি হতেই ঠোঁট মুচড়ে হাসল। ঠোঁটের সেই মোচড়

দেখে সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল সোমরার। এই সময় পাশের ঘরের বউ তাকে ডাকল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল বর-বউ দাঁড়িয়ে আছে। সে কাছে যেতেই বউটা বলল, 'সেই রাক্ষুসিটা এসেছে। ওর কাছ থেকে দূরে থাকো।'

রাগ হল সোমরার। জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

এবার পাশের ঘরের বর বলল, 'আহা। যা বলছে তাই শোনো না।'

লোকটার দিকে তাকাল সোমরা, 'এখানে সবাই আমাকে সর্দার বলে মেনে নিয়েছে। আমি যা ভাল মনে করব তাই হবে। যে মেয়েটাকে ভাল করে চেনো না তাকে রাক্ষুসি বলছ তোমরা?'

পাশের ঘরের বউ মুখ ঘুরিয়ে ফিরে গেল তার ঘরে। দেখাদেখি তার স্বামীও চলল। সামনের জটলাটা তখন ভেঙে গিয়েছে। যারা এসেছে তারা এখানকার মানুষের সঙ্গে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে। কেউ জঙ্গল দেখতে যাচ্ছে, কেউ বা ঝরনা।

বুধনির সঙ্গে আর একজন বয়স্কা হাঁটছিল। লক্ষ্যবিহীন সেই হাঁটার সময়েও বুধনি তাকাচ্ছে এদিকে। হঠাৎ বয়স্কা স্ত্রীলোকটি বুধনিকে নিয়ে এগিয়ে এল। 'ওরা বলল তুমি সর্দার হয়েছ?'

লজ্জা পেল সোমরা, বলল, 'ওই আর কী!'

বুধনিকে দেখিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল, 'একে মনে আছে?'

সোমরা তাকাল। তারপর কপট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে না বলল।

শোনামাত্র মুখ ঘুরিয়ে নিল বুধনি।

স্ত্রীলোকটি অবাক হয়ে বলল, 'সেকী? মনে নেই?'

সোমরা হাসল, 'ভোলা যায়?'

এবার বুধনি তাকাল। গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলল।

'এখানে আসার পর ওর খুব সমস্যা বেড়েছে। সাহেবের

চৌকিদাররা হাত ধরে টানে, ওকে জঙ্গলে যেতে বলে। কোনও রকমে সামলে আছি। আজ এখানে আসার আগে ছোট সাহেব ডেকেছিল। এক নতুন সাহেব নাকি জ্বর নিয়ে তার কাছে এসেছে। সেই সাহেবকে সেবা করতে হবে। সেবা করা মানে কী তা তো বুঝতে পারছ।' স্ত্রীলোকটি বলল।

'ওর যদি মেমসাহেব হওয়ার ইচ্ছে হয়ে থাকে—।' কথা শেষ করল না সোমরা।

'মেমসাহেব? দু'দিন পরে ছুড়ে ফেলে দেবে। তাই বলি কী, তোমার যদি ওকে মনে ধরে থাকে তা হলে বিয়ে করো না।' স্ত্রীলোকটি হাসল।

কী বলবে বুঝতে পারছিল না সোমরা।

স্ত্রীলোকটি বলল, 'সত্যি কথা বলি, বুধনি বিধবা। বাচ্চা হয়নি। স্বামী ছাড়া আজ পর্যন্ত কারও সঙ্গে শোয়নি। আর শুনেছি তোমারও বউ মরে গেছে, দু'জনের মধ্যে মিল হবে খুব।'

'একটু ভাবি।' সোমরা বলল।

স্ত্রীলোকটি বলল, 'তাড়াতাড়ি ভেবে ঠিক করো। তোমার ঘর কোনটা?'

সোমরা ওদের নিয়ে এল। ঘর দেখল ওরা। সোমরা বলল, 'এই ঘরে থাকা হলে অন্য রকম হয়ে যাবে। তোমরা খেয়ে এসেছ?

স্ত্রীলোকটি বলল, 'সেই ভোরবেলায় খেয়েছি।'

এতোয়া দাঁড়িয়ে ছিল সামনে। তাকে চারটে বড় পাতা আনতে বলল সোমরা। সেগুলো ধুয়ে দু'জনের ভাত চার ভাগ করল সোমরা। তার মাঝখানে গর্ত করে ঝোলসুদ্ধ একটা পুঁটি মাছ ঢেলে দিল। এইসময় পাশের ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

ঝোল দেখে স্ত্রীলোকটি উৎফুল্ল। এতোয়া বলল, 'অন্য রকম লাগছে। আজ নতুন তেলে রান্না করেছ?'

সোমরা হাসল। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

ওদের খাওয়া দেখে মনে হল বেশ তৃপ্তি পাচ্ছে, খাওয়ার পর বুধনি এতোয়াকে নিয়ে পাত্রগুলো ধোওয়ার জন্যে ঝরনায় চলে গেল। ওরা চলে গেলে স্ত্রীলোকটি বলল, 'যা করার তাড়াতাড়ি করো, নইলে ওকে বাঁচানো যাবে না। ও তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে।'

'কী করে বুঝলে?'

'বাঃ। যে মেয়ের মুখে সব সময় কথা সে তোমাকে দেখার পর মুখ বুজে আছে। ভাল না বাসলে এমন হয় না।' স্ত্রীলোকটি বলল, 'যাও না, ঝরনায় গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলো।'

সোমরা উঠল। এখন পড়ন্ত বেলা। খাওয়ার পর শরীরে আরাম এসেছে।

পেছনের জঙ্গলের অনেকটা কেটে ফেলায় ঝরনায় যাওয়ার সময় গাছের আড়াল নেই। কেউ কেউ তাকে দেখছে। একজন চিৎকার করল, 'এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেল?'

সে মাথা নাড়ল। তারপর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঝরনায় পৌঁছে দেখল এতোয়া বুধনিকে মাছ ধরা শেখাচ্ছে। পাথর তুলে খপ করে ছোট কাঁকড়া ধরে আবার জলে ছুড়ে ফেলছে। সোমরাকে দেখে সে তার বীরত্ব বন্ধ করল। সোমরা এসেছে দেখে বুধনি এতোয়াকে বলল, 'কী হল?'

মাথা নেড়ে সোমরা ধুয়ে-রাখা পাত্র তুলে ঘরের দিকে চলে গেল।

বুধনি হাসল, 'বাব্বা! বাঘ না ভাল্লুক যে এত ভয় পায়!'

'আমি কাউকে ভয় দেখাই না।'

'ভয় দেখাতে গেলে শক্তি লাগে।' জল থেকে উঠে এল বুধনি। তার শাড়ির নীচের দিকটা সামান্য ভিজে গেছে। তারপর ঘরের দিকে না গিয়ে নদীর ধার দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে লাগল। পেছন পেছন এসে সোমরা বলল, 'আলো কমে আসছে। তোমাদের লরি ফিরে যাবে।'

'যাবে না।' বুধনি পেছনে তাকাল না।

'এই জঙ্গলে কোথায় যাচ্ছ?'

'ওদিকে লোকজন ঝরনায় আসছে। আমার লোক ভাল লাগে না।'

'এদিকে কিন্তু জানোয়ার আছে!' হাসল সোমরা।

'জানোয়াররা অনেক ভাল। তারা মানুষের মতো শুধু বুকের দিকে তাকায় না।' বুধনি অদ্ভুত গলায় বলল, 'আমি যদি ওই সাহেবের কাছে যাই তা হলে মরে যাব।'

'কেন?'

'কাল ওই সাহেবটা দুপুরে এসেছিল। আমরা তখন গাছ কাটছিলাম। আমার দিকে এমন করে তাকাচ্ছিল যেন গিলে খাবে। ছোটসাহেবকে কীসব বলছিল। আর আজই তার অসুখ করল আর ছোটসাহেব খবর পাঠাল সেবা করতে যেতে হবে। সব বুঝি।' বুধনি এবার ঘুরে দাঁড়াল।

চারপাশে ঘন গাছের আড়াল, বাঁ দিকে গাছের ফাঁকে নদীর জল বয়ে যাচ্ছে। তাতে শেষ বিকেলের আলো পড়ায় চকচক করছে।

'আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি?' সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল বুধনি।

'না-না-তা নয়—!' মাথা নাড়ল সোমরা।

'তোমার যে বউ ছিল আমি কি তার থেকে খারাপ দেখতে?'

'মোটেই না।'

'তা হলে?'

জবাব দিতে পারছিল না সোমরা। গাঁয়ে থাকলে যেভাবে বিয়ে করা যায় এখানে সেটা কীভাবে সম্ভব। দু'জন দুই বাগানে থাকে। সাহেব কী বলবে?

সোমরাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে হঠাৎ পরনের শাড়ি কোমরের নীচে নামিয়ে দিল বুধনি। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমাকে না নিলে এই দুটো শরীর থেকে কেটে বাদ দিতে পারবে? তা হলে আমাকে

কেউ চাইবে না। কেউ না।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সে।

কাপড়ের আড়াল সত্ত্বেও একটা আন্দাজ ছিল, এখন চোখের সামনে অকল্পনীয় গড়নের বুক দেখে স্থির থাকতে পারল না সোমরা। দৌড়ে কাছে গিয়ে বুধনিকে জড়িয়ে ধরল, গাঢ় গলায় বলল, 'বিয়ে করব, আমি তোকে বিয়ে করব। তুই আমার, আমার।'

সঙ্গে সঙ্গে বুধনি সাপ হয়ে গেল। সমস্ত শরীর দিয়ে জড়িয়ে ধরল সোমরাকে। দুটো শরীর ঘাসের ওপর পড়ে যেতেই গাছের পাখিরা লাফিয়ে লাফিয়ে চিৎকার করতে আরম্ভ করল। একটি শেয়াল সাহসী হয়ে গাছের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দৃশ্যটি দেখল।

ছায়া ঘন হতেই লরির ড্রাইভার হর্ন বাজাতে শুরু করল। রাত নামার আগেই ফিরে যেতে হবে তাকে। সেই হর্ন শুনে বেড়াতে আসা মেয়েরা একে একে লরিতে উঠতে লাগল। তাদের বিদায় জানাতে লরির কাছে ভিড় করল এখানকার বাসিন্দারা। সামনের বার তোমরা এসো আমাদের ওখানে। হ্যাঁ, সোমরাকে বলব সাহেবকে বলে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। এইসব কথা বলার পর মাথা গোনা শুরু হলে দেখা গেল একজন কম পড়েছে। কে সেই জন? উত্তরটা পাওয়া গেল তখনই। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'বুধনি আসেনি।'

বুধনি, বুধনি, বুধনি। চিৎকারে জঙ্গল তোলপাড় হল। যে স্ত্রীলোকটিকে বুধনির সঙ্গে দেখা গিয়েছিল সে চোখ উলটে বলল, 'কোথায় গেল! বাঘে নিয়ে যায়নি তো!'

'দুর! বাঘ কাউকে ধরলে শব্দ হয়। চিৎকার করে মানুষ। কোথাও ঘুমিয়ে পড়ল না তো। এই এতোয়া, বুধনি তো তোর সঙ্গে ঝরনায় যাচ্ছিল, কোথার সে?

এতোয়া বলল, 'আমি চলে এসেছি, সোমরা গিয়েছিল তখন।'

হুঁশ হল। সোমরাকেও তো দেখা যাচ্ছে না। সোমরা, সোমরা, সোমরা। লোকগুলো আবার চেঁচাল। সোমরার সাড়া পাওয়া গেল না।

লরির ড্রাইভার আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়। একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না একথা সে সাহেবকে জানিয়ে দেবে। অনুরোধ উপেক্ষা করে সে লরি চালু করল। সশব্দে সেটা চলে গেল চোখের আড়ালে। মানুষগুলো এই নিয়ে কথা বলা শুরু করল। কী ভয়ংকর শাস্তি বুধনি পাবে তা কল্পনা করছিল। ওদের বাগানে যে খাঁচা তৈরি হয়েছে সেখানে যদি ঢুকিয়ে দেয় তা হলে তিন দিন উপোস করেও বেঁচে থাকতে পারবে। সোমরাকে কি শাস্তি দেবে এখানকার সাহেব? পাশের ঘরের বউ চিৎকার করল,' কেন দেবে না? সোমরা বিধবাকে জোর করে আটকে রেখেছে, তোমরা না বললে আমার বর সাহেবকে বলবে।'

পাশের ঘরের বর বলল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

আজ পাতলা অন্ধকারেই হাঁসুলির চেয়ে ঈষৎ মোটা চাঁদ দেখা গেল। এবং তার ঘোলা আলো গায়ে মেখে ওদের ফিরে আসতে দেখল সবাই।

দুখন মাংরারা ছুটে গেল ওদের কাছে, 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি? তোমার লরি চলে গেছে একটু আগে!'

বুধনি হাসল, 'যাক।'

মাংরা বলল, 'যাক মানে? তোমাকে এর জন্যে কী শাস্তি দেবে জানো?'

সোমরা বলল, 'ও যদি ওখানে ফিরে না যায় তা হলে শাস্তি দেবে কী করে?'

দুখন বলল, 'তার মানে বুধনি এখানে থাকবে? সাহেব থাকতে দেবে?'

'কেন দেবে না?' সোমরা মাথা নাড়ল, 'এখন থেকে ও আমার বউ।'

'বউ? তোরা বিয়ে করলি কখন? কে সাক্ষী?'

'বাবা সাক্ষী, যিশু সাক্ষী।'

'যাঃ। এভাবে বিয়ে হয় না।' দুখন মাথা নাড়ল।

'আমরা চার্চে গিয়ে পাদরিকে বলব বিয়ে দিতে, তিনি দিয়ে দেবেন।'

'যদি না দেন?'

'কেন দেবেন না? আজ সকালে শুনিসনি, পাদরি যিশুর কথা বলেছেন, তোমরা যদি বিপদে পড়ো তা হলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের রক্ষা করব।'

সোমরার কথা শেষ হলেই ভিড় ফাঁকা হতে শুরু করল। শুধু মাংরা বলে গেল, 'সাহেব যদি তোকে শাস্তি দেয় তা হলে কেউ তোকে সর্দার বলে মানবে না।'

ওরা যখন মাঠের ভেতর একলা তখন সোমরা বলল, 'চল।'

'কোথায়?' বুধনি জিজ্ঞাসা করল।

'আমার ঘরে।'

'ধ্যেৎ।' লজ্জায় মুখ নামাল বুধনি।

'কেন?'

'আগে বিয়ে হোক নইলে সবাই কী বলবে!' তাকাল বুধনি।

শ্বাস ফেলল সোমরা, 'তা হলে আজ রাত্রে কোথায় থাকবে?'

'কেন? এখানেই।'

'পাগল। এই যে আমরা এখন এখানে বসে আছি যে-কোনও মুহূর্তে বাঘ আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে। আর একটু রাত বাড়লে ধরবেই। তার চেয়ে—!' সোমরার মাথায় বুদ্ধি এল, 'গাঁওবুড়োর ঘর খালি পড়ে আছে। তুমি এতোয়ার সঙ্গে ওই ঘরে আজ রাত্রে থাকতে পারো। কাল ভোরে আমরা চার্চে যাব।'

'আমার ভয় করছে।'

'কেন?'

'তোমার কাছ থেকে সরে গেলে যদি কেউ কিছু বলে!'

'বলে দেখুক, মজা টের পাবে।' উঠে দাঁড়াল সোমরা, 'চলো।'

ওরা সোমরার ঘরের সামনে এসে দেখল এতোয়া সেখানে নেই। কয়েকবার এতোয়ার নাম ধরে ডাকল সোমরা কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। ছেলেটা গেল কোথায়? চিন্তায় পড়ল সোমরা। তারপর গাঁওবুড়োর ঘরে গিয়ে অবাক হল। এতোয়া সেখানে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে রয়েছে। তাকে ডেকে তুলতে সে জানাল সবাই জোর করে এখানে নিয়ে এসেছে, বলেছে এখন থেকে এখানেই একা শুতে। সোমরা বলল, 'বুধনি এখানে শোবে আজ, ঠিক আছে?'

এতোয়া মাথা নাড়ল খুশি হয়ে। একা থাকতে তার ভয় করছিল।

বুধনিকে ওখানে রেখে সোমরা যখন নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছে তখনই কানে গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ এল। গাড়ি যে এদিকে আসছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কি পাশের বাগানের সাহেব গুনতিতে একজন কম হওয়ায় বুধনির সন্ধানে আসছে? এসে জোর করে ওকে নিয়ে যাবে? যাই হোক, সাহেব সামনে এসে দাঁড়ালে তার কিছু করার থাকবে না। সাহেবের চাবুক, কর্মচারীদের লাঠির আঘাত সহ্য করা ছাড়া কোনও রাস্তা নেই। প্রতিবাদ করলে সাহেব যদি তাদের সবাইকে দেশে পাঠিয়ে দেয়? কিংবা চাল, আলু, মাইনে দেওয়া বন্ধ করে? তা হলে দলের সব মানুষ তাদের বিরুদ্ধে যাবে। অবশ্য এত সব যে সে ভাবছে তা সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। সে দৌড়ে গাঁওবুড়োর ঘরে পৌঁছে গেল। গিয়ে ডাকল, 'বুধনি!'

বুধনি চট করে বেরিয়ে এল, 'কী?'

'একটা গাড়ি আসছে। আমার খুব ভয় করছে। যদি তোর খোঁজে আসে?'

'আমি যাব না।' মাথা নাড়তে লাগল বুধনি।

'তা হলে চল জঙ্গলে গিয়ে লুকোই, দেখি কেন আসছে গাড়িটা।'

'চলো।' এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করল না বুধনি।

ওরা দৌড়াল। ঘোলা জ্যোৎস্না মেখে কালো জঙ্গল যেন তাদের ডাকছিল। ওরা সেই জঙ্গলে ঢুকে যেতেই গাড়িটা থামল ঘরগুলোর সামনে।

গাড়ি থেকে নামলেন হেগসাহেব, তারপর পাশের বাগানের ছোট সাহেব। দু'জন কর্মচারী। একজন কর্মচারী হাঁকল, 'সর্দার! এ সর্দার।'

কোনও সাড়া এল না। কিন্তু মানুষগুলো একে একে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। পাশের বাগানের ছোট সাহেব এবার চিৎকার করল, 'বুধনি কোথায়?'

সবাই চুপ করে থাকল। হেগসাহেব রেগে গেলেন, 'কথা বল। কথা না বললে কাল থেকে চাল আলু পাবি না। প্রত্যেককে কুড়িবার চাবুক মারা হবে রোজ। ইনি পাশের বাগানের ছোট সাহেব। এত রাত্রে উনি এসেছেন বুধনির জন্যে। বুধনি ওঁদের বাগানের সম্পত্তি। আমরা ওদের সম্পত্তি আটকে রেখেছি। এটা আমাদের বাগানের দুর্নাম। তাকে এখানে আসতে বল।'

শেষ পর্যন্ত মাংরা বলল, 'ও সোমরার সঙ্গে আছে।'

'সোমরা? স্যামুয়েল সোমরা? সে তো তোদের সর্দার।' সাহেব বললেন।

'আমরা ওকে সর্দার বলে আর মানি না।' দুখন বলল।

'তারা কোথায়?'

কয়েকজন ছুটল সোমরার ঘরের দিকে। সেখানে কাউকে না পেয়ে ফিরে এল।

একজন বলল, 'ওরা নাকি বিয়ে করছে। স্বামী-স্ত্রী।'

'বিয়ে?' হেগসাহেব অবাক হলেন।

এইসময় পাশের ঘরের বউ তার স্বামীকে খোঁচাল, 'বলো, বলো।'

পাশের ঘরের স্বামীর গলা শুকিয়ে গেল। কথা বলতে না পেরে সে হাত তুলল।

ছোট সাহেব জন সেটা লক্ষ করে চেঁচালেন, 'ইয়েস, এগিয়ে এসো। কী বলবে তুমি?'

পাশের ঘরের স্বামী বলল, 'না, মানে, ইয়ে—!'

পাশের ঘরের বউ চাপা গলায় বলল, 'আঃ বলো।'

'সোমরা একটা বিধবা মেয়েকে জোর করে আটকে রেখেছে।'

'বিধবা? কে বিধবা?' জন চেঁচাল।

'বুধনি।'

উত্তরটা শুনে জন হেগসাহেবের দিকে তাকাল। হেগসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওকে কোথায় সোমরা আটকে রেখেছে বল!'

দুখন বলল, 'এখানে যখন নেই তখন বোধহয় জঙ্গলে চলে গিয়েছে।'

জন বলল, 'জঙ্গলে গিয়ে কতক্ষণ আর থাকবে। আমরা চলে গেলেই ফিরে আসবে। ফিরে এলেই তোমরা তাদের ধরে বেঁধে রাখবে। কাল সকালের মধ্যে ওদের আমরা চাই।'

অনেকেই মাথা নাড়ল।

হেগসাহেব নিচু গলায় বললেন, 'জন, তোমার কি মনে হয় একজন যুবতী মেয়েকে কেউ একা জোর করে জঙ্গলে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে পারে?'

'তা অবশ্য—।' জন থমকাল। তারপর বলল, 'কিন্তু মেয়েটা! একবার স্বামীর ঘর করেছিল। অভাব কী তা জানে। ওকে বাগানের কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকার করতে চেয়েছিলাম! অনেক আরামে থাকত সে। যদি সে স্বেচ্ছায় ছেলেটার সঙ্গে যায় তা হলে বুঝতে হবে ওর

মাথায় গোলমাল আছে।'

'হুঁ। চলো, এখানে দাঁড়িয়ে কোনও লাভ নেই। এদের যা বলা হয়েছে তাই করবে। ওরা ফিরলে এরা ধরে বেঁধে রাখবে।' হেগসাহেব গাড়িতে উঠলেন।

গাড়িটা ফিরে গেলে ওরা এ নিয়ে কথা বলতে লাগল। বেশির ভাগই একমত যে নিজেদের স্বার্থে ওদের ধরিয়ে দেওয়া উচিত। কয়েকজন অবশ্য মিনমিন করে প্রতিবাদ করছিল। ওরা যদি বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায় তা হলে অন্যায় কীসের! কিন্তু এই প্রস্তাব হালে পানি পেল না। পাশের ঘরের বউ তার স্বামীকে নিয়ে সদর্পে নিজের ঘরে ফিরে গেলে বাকিরা আর বাইরে দাঁড়াল না।

দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা দেখছিল। কী কথা হচ্ছে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না। তবে সাহেবদের চিৎকার কানে আসছিল।

বুধনি বলল, 'কী হবে?'

'কিছুই হবে না। তুই এই গাছে উঠতে পারবি?'

'গাছে? কেন?'

'এখানে সারারাত থাকা যাবে না। গাছে উঠলে আমাদের প্রাণ বাঁচবে। সোমরা বলল।

জঙ্গলের ভেতর জ্যোৎস্না ঢুকবে এমন চাঁদ আজ ওঠেনি। কিন্তু অন্ধকার পাতলা হয়েছে। বেশ কিছুটা চেষ্টার পর ওরা ওপরে উঠতে পারল। একটা মোটা ডালে পাশাপাশি বসে বুধনিকে ধরে রাখল সোমরা। তোর ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়, আমি ধরে আছি।'

বুধনি হাসল, বোঝাল তার ঘুম আসছে না।

জঙ্গলের ভেতর থেকে অদ্ভুত সব আওয়াজ ভেসে আসছে। ঝিঁঝি ডাকছে। একটানা। গাছের নীচ দিয়ে দুটো প্রাণী ছুটে গেল। আচমকা শেয়াল ডেকে উঠল।

বুধনি ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমাদের কী হবে?'

'প্রথমে বিয়ে করতে হবে।'

'কী করে?'

'রাত শেষ হওয়ার মুখে রওনা দেব। গির্জায় গিয়ে বলব বিয়ে করতে চাই।'

'যদি না রাজি হয়?'

'কেন হবে না? যিশু বলেছে বিপদে পড়লে ওর কাছে যেতে, আমরা তো এখন বিপদে পড়েছি। ঠিক বিয়ে দেবে। বিয়ে হয়ে গেলে আর আমি ভয় পাই না।' সোমরা বলল।

'তবু যদি না দেয়—!' বুধনি তাকাল। সোমরার মুখ আবছা দেখতে পাচ্ছে সে। এত কাছে থেকেও আবছা। তার মন বলছিল, মানুষটা ভাল, খুব ভাল।

'তা হলে আমরা চলে যাব।'

'কোথায়?'

'বহু দূরের দেশে। সেখানে গিয়ে বলব আমরা স্বামী-স্ত্রী।'

'কিন্তু কথাটা কি সত্যি?'

'তোর কি মনে হচ্ছে সত্যি নয়?' সোমরা প্রশ্ন করতেই তার কাঁধে মাথা রাখল বুধনি। অদ্ভুত একটা শব্দ বের হল গলা থেকে! 'উঁ।'

আশ্চর্য। রাতটা রাতের মতো কেটে গেল কিন্তু কোনও ভয়ংকর প্রাণীকে গাছের নীচে দেখা গেল না। না বাঘ, না বাইসন। শুধু খরগোশ আর শেয়ালের লুকোচুরি চলেছিল কিছুক্ষণ। ভোর হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে সোমরা বলল, তুই এখানে শক্ত হয়ে বসে থাক, আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?' আতঙ্কিত হল বুধনি।

আমার যা আছে নিয়ে আসি। সবচেয়ে বেশি দরকার লাঠিটা।'

'কিন্তু ওরা যদি তোমাকে আটকে দেয়?'

'দুর। আমাকে ধরতে ওদের সাহস হবে না। তুই চিন্তা করিস

না।' নিঃশব্দে নেমে গেল সোমরা। তারপর দ্রুত পা চালাল। চাঁদ ডুবে গেছে। অন্ধকার এখন বেশ ভাল। সন্তর্পণে হেঁটে চলে এল নিজের ঘরে। পোশাকের পুঁটুলি, লাঠিটা নিয়ে আবার ফিরে যেতে গিয়ে কাটারির কথা মনে পড়ল। এটা বাগানের জিনিস, কাজের জন্যে দেওয়া। বিপদে পড়লে এটা দারুণ কাজে দেবে। সঙ্গে নিল ওটাও।

মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা মাটির রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। সোমরা বলল, 'তোর জিনিসপত্র ওখানেই পড়ে আছে?

'হ্যাঁ। সঙ্গে আনলে সবাই সন্দেহ করত না? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'আমার মনে ভয় ছিল। যদি তুমি আমাকে না চাও।'

হাসল সোমরা, 'কখন বুঝলি আমি তোকে চাই।'

'ওমা! তোমাকে কে বলল আমি বুঝেছি!'

হতভম্ব হয়ে গেল সোমরা, 'সেকী? সত্যি বুঝতে পারিসনি?'

'কী করে বুঝব? সারারাত একসঙ্গে থাকলাম কিন্তু একবারও আদর করলে না!'

হাতের পুঁটলি লাঠি ফেলে দিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সোমরা ওকে। শরীরের স্পর্শ পাওয়ামাত্র শিরায় শিরায় ঢেউ উঠল। বুধনি একটুও আপত্তি করল না।

শান্ত হওয়ার পরে পাশাপাশি শুয়ে ওরা আকাশ দেখল। পুবের আকাশ লাল হচ্ছে।

বুধনির দিকে মুখ ফেরাল সোমরা! 'এখন নিশ্চয়ই বুঝেছ!'

ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি ফুটল বুধনির, 'একটু একটু।'

কচি কলাপাতার মতো আলো গির্জার গায়ে, পাখির ডাক ছাড়া কোনও শব্দ নেই। বুধনিকে নিয়ে গির্জার বারান্দায় উঠল সোমরা। গির্জার দরজা বন্ধ। এখানে কোনও মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছিল না। সোমরা বলল, 'পাদরি নেই নাকি?'

বুধনি চারপাশে তাকাল, 'কী হবে তা হলে!'

'হয়তো বেলা হলে আসবে।'

'কিন্তু সেইসময় যদি সাহেব ও আর সবাই থাকে।'

সোমরার মনে হল কথাটা ঠিক বলছে বুধনি। একটু আড়ালে গিয়ে অপেক্ষা করা উচিত। একটা বড় কাঁঠাল গাছ দেখতে পেল সে। বড় বড় ফল ঝুলছে। বাতাসে পাকা ফলের গন্ধ ভেসে আসছে। কাছাকাছি ডাল থেকে বড় কাঁঠাল ছিঁড়ে নিয়ে সে বুধনির সঙ্গে আড়ালে গিয়ে বসল। কাঁঠালটা ভাঙতেই সোনালি কোয়াগুলো যেন হেসে উঠল। একটু শক্ত শক্ত কোয়া, বিচি ফেলে মুখে দিতে গাল মিষ্টি রসে ভরে গেল। দু'জনের পেট ভরে গেল কিন্তু কাঁঠাল শেষ হল না।

পাতায় মুখ মুছে বুধনি বলল, 'আমার এখন ঘুম পাচ্ছে।'

'এখানেই ঘুমো। কেউ দেখবে না।'

'তুমি?'

'আমি জেগে আছি। পাদরি কখন আসবে তার ঠিক নেই।'

পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল মেয়েটা, রাত জাগার পর খাবার পেটে পড়ায় ঘুম আসতে দেরি হল না। কিছুক্ষণ পরে সোমরাও ঢুলতে লাগল। রাত জাগায় এবং শারীরিক তৃপ্তি তাকে জেগে থাকতে দিল না।

গাড়ির আওয়াজ কানে এল যখন, তখন সূর্য অনেক ওপরে উঠে গেছে। প্রায় ধড়মড়িয়ে উঠল ওরা। সোমরা মুখ বাড়িয়ে দেখল গাড়ি থেকে পাদরি নেমে চার্চের দরজা খুললেন। সঙ্গে একজন নিরীহ চেহারার কালো মানুষ যাকে কর্মচারী বলেই মনে হল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন বুঝতে পারল আর কেউ আসেনি তখন ওরা উঠল।

গির্জার দরজা খোলা। বারান্দায় উঠেই ওরা যিশুকে দেখতে পেল। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাত এবং শরীর থেকে রক্ত বের হচ্ছে। হঠাৎ সোমরার মনে প্রশ্ন এল। যিশুর অবস্থা দেখে বোঝাই যাচ্ছে কেউ অথবা কারা

ওঁকে এমন ভয়ংকর শাস্তি দিয়েছে। যিশু যদি ভগবান হন তা হলে তাঁর শাস্তি হবে কেন? যিনি বলেছেন বিপদে পড়লে রক্ষা করবে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি কেন?

'ইয়েস! তোমরা কী চাও?' ফাদার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

কীভাবে কথাটা বলবে ভেবে পাচ্ছিল না সোমরা। বুধনি তার পেছনে ছায়ার মতো।

'তোমরা কি কিছু চাও?'

মাথা নাড়ল সোমরা। তারপর বুধনির দিকে তাকাল।

'তোমরা কি স্বামী-স্ত্রী?'

'না। তাই হতে চাই।' সোমরা কথা খুঁজে পেল।

'আচ্ছা। বিয়ে করতে এসেছ। তোমাদের নাম কী?'

সোমরা বলল, 'স্যামুয়েল সোমরা।'

'তোমার?'

'বেটি বুধনি।'

'তোমাদের কি স্বামী অথবা স্ত্রী আছে?'

'না।' দু'জনেই মাথা নাড়ল।

'তোমাদের আত্মীয় বা বন্ধু নেই?'

'কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বুধনি বলল, 'না।'

'বেশ। আমি যা বলব তাই তুমি বলবে। বলো। আমি স্যামুয়েল সোমরা, বেটি বুধনিকে আমার আইনসম্মত স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছি এবং প্রতিজ্ঞা করছি যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন তার সমস্ত দায়িত্ব বহন করব।'

বিড়বিড় করল সোমরা।

পাদরি বললেন, 'এবার তুমি বলো, আমি বেটি বুধনি—।'

বুধনি বলল, 'আমি বেটি বুধনি—।'

বলা শেষ হলে পাদরি বললেন, 'যেহেতু তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক, তোমাদের স্ত্রী বা স্বামী নেই এবং স্বেচ্ছায় পরস্পরকে মেনে নিয়েছ তাই আমি এখন থেকে তোমাদের স্বামী এবং স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলাম। আমেন!'

পাদরি কিছু বলার আগেই ওরা দু'জন হাঁটু মুড়ে বসে যিশুকে প্রণাম করল।

সন্তুষ্ট হলেন পাদরি। পৃথিবীর সব দেশে যিশু প্রচারিত হলে মানুষের মঙ্গল হবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিকে সবার ওপর চাপিয়ে না দিয়ে বিভিন্ন জায়গার মানুষ তাদের নিজেদের মতো করে যদি যিশুকে গ্রহণ করে তা হলে তিনি আরও বেশি গ্রহণীয় হবেন। গির্জার খাতায় ওদের নাম স্বামী-স্ত্রী হিসেবে লিখে রাখা হল।

পাদরি বললেন, 'সামনের রবিবারে অবশ্যই এসো। আমি তোমাদের সবার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেব।'

গির্জা থেকে বেরিয়ে কিছুটা এসে সোমরা জড়িয়ে ধরল বুধনিকে, 'তুই খুশি?'

'খু-উ-ব।'

'এখন তো আর কোনও ভয় নেই। চল ঘরে ফিরে যাই।'

'যদি ওরা আমাকে কিছু বলে? যদি ছোট সাহেব জোর করে ধরে নিয়ে যায়?'

'আর পারবে না। আমরা স্বামী-স্ত্রী।'

'তোমাদের সাহেব কী রকম?'

'খারাপ না।'

'ওর কাছে চলো। ওকে গিয়ে বলো।'

এই প্রস্তাবটা পছন্দ হল সোমরার। সাহেব যদি একবার তাদের স্বীকার করে নেয় তা হলে কারও ক্ষমতা নেই কিছু বলার।

বুধনিকে নিয়ে সে চলল কাজের জায়গায় যেখানে সবাই গাছ কাটছে। সাহেব নিশ্চয়ই ওখানে যাবে। দূর থেকে ওদের দেখে গাঁয়ের চেনা মানুষগুলো এমন চিৎকার করে উঠল যেন শিকার দেখেছে। ভয় পেল ওরা। দৌড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল। কেবল ওরা চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে। আর দাঁড়াল না সোমরা। বুধনিকে নিয়ে জঙ্গলে আরও গভীরে ঢুকে গেল।

ম্যালেরিয়া এই বাগানেও ছড়াল। কিছু মানুষ মারা গেল। রেডিয়া মারা গিয়েছে হাসপাতালেই। তার বউ বাচ্চা বড় করছে, বাগানের কাজ করছে। ম্যাথিউস সুস্থ হয়ে ফিরে এল বাগানে। এসে জানল বুধনি এবং সোমরাকে খুঁজে বের করার কোনও চেষ্টাই করেননি হেগসাহেব।

মিস্টার হেগকে কথাটা বলতেই তিনি কাঁধ নাচালেন, 'আমার মাথায় অনেক চিন্তা, দুটো কুলি কামিন কোথায় পালিয়ে গেছে তা নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'বাট দ্যাট ম্যান ইজ এ ক্রিমিন্যাল। মেয়েটাকে ইলোপ করেছে।' ম্যাথিউস উত্তেজিত।

'তোমাকে কে বলল?'

'জন বলেছে।'

'জন আর তুমি চার্চে গিয়ে দেখে এসো, ফাদার ওদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছেন। অন্য বিষয়ে কথা বলো।' মিস্টার হেগ বললেন।

হেগসাহেবের সামনে আর কথা বাড়ায়নি ম্যাথিউস। জন তাকে কথা দিয়েছিল মেয়েটাকে তার অসুস্থতার সময়ে সেবা করাতে নিয়ে আসবে। কী দারুণ ফিগার মেয়েটার। ঘর অন্ধকার হলে ওর চামড়া নিয়ে মাথা ঘামানোর তো প্রয়োজন পড়ত না।

সেদিন কাজ দেখতে গিয়ে ম্যাথিউস যে লোকটাকে গাছের নীচে ঘুমিয়ে থাকতে দেখল সে সোমরার পাশের ঘরের স্বামী। মাথায় আগুন জ্বলল ম্যাথিউসের। মিস্টার হেগের নির্লিপ্ততা সেই আগুনকে বাড়াল। বেধড়ক চাবুক মারতে লাগল সে লোকটাকে। রক্তাক্ত মানুষটাকে একটা গাছে বেঁধে রাখল। হুকুম দিল যে ওর কাছে যাবে তারই ওই অবস্থা হবে। বিকেলে লোকটাকে ছেড়ে দিয়েও সে অপরাধীদের জন্যে লোহার খাঁচার ব্যবস্থা করল। পান থেকে চুন খসলেই বেধড়ক মার মেরে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। মিস্টার হেগ

চুপচাপ দেখে যাচ্ছিলেন, কিছু বলছেন না।

ইতিমধ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করে মাটি কোপানো শেষ হয়ে যাওয়ার পর সেই মাটি সমান করে নার্সারি তৈরির ব্যবস্থা হয়ে গেল। গতকালের ডাকে হেগসাহেব একটি বই পেয়েছিলেন। সকালে অফিসে এসে বইটি নিয়ে বসেছিলেন তিনি। বাংলার মাটিতে প্রথম চা-গাছের বীজ পোঁতা হয় সতেরোশো চুয়াত্তর সালে। আমদানিকৃত চা-বীজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে রোপণ করান লর্ড ওয়ারেন্ট হেস্টিংস। কিন্তু আসামের উপজাতিদের মধ্যে চা-পানের অভ্যেস ছিল। আঠারোশো পনেরো সালে চায়ের ঝোপ আবিষ্কৃত হয় আসামে। চার্লস ব্রুক নামে একজন স্কট এই আবিষ্কার করেন। তিনি বিশ গ্যাম নামের এক উপজাতি প্রধানের সাহায্যে চা-বীজ এবং গাছ সংগ্রহ করেন। কীভাবে বীজ বোনা হবে, গাছ বের হলে তার পরিচর্যা কীভাবে করতে হবে তা মিস্টার হেগের জানা। নতুন করে আবার পড়লেন। চায়ের বীজ তাঁর কাছে এসে গেছে। কাজটা তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করতে চান। কিন্তু তার আগে পাশের বাগানে গিয়ে দেখে আসতে হবে ওরা ঠিক কী করছে। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

ম্যাথিউস অফিসে এসে হেগসাহেবকে পেল না। বাবুকে ডেকে কুলিদের মাইনের ব্যাপারে প্রশ্ন করে জানল তার পরিকল্পনা মিস্টার হেগ গ্রহণ করেননি। খুব রাগ হয়ে গেল তার। কিন্তু অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হয়ে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করলে কোম্পানি শুনবে না যদি মারাত্মক তথ্য না থাকে। অতএব সংঘাতে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। মিস্টার হেগকে বোঝাতে হবে যে, এই এত দূরে সভ্যতার বাইরে বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় দিনের পর দিন থেকে কোম্পানির প্রতি আনুগত্য দেখানোর বিনিময়ে মাইনে ছাড়া যখন কিছুই আশা করা যায় না তখন কোম্পানির ক্ষতি না করে কিছু রোজগার করতে ক্ষতি কী! তা ছাড়া মিস্টার ডগলাস

জনকে যত স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন মিস্টার হেগ তা তাকে দেননি। এটা নিয়েও কথা বলা দরকার। ঘড়ি দেখল ম্যাথিউস। মিস্টার হেগ হয়তো লাঞ্চ করতে বাংলোয় গিয়েছেন। পেটে খাবার পড়লে মানুষের মাথা ঠান্ডা থাকে। এই সময় কথা বলা যেতে পারে। ম্যাথিউস মিস্টার হেগের বাংলোর দিতে রওনা হল।

একটা বিরাট কালো গোখরো সাপকে পিটিয়ে মারছিল বাংলোর কর্মচারীরা। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিল সুসান। নীচে, কিছুটা দূরে খুরপি হাতে বসে ছিল গাঁওবুড়ো। প্রথম প্রথম লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে ওপরের দিতে তাকিয়ে থাকত, এখন তাকায় না। তবে এখানে আসার পর লোকটার চেহারায় পরিবর্তন হয়েছে। দু'বেলা পেটে ভাত পড়ছে তা বোঝা যায়। লোকটার বউ হিসেবে ওকে ভাল থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছে বলে খুশি সুসান। এখানে এখন সবাই সুসান বলে ডাকে তাকে। সবাই মানে, সাহেব আর আলি। অন্যদের অধিকার নেই তার সঙ্গে কথা বলার।

হঠাৎ গেট পেরিয়ে যে লোকটাকে বাংলোয় ঢুকতে দেখল সে একজন সাহেব। সাদা চামড়ার কিন্তু অল্পবয়সি। লোকটার নজর তার ওপর পড়েছে। দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকে দেখছে। সেই দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। নজর দেখেই বোঝা যায় লোকটা খারাপ। সুসান দ্রুত চলে গেল তার ঘরে। ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

বিস্মিত ম্যাথিউস সিঁড়ির কাছ পৌঁছাতেই আলি তাকে সেলাম করল।

'মিস্টার হেগ বাংলোয় আছেন নিশ্চয়ই।' ম্যাথিউস জানতে চাইল।

'নেহি সাব। অফিসমে হ্যায়।' আলি বিনয়ের সঙ্গে বলল।

'না। অফিসে নেই। তা হলে লাঞ্চ করতে আসেননি?'

'নেহি সাব।'

'ঠিক আছে, আমি ওপরে গিয়ে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।' উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে সোজা দোতলায় চলে এল ম্যাথিউস। বেতের চেয়ারে শব্দ করে বসে হতাশ হল, মেয়েটা নেই। মিস্টার হেগ তা হলে আরামেই আছেন। যে মেয়েটাকে একটু আগে সে দেখতে পেয়েছে সে নিশ্চয়ই বাগানে কাজ করে না। অথচ ওর গায়ের রং বলে দিচ্ছে অন্যদের সঙ্গেই এসেছে। কোম্পানির কাজের জন্যে পয়সা খরচ করে আনা কামিনকে মিস্টার হেগ যে নিজের ভোগের জন্যে রেখেছেন এটা তো বেআইনি ব্যাপার। একটা তথ্য পাওয়া গেল। কিন্তু এই মেয়েটার শরীরে যে পোশাক তা তো কামিনরা পরে না। নিশ্চয়ই মিস্টার হেগ দিয়েছেন। ম্যাথিউসের মনে হল জনদের বাগানে যে মেয়েটাকে দেখে তার মনে ধরেছিল তার বয়স অনেক কম, কিন্তু এর শরীর অনেক সমৃদ্ধ। তা মেয়েটা যখন মিস্টার হেগের বউ নয় তখন তিনি ওকে একা ভোগ করবেন কেন? ও তো বাগানের সম্পত্তি।

'সাব। হুইস্কি?' আলি সামনে এসে সেলাম করল।

'নট নাউ। আচ্ছা, একটু আগে এখানে একটা মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, কে ও?'

'এখানে থাকে সাব।'

'কী করে?'

'সাহেবকে দেখাশোনা করে সাব।'

'তাই নাকি? ডাকো তাকে। আমার দেখাশোনা করার জন্যে মেয়ে খুঁজছিলাম, মিস্টার হেগকে বলে ওকেই না হয় নিয়ে যাব। কল হার।' হুকুম করল ম্যাথিউস।

মাথা নিচু করল আলি, 'ও আসবে না সাব।'

'কী? আমি ডাকলে আসবে না? এত বড় সাহস? আমি কে তা ওকে বলো।' রাগের চোটে উঠে দাঁড়াল ম্যাথিউস। আলিটাকেই লাথি মারতে ইচ্ছে করছিল।

'বড়া সাহেব হুকুম দিয়েছেন অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে কথা না বলতে।' আলি কাতর গলায় বলল, 'হুকুম না মানলে ওকে খুন করে ফেলবেন তিনি।'

ম্যাথিউস চোখ ছোট করল। ওর মনে হল আলিকে হাত করা আগে দরকার। সে বলল, 'বুঝলাম। ঠিক আছে, কথা বলতে হবে না। কিন্তু একবার সামনে এসে দাঁড়াক, ওকে দেখি।' বলে হাসল সে, 'একা একা এখানে আছি, দেখলেও তো মন ভাল হয়ে যেতে পারে।'

আলি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, কথা বলছিল না।

ম্যাথিউস হাসল। 'ঠিক আছে। কোন ঘরে আছে ও? আমি শুধু দরজায় দাঁড়িয়ে একবার দেখব। তাতে তোমার সাহেব একটুও রাগ করবে না।'

এবার আলি বাধ্য হল দরজাটা দেখিয়ে দিতে। ম্যাথিউস চট করে সেই দরজার সামনে চলে গিয়ে পা ঠুকে পাল্লা খুলল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সুসান। দাঁড়িয়ে দেখছিল তার শরীরে ঈষৎ মেদ জমেছে। সেই কারণে শরীরটাকে আরও ভরাট লাগছে। দরজার শব্দে চমকে ফিরে তাকাল সে। এখন তার পরনে খাটো স্কার্ট আর ছোট জামা। জামাটা এত টাইট যে বুকের অনেকটাই ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে ম্যাথিউস তাকে চোখ দিয়ে চাটল। তারপর বলল, 'ডিলিসিয়াস্।' কিন্তু নড়ল না। সুসান চট করে দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। এইসময় বাইরে গাড়ির আওয়াজ হতেই ম্যাথিউস সরে গেল। ফিরে এল বেতের চেয়ারে।

বারান্দায় পা দিয়ে ম্যাথিউসকে দেখে অবাক হলেন মিস্টার হেগ, 'তুমি?'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে।' ম্যাথিউস হাসল।

'বলো।' চেয়ারে বসে মিস্টার হেগ চিৎকার করলেন, 'আলি।'

'জি সাহাব।' আলি ছুটে এল।

'তুমি হুইস্কি খাবে? আর ইউ সিয়োর? এক ছোটা হুইস্কি। নো ওয়াটার?'

আলি ছুটে গেল ভেতরে। ম্যাথিউসের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন মিস্টার হেগ। তারপর বললেন, 'শ্রমিকদের বেতন নিয়ে দু'নম্বরি আমি করতে পারব না। কোম্পানির ইন্টারেস্টে আঘাত না দিয়ে যদি তুমি রোজগার করতে পারো করো কিন্তু সেটা আমাকে জানিয়ে কোরো না। ঠিক আছে? এবার তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি। ডগলাসের বাগানের স্টাইলে তুমি খাঁচা করে তার মধ্যে অপরাধী শ্রমিকদের আটকে রাখছ। ওরা যদি ভয় পেয়ে এখান থেকে পালিয়ে যায়?'

'যাবে না। কারণ ওদের যাওয়ার জায়গা নেই।' ম্যাথিউস জোর দিয়ে বলল।

'দুটো ছেলেমেয়ে যখন পালিয়ে গিয়ে এতদিন থাকতে পারে এরা পারবে না কেন?'

'যদি কেউ পালায় তা হলে এখানে আর তার জায়গা হবে না? ম্যাথিউস বলল।

'বেশ, সেক্ষেত্রে বাগানের কাজ করাবে কাকে দিয়ে?' আলি হুইস্কি এনে দিয়ে গেল।

'আশেপাশে অনেক আদিবাসী গ্রাম আছে। তাদের অবস্থা ভাল নয়। খাবারের লোভ দেখালেই ওরা চলে আসবে কাজ করতে।' ম্যাথিউস বলল।

হাসলেন মিস্টার হেগ, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, কোম্পানি চা-শ্রমিকদের স্থানীয় জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর। এটা একটা নীতির প্রশ্ন। আজ যেভাবে ছোটনাগপুরের এই লোকদের চাবুক মেরে খাঁচায় ঢুকিয়ে তুমি কাজ করাচ্ছ স্থানীয় আদিবাসীদের ওপর তা প্রয়োগ করতে তুমি পারবে না। তা ছাড়া স্থানীয় আদিবাসীরা এদের মতো পরিশ্রমী নয়। ওরা চাষ করে কীসের জন্যে? পেটের জন্যে। যে গাছ চাষ করলে পাতা শেকড় ফুল ফল খাওয়া

যাবে না সেই গাছ সম্পর্কে ওদের আগ্রহ নেই।'

ম্যাথিউস বলল, 'আপনি তা হলে কী বলতে চাইছেন?'

'মারপিটটা এখন বন্ধ রাখো। আমাদের অন্য পথ ভাবতে হবে।'

'যেমন?'

'কুলিরা কেউ নিজের বাগান ছেড়ে অন্য বাগানে যেতে পারবে না। বাইরে থেকেও কেউ এখানে আসতে পারবে না। কুলি লাইন পাহারা দেবে আমাদের চৌকিদার। ভোরবেলায় কাজে যাওয়ার সময় একবার গুনতি হবে আবার কাজে থেকে ফেরার পর দ্বিতীয়বার গুনতি। গুনতিতে কম পড়লেই সাইরেন বাজানো হবে।' মিস্টার হেগ বললেন, 'এর ফলে ওরা ভয় পাবে। ভয় পেলে মন দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবে, ওদের খাঁচায় ভরতে হবে না।'

ম্যাথিউস মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে। আপনি যা বলছেন তাই হবে। তবে তার সঙ্গে আর একটা আদেশ জারি করুন। কুলিদের মধ্যে কেউ অবিবাহিত থাকতে পারবে না। এই হুকুম মেনে পনেরো দিনের মধ্যে সবাইকে বিয়ে করতে হবে। যে করবে না তাকে দশদিন ওই খাঁচায় আটকে থাকতে হবে। রোজ দশ ঘা চাবুক তাদের জন্যে বরাদ্দ।'

হো হো শব্দে হাসলেন হেগ, 'এতে কোম্পানির কী লাভ হবে?'

'বউ বা স্বামীকে ছেড়ে কেউ পালাতে চাইবে না। দু'জনে একসঙ্গে থাকবে, মন ভাল থাকবে ফলে কাজও বেশি করতে পারবে।'

'সব ছেলের বিয়ে করার মতো বউ যদি না জোটে?'

'আমরা তাদের জন্যে পাশের বাগানের সঙ্গে কথা বলব।'

'যদি কেউ টাকার অভাবে বিয়ে না করতে চায়?'

'আমি টাকা দেব। তার বদলে বউটাকে আমার বাংলোয় সাতদিন কাজ করতে হবে।' সোজাসুজি বলে দিল ম্যাথিউস।

মিস্টার হেগ বললেন, 'ও কে। আমি এখন লাঞ্চে যাব।' গ্লাসের তলানি গলায় ঢাললেন তিনি। তারপর ভেতরে চলে গেলেন। গোঁফের তলায় হাসল ম্যাথিউস। নতুন আইন অনুযায়ী যদি সবাইকে বিয়ে করতে হয় তা হলে মিস্টার হেগের মহিলাও তার মধ্যে পড়বে। টাকা দিয়ে কোনও অবিবাহিতকে বাধ্য করা যাবে ওকে বিয়ে করতে। তারপর—! শিস দিতে দিতে নেমে গেল ম্যাথিউস। বাগানের মাটি কোপাতে কোপাতে তার দিকে তাকাল গাঁওবুড়ো। ম্যাথিউস জানত না সুখী বিবাহিতা।

খুব দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটতে লাগল। বৃষ্টি শুরু হওয়ামাত্র জোঁকের উপদ্রব বাড়ল, সাপের কামড়, বাঘের আক্রমণ, সেইসঙ্গে আমাশা এবং ম্যালেরিয়ায় কাবু শ্রমিকদের কেউ কেউ আর জায়গাটাকে স্বপ্ন রাজ্য বলে ভাবতে পারছিল না। ম্যানেজারদের কাছে খবর পৌঁছে গেল। কয়েকটি চা-বাগানের ম্যানেজার একত্রিত হয়ে সেল তৈরি করলেন। ওয়ার্কম্যানস ব্রিচ অফ কনট্র্যাক্ট অ্যাক্ট চালু হয়েছিল উনিশশো পঁচিশে। কিন্তু তার পঁয়তাল্লিশ বছর আগেই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ায় যে সেল চালু হল তার কাজ হল পালিয়ে যেতে চাওয়া শ্রমিকদের খুঁজে বের করা। শ্রমিকদের কেউ কেউ ভাবত হেঁটেই তারা দেশে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু যেতে হলে তিস্তা নদী পেরোতে হবে। বর্ষায় উত্তাল সেই নদীতে নৌকোডুবিতে মারা গিয়েছেন অনেক সাহেব, শ্রমিকদের পক্ষে গোপনে তা পার হওয়া অসম্ভব ছিল। পাহারাদাররা কুকুর নিয়ে তাড়া করত তাদের, ধরে নিয়ে এসে লোহার খাঁচায় পুরত মারতে মারতে।

ম্যাথিউসের এখন সময় মন্দ কাটছে না। কিছু টাকা দিয়ে পছন্দের মেয়ের সঙ্গে কোনও অবিবাহিত ছেলের বিয়ে দিচ্ছে। টাকা শোধ করার উপায় না থাকায় সেই শ্রমিক তার

নববিবাহিতা স্ত্রীকে ম্যাথিউসের বাংলোয় পাঠাচ্ছে। কিন্তু সেইসব জীর্ণ চেহারার মেয়ে মোটেই খুশি করতে পারছিল না ম্যাথিউসকে। সে ওয়ার্কম্যানদের সেলের প্রধানকে চাপ দিচ্ছিল বুধনিকে খুঁজে বের করতে। আর এক দিকে তার নজর হেগসাহেবের স্ত্রীলোকটির ওপর। আলি যদি ওকে বিয়ে করতে চায় তা হলে হেগসাহেব কি বাধা দিতে পারবেন? তা হলে তো নিজেদের তৈরি কথা আইন নিজেরাই ভেঙে ফেলবেন।

কিন্তু তার আগেই এক সকালে সুসান বমি করল। তার বমির শব্দে আলি ছুটে এল। প্রথমে মনে হয়েছিল খাওয়াদাওয়ার গোলমালে হজম না হওয়ায় বমি হচ্ছে। কিন্তু তার পরেই প্রকাশিত হল সুসান সন্তান সম্ভবা।

কথাটা হেগসাহেবকে বলার সাহস পেল না আলি। কিন্তু সন্ধের মুখে আবার বমি হওয়ায় কাহিল হয়ে পড়েছিল সুসান। মদের গ্লাস হাতে হেগসাহেব যখন চিৎকার করে আলিকে ডাকলেন তখন আলি তাঁর সামনে হাজির হল।

'সুসান।' রোজ যে গলায় বলেন আজও তাই বললেন হেগসাহেব।

'ওর অসুখ করেছে।'

'অসুখ? কী অসুখ? জ্বর? ম্যালেরিয়া?' হেগসাহেব বিরক্ত হলেন।

'না সাহাব। বমি হচ্ছে।' কোনওমতে বলল আলি।

'কী খেতে দিয়েছিস যে বমি হচ্ছে? বমি বন্ধ হলে আসতে বলবি। যা।'

সাহেবকে বলতে পারেনি আলি। সাহস হয়নি। এখানে এসে এই কয়েকমাসের একটি দিনও সুসানকে নিয়ে বিব্রত হতে হয়নি। আজ সুসান তাকে বলার পর খেয়াল হয়েছিল। পুরুষ মানুষের মাথায় এসব চট করে আসে না। শোনার পর মনে হয়েছিল, সত্যি তো, কোনও মাসেই বাড়তি কাপড় চায়নি

সুসান। কৌতূহল দেখিয়েছিল আলি, 'গাঁয়ে যখন হত তখন কী করতে?'

'দিনের বেলায় ঘর থেকে বের হতাম না।' সুসান মুখ ঢেকেছিল।

কিন্তু ধরা পড়ে গেল সুসান। পেট বড় হয়েছে। নেশা থাকায় হাত বুলিয়ে সেটা টের পেয়ে হেগসাহেব চিৎকার করলেন, 'তোর পেটে বাচ্চা এসেছে?'

মাথা নিচু করেছিল সুসান। যেন সে বিরাট অপরাধ করে ফেলেছে।

'কার বাচ্চা?' জিজ্ঞাসা করেই ছিটকে সরে গেল হেগসাহেব। এই কয়েক মাসে কোনও পুরুষ সুসানের কাছে পৌঁছাতে পারেনি এ কথা যেমন সত্যি তেমনি এখানে আসার আগেই তো অন্য পুরুষ ওকে সন্তান পেতে সাহায্য করতে পারে। ওই টেকোমাথা দালালটা এত রাস্তা একটা কুপেতে ওর সঙ্গে ছিল। সে কি ছেড়ে দিয়েছিল? আসার আগে স্বামীর সঙ্গে শুয়ে থাকলে তারও হতে পারে। বাচ্চাটা কার সে ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে এখন ওকে নিয়ে কী করা যায় তাই ভাবতে হবে। এই বাংলোতে সুসান প্রসব করলে তাঁর দুর্নাম হবে। অন্য বাগানের ম্যানেজাররা হাসবে, তাদের বউরা আড়ালে ছি ছি করবে। খবরটা চলে যাবে কলকাতায়। ব্যাপারটা ভাবাই যাচ্ছে না। তা ছাড়া যতদিন যাবে তত সুসান অকেজো হয়ে যাবে। ওর কাছ থেকে এক ফোঁটা সুখ পাবে না বাচ্চা হওয়ার পর এক মাস পর্যন্ত।

হেগসাহেব হাঁকলেন, 'আলি!'

আলি দরজা ফাঁক করল, 'জি সাহাব।'

'ইধার আও।'

আলি ঢুকল। সুসান তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ, দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে।

'ওর পেটের বাচ্চার বাবা কে?'

'আমি জানি না সাহাব।'

'উল্লুকের বাচ্চা। ওর যখন স্বামী আছে তখন সে-ই তো বাবা হবে। তাই না?'

'জি সাহাব।'

'আজ থেকে ও ওর স্বামীর সঙ্গে থাকবে।' হুকুম দিলেন হেগসাহেব।

'নীচে?'

'সেটাও সমস্যা।'

'সাহাব!'

'কী?'

'ছোট সাহেবের বাংলোয় যদি ও যায়?'

'কেন?'

'ছোট সাহেব তো প্রায়ই লোক রাখেন।'

'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দে। বলবি ওর অসুবিধে হচ্ছে শুনে আমি পাঠালাম।'

'জি সাহাব।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সুসান। আকুতিমিনতি করতে লাগল ছোটসাহেবের কাছে না পাঠাতে। লোকটার নজর খুব খারাপ। একদিন চোখ দিয়ে গিলতে চেয়েছিল। ওর কাছে গেলে পেটের বাচ্চাটা মরে যাবে।

চোখ ছোট হল হেগসাহেবের। আলির কাছে ঘটনাটা জানতে চাইলেন। হেগসাহেবের অনুপস্থিতিতে ম্যাথিউস এসে যা যা বলেছিল তা আজ বলতে বাধ্য হল আলি।

'এতদিন বলিসনি কেন? ঘুরে দাঁড়া।'

গুনে গুনে চারবার আলির পিঠে বেত মারলেন হেগসাহেব। তারপর বললেন, 'থাক, ওকে ছোট সাহেবের বাংলোয় পাঠাবার দরকার নেই।'

দিন পনেরো পরে মিস্টার ক্লার্ক তাঁর রুটিন ভিজিটে এলেন। বিশাল নার্সারিতে তখন চায়ের চারা চাগাড় দিয়েছে। তাদের ওপর ছায়া ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে। পাখি যাতে নষ্ট না করে তার জন্য পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘুরে ফিরে দেখে মিস্টার ক্লার্ক খুশি। এবার চায়ের চারাগাছগুলো নার্সারি থেকে তুলে ঠিকঠাক জায়গায় পুঁততে হবে। ইতিমধ্যে সেখানে শেড ট্রি-র পাতা বাতাসে নড়ছে।

ম্যাথিউসকে আড়ালে ডেকে হেগসাহেব বললেন, 'তুমি একবার আমার বাংলোয় যাও। আলিকে হুকুম দেবে লাঞ্চ যেন খুব ভাল হয়। আর আমার ওখানে সুসান বলে একটা মেয়ে আছে সে যেন সার্ভ করে। কী করে সার্ভ করতে হয় শিখিয়ে দিয়ো প্লিজ।'

ম্যাথিউস খুশি হয়ে রাজি হল।

ম্যাথিউস চলে যাওয়ার মিনিট কুড়ির মধ্যে মিস্টার ক্লার্ককে সঙ্গে নিয়ে লাঞ্চের জন্যে বাংলোয় পৌঁছে দেখলেন কর্মচারীরা সবাই নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আলি সিঁড়ির ওপর। আর ওপর থেকে সুসানের আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে।

অবাক হয়ে মিস্টার ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে? কীসের চিৎকার?'

উত্তর না দিয়ে দৌড়ে ওপরে উঠলেন মিস্টার হেগ, পেছনে মিস্টার ক্লার্ক। সুসানের ঘরের দরজা খোলা। তাকে উলঙ্গ করে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করছে ম্যাথিউস। তার পরনে প্যান্ট নেই।

'ম্যাথিউস! চিৎকার করলেন হেগ।'

ম্যাথিউস ওদের দেখতে পেয়ে সুসানকে ছেড়ে দিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

'দেখলেন মিস্টার ক্লার্ক!' ঘুরে দাঁড়ালেন মিস্টার হেগ।

সুসান তখন বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে।

মিস্টার ক্লার্ক ডাকলেন, 'ম্যাথিউস।'

কিছুই হয়নি এমন মুখ করে প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে ম্যাথিউস বেরিয়ে এল, 'সরি স্যার। হঠাৎ হয়ে গেল।'

বারান্দার বেতের চেয়ারে ম্যাথিউসকে নিয়ে ওঁরা বসলেন। মিস্টার ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটি কে?'

'আমার বাংলোয় কাজ করে।' হেগসাহেব বললেন।

'তোমাকে ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে হবে ম্যাথিউস।' মিস্টার ক্লার্ক বললেন।

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি!' ম্যাথিউস চোখ বড় করল।

'না। হয়নি। যা দেখলাম তাতে বিয়ে করলে তোমার সুবিধে হবে।'

'আমাকে একবার ওরকম করার জন্যে যদি বিয়ে করতে হয় তা হলে মিস্টার হেগকে তো একশোবার বিয়ে করতে হবে ওকে। প্রত্যেক রাত্রে ওর সঙ্গে না ঘুমালে ঘুম আসে না ওঁর, তাই না মিস্টার হেগ!' গোঁফের তলায় হাসল ম্যাথিউস।

'ম্যাথিউস, তুমি একজন বিবাহিতা মহিলার নামে দুর্নাম দিচ্ছ।'

'কে বিবাহিতা? কোথায় ওর স্বামী?' ম্যাথিউস চেঁচাল।

'আলি!' হাঁক দিলেন হেগসাহেব।

'জি সাহাব।'

'সুসানের আগের নাম কি ছিল।'

'সুখী।'

'সুখীর স্বামী আছে?'

'জি সাহাব।'

'ওকে এখানে নিয়ে আয়।'

'জি সাহাব।'

দু'মিনিটের মধ্যেই গাঁওবুড়োকে হাজির করল আলি। লোকটা দুটো হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল মেঝেতে।

মিস্টার ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বউ কোথায়?'

'এখানে?'

'সুখী তোমার বউ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল গাঁওবুড়ো।

'তুমি কোথায় থাকো?'

'নীচে।'

'দিনের বেলায় মেয়েটা ওপরে আসে কাজ করতে, রাত্রে স্বামীর কাছে চলে যায়।' গম্ভীর গলায় বললেন হেগসাহেব।

'নিয়ে যাও ওকে।' মিস্টার ক্লার্ক বললেন।

গাঁওবুড়োকে নিয়ে গেল আলি।

মিস্টার ক্লার্ক বললেন, 'ম্যাথিউস, টিল ফারদার অর্ডার তুমি মিস্টার ডগলাসের বাগানে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার হয়ে কাজ করবে। ওঁর অ্যাসিস্টেন্ট জন এখানে আসবে। তোমার যা আছে তা এখনই গুছিয়ে নাও। আজ বিকেলেই ওখানে জয়েন করবে।'

'আপনি আমাকে লিখিত অর্ডার দেবেন?'

'নিশ্চয়ই। যাওয়ার আগে ওটা পেয়ে যাবে।'

ম্যাথিউস উঠে দাঁড়াল। তারপর জুতোয় শব্দ তুলে নেমে গেল বাংলো থেকে।

মিস্টার হেগ বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার ক্লার্ক। চলুন লাঞ্চে বসা যাক।'

ম্যাথিউসকে তাড়িয়ে খুশি হলেন হেগসাহেব। এর জন্যে সুসানকে ব্যবহার করেছেন তিনি। যে কারণে সুসানের ওপর বেশি নির্দয় হলেন না। ঠিক করলেন বাচ্চাটা পৃথিবীতে আসার মাসখানেক আগে ওকে নীচে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এমন তো হতেই পারে সুসানের বাচ্চা আর পাঁচটা ওঁরাও শিশুর মতোই জন্মাবে। কিন্তু আর একটা দারুণ মেয়ে-শরীর না পাওয়া পর্যন্ত ওকে দোতলা থেকে নামিয়ে দেওয়া মানে চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া। এই ভরা-পেটেও মেয়েটা তাকে আনন্দিত করার ক্ষমতা রাখে। তা

ছাড়া যা হওয়ার তা হয়েই গিয়েছে। এখনকার আনন্দের জন্যে তো সুসানের পেটে আর একটা বাচ্চা আসবে না।

তাকে নীচে যেতে হল না, আগের মতন যত্নে থাকল, রোজ রাত্রে সাহেবের ঘরে গিয়ে কাপড় খুলতে হচ্ছে, আগে যেমন হত, সুসানের আতঙ্ক দূর হল। আলি মাঝে মাঝে গল্প করতে আসত লাইন থেকে একটা লোক পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। নতুন ছোট সাহাব জন তার দুটো কান কেটে খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে। খুব রক্ত বেরিয়েছে লোকটার কাটা কান থেকে। প্রত্যেককে লাইন করে সেটা দেখিয়েছে জন সাহাব। দু'দিনে হেগসাহেবের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছে সুসান। তাড়াতাড়ি ডাবল ডাবল হুইস্কি খাচ্ছে সন্ধে থেকেই। তার শরীর নিয়ে কিছু করার আগেই বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে। আর যেদিন হুঁশ না হারাচ্ছে, সেদিন আনন্দ করার সময় বোঝাই যায়, সতর্ক থাকছে যাতে সুসানের ওপর বেশি চাপ না পড়ে। পেটের ভেতর যেটা নড়াচড়া করছে সে ওইসময় একেবারে শান্ত হয়ে থাকে। হয়তো বুঝতে পারে ওইসময় অশান্ত হলে সাহেবকে বিরক্ত করা হবে। কিন্তু আজকাল রাত এগারটার মধ্যেই ছুটি পেয়ে যায় সুসান। ঘুমন্ত হেগসাহেব পড়ে থাকেন একা।

ঘন জঙ্গল, পেছনে পাহাড়, সেই পাহাড় থেকে সারাবছর কম-বেশি নেমে যাওয়া ঝরনার পাশে একটা গুহা থেকে চিৎকার ভেসে আসছিল। মেয়েরা এই চিৎকার তখনই করতে বাধ্য হয় যখন যন্ত্রণা সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়। পাশে বসেও যখন সোমরা কোনও সাহায্যে আসতে পারছিল না তখন বাইরে বেরিয়ে এল। গুহার মুখে একটা বিশাল পাথরের আড়াল। এক চিলতে ফাঁক দিয়ে শরীর ঘষটে বেরুতে-ঢুকতে হয়। কোনও হিংস্র প্রাণীর পক্ষে সেটা সম্ভব নয় বলে রাতগুলো নিরাপদে কাটে। সোমরার ভয় করছিল খুব, মনে হচ্ছিল বুধনি মারা যাবে।

খুব কাছেই একটা পাহাড়ি গ্রাম আছে। ওই গ্রামের প্রধান একজন বৃদ্ধা। ওরা সাহায্য না করলে জঙ্গলে লুকিয়ে বাঁচা অসম্ভব ছিল। ওরা যখন পাহাড়ের মাটিতে চাষ করেছে তখন সোমরা এবং বুধনি ওদের সাহায্য করেছে। ভাষা বাধা তৈরি করলেও ওরা বুঝতে পেরেছে কোনও বিশেষ কারণে পালিয়ে জঙ্গলে এসে তারা বাঁচতে চাইছে। কেউ বাঁচতে চাইলে তাকে সাহায্য করা উচিত বলে ওদের মনে হয়েছে। ফলে জঙ্গলে যখন ফল শেষ হয়ে গেল তখন ওরা মকাই দিয়েছে দু'বেলা খাওয়ার জন্যে। পারিশ্রমিক না নিয়ে চাষে সাহায্য করার প্রতিদান হিসেবেই হয়তো দিয়েছে।

সোমরার মনে হল ওদের গ্রামে গিয়ে সাহায্যের আবেদন জানাবে। কিন্তু বুধনিকে একা রেখে যেতেও সাহস হচ্ছিল না। হঠাৎ বুধনির চিৎকার থেমে গেল। তবে কি—! দৌড়ে গুহার মুখে পৌঁছে শরীর ঘষটে ভেতরে ঢুকল সোমরা। গুহার মধ্যে দিনের বেলায় ছায়া ছায়া আলো থাকে। সেই আলোয় দৃশ্যটি দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। বুধনির শরীর থেকে বাচ্চাটা বেরিয়ে এসেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। বুধনি দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। এইসময় বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। অদ্ভুত গলায় গোঙাল, ওঁয়া ওঁয়া। হাঁফ ছাড়ল সোমরা। বাচ্চাটা ছেলে।

কিন্তু সেদিকে নজর ছিল না সোমরার। বুধনির মাথার কাছে বসে ও নাম ধরে ডাকতে লাগল। তারপর আঙুল ঢুকিয়ে দাঁতের শক্ত জোড়টাকে খুলল। এবার বুধনি চোখ মেলল। প্রথমে শূন্য চাহনি কিন্তু যেই বাচ্চার কান্না কানে গেল পড়ি কি মরি করে উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে বাচ্চাকে তুলল সে। তখন নাড়ির বন্ধন রয়ে গেছে। বুধনি ফিসফিস করে বলল, 'বাঁ দিকের খাঁজে একটা বাঁশ চিরে রেখেছি, নিয়ে এসো!' শিশুর লিঙ্গ দেখে নিয়েছে সে, দেখে মুখে হাসি ফুটেছে।

একটা তীক্ষ্ণ বাঁশের কঞ্চি কবে কখন সংগ্রহ করে রেখেছিল

বুধনি তা সোমরার জানা ছিল না। তার সাহায্যে খুব সহজেই নাড়ি কাটা গেল। ঠিক সেইসময় বাইরে মানুষের গলা পাওয়া গেল। বুধনির চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ, সোমরা দৌড়ে পাথরের ফাঁকে চোখ রাখতেই বৃদ্ধা গ্রামপ্রধানকে দেখতে পেল। তিনি আরও দু'জন মহিলাকে নিয়ে খোঁজ নিতে এসেছেন। সোমরার ইশারায় ভেতরে ঢুকে আনন্দে হেঁ হেঁ করতে লাগলেন। নবজাতক এবং তার মাকে নিয়ে সোমরার আর দুশ্চিন্তা রইল না।

এই নয়-দশ মাস কখন কীভাবে কেটে গেছে, পৃথিবীতে তার মতো দেখতে একটা শিশু এর মধ্যে চলে এল। মাঝে মাঝেই মনে পড়ে যায় গাঁয়ের কথা, লাইনঘরের কথা। মাংরা দুখনরা নিশ্চয়ই ভেবেছে তারা মরে গেছে। সাহেবরা খুঁজে বের করার কি চেষ্টা করেনি? যতক্ষণ দিনের আলো পাওয়া যেত ততক্ষণ তারা পালাত। গভীর থেকে গভীর জঙ্গলে। লাঠি তার হাতে, বুধনির হাতে কাটারি। কোথায় যাচ্ছে জানে না। যেতে যেতে হঠাৎ বহুদূরে পাহাড় দেখতে পেল। এতবড় পাহাড় তারা কোনওদিন দেখেনি। রাত নামলে গাছে উঠে যেত। সে সময় জঙ্গলে প্রচুর ফল। পেট ভরানোর অসুবিধে ছিল না। এই পাহাড়ের কাছে এসে দু'জনেই জ্বরে পড়ল। শরীর আগুন হয়ে গেল, চোখ ঝাপসা। পরস্পরে জড়িয়ে ধরে একটা গাছের নীচে পড়েছিল তারা। যখন জ্ঞান ফিরল তখন মানুষের গলা কানে এসেছিল। ধরা পড়ে গেছে ভেবে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল সোমরা। তারপর যখন দৃষ্টি স্বচ্ছ হল তখন বুধনিকে দেখতে পেল। বুধনির পাশে পাহাড়ি নারী-পুরুষ। বুধনি সুস্থ হয়েছিল তার আগেই। বুঝতে পারল মানুষগুলো তাদের বিপদে ফেলবে না।

কিন্তু পাহাড়িদের গ্রামে বাইরের লোক আসে। চেহারা দেখেই তারা বুঝে যাবে ওরা বাইরের থেকে এসেছে। খবরটা ছড়িয়ে যাবে। হয়তো পৌঁছে যাবে সাহেবের কাছে। তাই সুস্থ

হয়ে জায়গা খুঁজে খুঁজে চলে এসেছিল এই পাহাড়ের গুহায়। এই জঙ্গলে খরগোশ, শুয়োর আছে প্রচুর। ঝরনায় মাছ আছে অঢেল। আগুনে পুড়িয়ে বা সেদ্ধ করে চমৎকার পেট ভরে যায়। পৃথিবীর অন্য মানুষদের অভাব বুঝতে দেয়নি বুধনি। একটি মেয়ে যাবতীয় মায়া-মমতা-ভালবাসা এবং শরীর দিয়ে তাকে ভরিয়ে রেখেছে এমন করে যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল স্বপ্নের মতো। তবে বুধনির একটি সিদ্ধান্তে ভীত হয়ে পড়েছিল সোমরা। মাসখানেক আগে বুধনি বলেছিল, 'আমার যদি ছেলে হয় তা হলে খুশি হব। কিন্তু মেয়ে হলে তাকে বাঁচতে দেব না।'

'সেকী, কেন? চমকে উঠেছিল সোমরা।

'মেয়ে হওয়া মানে পুরুষগুলোর শিকার হওয়া। আমাদের জাতের মেয়েদের যৌবন থাকলে যে-কোনও পুরুষ তাকে ভোগ করতে চায়। আমাকে ছোট সাহেবের সেবা করতে বলা হয়েছিল কারণ তিনি আমাকে ভোগ করবেন। সুখীকে রেলগাড়িতে যে টেকো লোকটা আলাদা নিয়ে এসেছে সে কি ভোগ করেনি? তারপর সুখীকে নিয়ে গেল বড় সাহেব, ভোগ করতে। কেউ বাধা দিতে পেরেছে? সাহেব কেন, একটা চৌকিদার যদি ইচ্ছে করে তা. হলে আমাদের যে-কোনও মেয়েকে ভোগ করতে পারে। জঙ্গল কাটার সময় একটা চৌকিদার আমার বুকে হাত দিয়েছিল। আমি চিৎকার করেছিলাম আর সে আমার বুক থেকে রক্ত বের করতে চাইছিল। শেষে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে হ্যা হ্যা করে হেসেছিল। আমাদের সবাই দেখেছিল ঘটনাটা কিন্তু ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করেনি। আমার মেয়ে হলে তাকেও তো এসব সহ্য করতে হবে। যাকে একটু একটু করে বড় করব তাকে একের পর এক পুরুষ ভোগ করবে। আমি তা হতে দেব না।' একনাগাড়ে বলে গিয়েছিল বুধনি। সেটা একদিন নয়, রোজ। তারপর গতকাল সে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে ওর আসার সময় হয়ে গিয়েছে। গাঁওবুড়ি তাই বলে গেল। শোনো, তুমি আমাকে

ভালবাসো, তাই তো?'

'হ্যাঁ।' সোমরা বলল।

'তা হলে মেয়ে যদি হয় আমি দেখার আগে সরিয়ে নেবে। তারপর বাইরের মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দেবে। কথা দাও।'

এমন পাগলামি করছিল বুধনি যে কথা দিতে হয়েছিল। আর তারপর থেকে গাঁয়ের বাবা আর যিশুবাবাকে বারংবার ডেকে যাচ্ছিল সে মনে মনে। এই গুহার সামনে দুটো সাধুগাছ আছে। দেখলেই মনে হয় সাধুর মতো পবিত্র গাছ। সেই গাছ দুটোর কাছে গিয়ে সোমরা যিশুবাবা আর দেশের বাবার কাছে প্রার্থনা করে গেছে, যেন মেয়ে না হয়।

প্রার্থনা করলেই কি ওঁরা দয়া করেন। হয়তো। তা না হলে মেয়ে না হয়ে ছেলে হল কী করে? ছেলেটাকে ভাল করে দেখার ইচ্ছে চেপে রাখতে হচ্ছিল তাকে। পাহাড়ি বুড়ি তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে গুহার ভেতর চেঁচামেচি করে কিছু বলছেন। কান পাতল সে। এবার বুঝল ওরা গান গাইছে। গান শেষ হলে বেরিয়ে এল দল বেঁধে। যাওয়ার সময় বলে গেল মা আর শিশুর জন্যে যা যা দরকার তা ওরা এখনই পাঠিয়ে দেবে।

গুহার ভেতর ঢুকল সোমরা। তাকে দেখে কী সুন্দর হাসল বুধনি। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে আছে সে। পাশে গিয়ে বসল সোমরা। চোখ বন্ধ শিশুর, দুটো হাত মুষ্ঠিবদ্ধ, নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। সোমরা জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কী করবি?'

'একে বড় করব। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখাব।' জোর দিয়ে বলল বুধনি।

'এই জঙ্গলে কতদিন থাকবি?'

'যতদিন ও বড় না হয়, যতদিন না আমি বুড়ি হই।' বুধনি শ্বাস ফেলল।

হেগসাহেব গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন। এখন চোখের সামনে নবীন চায়ের গাছ বাতাসে নড়ছে। আর একটু গোড়া

শক্ত হলে, আরও চাপ বাঁধলে বাতাস নাড়াতে পারবে না। অন্তত আড়াই থেকে তিন বছরের আগে পাতা তোলা যাবে না। হেড অফিস থেকে খবর এসেছে ফ্যাক্টরি তৈরির জন্যে ইঞ্জিনিয়ার লোকজন নিয়ে এসে পড়বেন এই সপ্তাহে। ফ্যাক্টরি তৈরি, সেটা চালু করা, কিছু লোককে ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে যে সময় দরকার তার পরেই এই গাছগুলোর পাতা চায়ের জন্যে উপযুক্ত হবে।

গতকাল দেশ থেকে উকিলের নোটিশ এসেছে। মিসেস হেগ ডিভোর্সের আবেদন করেছেন। এ ব্যাপারে মিস্টার হেগের বক্তব্য জানতে চাওয়া হয়েছে। এখন অফিসে ফিরে বাবুকে বলবেন চিঠিটার খসড়া করতে, যার মূল বক্তব্য হবে তাঁর আপত্তি নেই। এভাবে থাকার চেয়ে স্বাধীন হয়ে যাক ও। শেডট্রি থেকে একটা ডাল ভেঙে পড়েছিল কচি চা-চারার ওপর। পরম মমতায় সেটাকে সরিয়ে দিলেন হেগসাহেব। এখন ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে বিচলিত হওয়ার সময় নয়। এই চা-বাগান বাড়াতে হবে। এখনও অনেক গাছ পরিষ্কার করে জমি তৈরি করাতে হবে। যতক্ষণ না আদিগন্ত চা-গাছের পূর্ণ চেহারা দেখতে পাচ্ছেন ততদিন তাঁর বিশ্রাম নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

অফিসে ফিরে এসে বাবুকে ডেকে নিজের বক্তব্য বলে চিঠির খসড়া করতে বললেন তিনি। আগামী সপ্তাহে কোম্পানির বড় অফিসার আসবেন। সব চা-বাগানের ম্যানেজারদের নিয়ে মিটিং করবেন। কার কী রকম স্টাফ চাই, টাকার কতটা প্রয়োজন, এইসব। জনকে ডেকে একটা প্রপোজাল তৈরি করতে বললেন হেগসাহেব।

এই সময় নিজের অফিসের জানলা দিয়ে আলিকে দেখতে পেলেন তিনি। গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে, কাছে এসে বলতে ভয় পাচ্ছে। ওকে ঘরে না ডেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি, 'আলি!'

'জি সাহাব।'

'কী হয়েছে?'

'সুসানের খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। ছটফট করছে।'

বুঝে গেলেন তিনি। গত রাত্রেও আলি সুসানকে নিয়ে এসেছিল তার ঘরে। কিন্তু ওরকম বীভৎস বড় পেট দেখে তৎক্ষণাৎ ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বললেন, 'ওকে নীচে নামাও। ওর স্বামীর ঘরে পাঠাও। তাকে আজ কাজ করতে হবে না। আর খোঁজ নিয়ে দ্যাখো কামিনদের মধ্যে কেউ এসব কাজ জানে কিনা। জানলে তাকে কাজে লাগাও। যাও।' ফিরে গেলেন হেগসাহেব নিজের ঘরে।

গেলেন কিন্তু কাজ করতে পারলেন না। বাচ্চাটা কী রকম দেখতে হবে? যদি তাঁর মতন হয়? সুসানকে অনেক জেরা করেছেন তিনি কিন্তু কিছুতেই বলাতে পারেননি যে স্বামীর সঙ্গে এখানে আসার আগে হয়েছে। বরং ওই টেকো দালালটা নাকি কিছু খেতে দিয়েছিল ট্রেনে যা খেয়ে জ্ঞান চলে গিয়েছিল সুসানের। তখন কিছু হয়েছিল কিনা তা তার জানা নেই। হেগসাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস, হয়েছিল। ওই টেকোটা নিশ্চয়ই ছেড়ে দেয়নি। তা হলে বাচ্চাটা টেকোর মতো দেখতে হতে পারে। অবশ্য কোনও বাচ্চা মায়ের পেট থেকে টাক নিয়ে পৃথিবীতে আসে না।

হঠাৎ হেগসাহেবের খেয়াল হল। তাঁর বিবাহিত জীবন শেষ। ব্রিটিশ মেয়েরা অবিবাহিতা অবস্থায় কলকাতায় পৌঁছেই ভাল পাত্র জোগাড় করে ফেলে। এই ডুয়ার্স পর্যন্ত এসে পৌঁছায় তারাই যাদের কোনও পাত্র জোটে না। তাও তাদের নজর যাবে জন কিংবা ম্যাথিউসের দিকে। ইউরোপিয়ান ক্লাবে সাদা চামড়ার কুৎসিত মেয়েগুলোর সঙ্গে নাচবে জনরাই। চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়া মিস্টার হেগ তো তাঁদের চোখে আঙ্কেল। অতএব সাদা চামড়ার বউ জোগাড় করে বাবা হওয়া তাঁর পক্ষে এ জীবনে সম্ভব নয়। সুসানের সন্তান, তা ছেলে

কিংবা মেয়ে যাই হোক না কেন, যদি একেবারে তাঁর মতো দেখতে হয়, তাঁরই সন্তান হয়, তা হলে? কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলন না হেগসাহেব।

দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সামলাচ্ছিল সুসান। আলি ঘরে ঢুকে বলল, 'চলো।'

'কোথায়?' অসহায় চোখে তাকাল সুসান।

'তোমার নিজের জায়গায়।'

'আমি হাঁটতে পারব না।' কেঁদে ফেলল সুসান।

'পারতে হবে।' দু'হাতে ওকে দাঁড় করাল আলি। দেখে মনে হচ্ছিল যে-কোনও মুহূর্তে বাচ্চাটা বেরিয়ে আসবে। কোনও রকমে নীচে নামিয়ে গাঁওবুড়ো যে ঘরে থাকে সেখানে পৌঁছে চিৎকার করল, 'এই বুড়ো, বুড়ো!'

বাগানে কাজ করছিল গাঁওবুড়ো। অবাক হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

আলি বলল, 'তাড়াতাড়ি দরজা খোলো।'

গাঁওবুড়ো আদেশ পালন করলে সুসানকে গাঁওবুড়োর চাদরের ওপর শুইয়ে দিয়ে আলি বলল, 'আজ তোমাকে কাজ করতে হবে না। এখানে থাকো। আমি আসছি।' আলি ছুটল এমন কোনও মেয়ের সন্ধানে যে ধাইয়ের কাজ করতে পারবে।

ঘরে কেউ নেই ওরা ছাড়া। সুসান চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে উঠল। যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। গাঁওবুড়ো ডাকল, 'সুখী!'

সুখী তাকাল। এক মুহূর্ত। তার পরেই চিৎকার করে উঠল।

'সুখী, তোর খুব ইচ্ছে ছিল মা হওয়ার, তুই এখন মা হবি রে।'

সুখী দু'দিকে মাথা নাড়তে লাগল প্রাণপণে। তারপর বলল, 'আমি সুখী না, সুসান। আমার নাম সুসান।'

'না। তুই আমার বউ, সুখী।' গাঁওবুড়ো উবু হয়ে বসল।

'তুমি কী? মানুষ? তোমার কি—।'

গাঁওবুড়ো এগিয়ে গেল। সুখীর মাথার পাশে বসে কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল, 'তুই মা হচ্ছিস এতে আমি খুব খুশি সুখী। খুব।'

আলি যখন এক মধ্যবয়স্কাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তখন শিশু মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে সক্রিয়। গাঁওবুড়োকে সরিয়ে আনল আলি। রান্নাঘর থেকে গরম জল আর তোয়ালে এনে স্ত্রীলোকটিকে দিতেই শিশুকে দেখা গেল। দেখামাত্র স্ত্রীলোকটি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল। আলি হতভম্ব হয়ে দেখল ধবধবে সাদা শিশুটি কেঁদে উঠেছে। প্রথম কান্না। হেগ, ম্যাথিউস বা জনের চামড়ার সঙ্গে ওর চামড়া মিলে যাচ্ছে। শুধু একমাথা কোঁকড়ানো চুল কিন্তু তার রংও কালো নয়।

সেই সময় মধ্যবয়স্কা চিৎকার করে ডাকছিল, 'সুখী, এ সুখী! সুখী রে।'

আলি অসাড় হয়ে দেখল সুখী কোনও সাড়া দিচ্ছে না। তার মাথা এক পাশে হেলে গেছে, মধ্যবয়স্কা বলে উঠল, 'সুখী মর গিয়া।'

আলি বলল, 'অ্যাই চুপ। একদম চুপ।'

তারপর নিজে যাচাই করল। সুখীর হাতের শিরায় কোনও দাপাদাপি নেই। চোখ টেনে দেখল, বুকে কান পাতল। না, সুখী নেই।

সে হুকুম করল, 'ওটাকে পরিষ্কার কর।'

মধ্যবয়স্কা নাড়ি কাটল। ধারালো বাঁশের কঞ্চি সে সঙ্গেই এনেছিল। বাচ্চাটাকে তোয়ালেতে জড়িয়ে বলল, 'এখন কী হবে?'

'যাই হোক, সুখী মারা গিয়েছে এটা লোকে জানবে কিন্তু বাচ্চার কথা কেউ যেন না জানে। যদি কাউকে বলিস তা হলে সাহেব তোর জিভ ছিঁড়ে ফেলবে।'

'লোকে জিজ্ঞাসা করলে কী বলব?'

'বলবি, সুখী আর তার বাচ্চা, দু'জনেই মরে গেছে। চুপ করে বসে থাক এখানে।'

আলি বাইরে বেরিয়ে এল। গাঁওবুড়ো তো বটেই অন্যান্য কর্মচারীরা কৌতূহল নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আলি ধমকাল, 'এখানে কী চাই অ্যাঁ? সাহেব দেখলে কী হবে তা জানা নেই? গাঁওবুড়ো, খারাপ খবর আছে।'

গাঁওবুড়ো একটু দেখল, তারপর মাটিতে বসে পড়ল।

মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকটি শিশুটির দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিল। বড় সাহেব যেন আচমকা শিশু হয়ে সুখীর শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে। এমনকী ওর চোখের মণির যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাও নীল। কী হবে এখন? তাদের গাঁয়ের নিয়ম ছিল শিশুকে প্রথম দিন শুধু একটু একটু জল খাওয়ানো হয়। কিন্তু কাল থেকে এ বাচ্চা মায়ের বুকের দুধ কোথায় পাবে? একে কি সাহেব এখানে রাখবে? কিছুই বুঝতে পারছিল না সে।

হেগসাহেব যখন বাংলোয় ফিরলেন তখন আলি দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির পাশে।

'কী ব্যাপার?'

আলি মাথা নিচু করল। কিছু অনুমান করে হেগসাহেব ওপরে উঠে গিয়ে ডাকলেন 'আলি, ইধার আও।'

আলি ওপরে উঠলে বললেন, 'হুইস্কি।'

আলি হুইস্কি ঢেলে গ্লাস এগিয়ে দিলে একটা চুমুক দিলেন, 'বল।'

'সুখী, সুসান মরে গেল সাহাব।' কেঁদে ফেলল আলি।'

হতভম্ব হয়ে গেলেন হেগসাহেব, 'মরে গেল।' আলির মূর্তি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল বাচ্চাটার কিছু হয়েছে, 'কী বলছিস? মরে গেছে?'

'জি সাহাব।'

'ঠিক বলছিস?' সোজা হয়ে বসলেন হেগসাহেব।

'বাচ্চা, বাচ্চা বেরিয়েছে?'

'জি সাহাব।'

'ছেলে না মেয়ে?'

'ছেলে।'

'ওঃ।' বাকি হুইস্কি একবারে শেষ করলেন হেগসাহেব, 'কোথায়?'

'লাইনের একটা বউকে এনেছিলাম, সে কোলে করে বসে আছে।'

'তাকেই বল বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে। সুখীকে কবর দিয়ে দে পেছনের জঙ্গলে। মেমসাহেবের সব জামাকাপড় ওর সঙ্গে দিবি। যা!'

'সাহাব, আপনার লাঞ্চে—!'

'যা বলছি তাই কর!' হেগসাহেব নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

জঙ্গলে মাটি খোঁড়া হল। বড় বড় কাঠের বাকস ভেঙে কফিন তৈরি করা হল। তার ভেতরে সুখীকে শুইয়ে নামিয়ে দেওয়া হল নীচে। আলি মাটি ফেলল। গাঁওবুড়ো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। আলি তাকে মাটি ফেলতে বললে সেও মাটি ফেলল।

মধ্যবয়স্কা মহিলার কোলে তোয়ালে-ঢাকা বাচ্চা। বেরুতে বেরুতে সূর্য ঢলে গেছে। কর্মচারীরা দৃশ্যটা দেখল কিন্তু কিছুই বলল না। গাঁওবুড়োও না।

নির্জন গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর আলি বলল, 'ওকে যত্নে রাখবি।'

'মানে?'

'তুই ওকে মানুষ করবি।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়তে লাগল মধ্যবয়স্কা, 'সবাই জানতে চাইবে এ কে? সুখীকে বাচ্চা হওয়াতে আমি এসেছি তা অনেকেই জেনেছে। সবাই জিজ্ঞাসা করবে এ সুখীর বাচ্চা কিনা! কী বলব?'

চিন্তায় পড়ল আলি। সাহেবকে বলা হয়নি বাচ্চা কী রকম দেখতে হয়েছে। তাই সাহেব বলেছে লাইনে নিয়ে যেতে।

মধ্যবয়স্কার কথাটা ঠিক। বাচ্চার পরিচয় গোপন করা যাবে না। সে বলল, 'ওরা যা খুশি ভাবুক তুই নিয়ে যা।'

'না না।'

'কেন?'

'এটা সাহেববাচ্চা। আমাদের সঙ্গে ওর মিল হবে না। নিয়ে গেলে সবাই ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে।' মধ্যবয়স্কা বলল।

'কেন? খারাপ ব্যবহার করবে কেন?'

মধ্যবয়স্কা বেপরোয়া হল, 'সাহেবদের কেউ পছন্দ করে না তা তুমি জানো না!'

'মালিক সবসময় মালিক। পছন্দ না হলেও মানতে হবে।'

'ও যখন একটু বড় হবে তখন ঠিক সাহেবের মতো ব্যবহার করবে। তুমি আমাকে বাঁচাও।' মধ্যবয়স্কা কেঁদে ফেলল। হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে আলি কোলে নিতেই সে যেভাবে দৌড়াল তাতে মনে হল পালিয়ে যেতে পেরে বেঁচে গেল।

শিশু কেঁদে উঠল। সেই নির্জনে দাঁড়িয়ে ওর কান্না থামানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল আলি। একটু জল দেওয়া দরকার ওর মুখে। সুসানের গাঁয়ের মানুষরা একে মেনে নেবে না। খারাপ ব্যবহার করবে? এখন একে নিয়ে সে কী করবে?

বাংলোয় ফিরে এসে শিশুর মুখে জল দিল আলি। এখন আর অন্য কর্মচারীদের আটকানো গেল না। ভিড় করে এল তারা শিশুটিকে দেখতে। একজন কপালে হাত ছোঁয়াল, 'এও বড় হয়ে আমাদের সাহেব হয়ে যাবে!'

আলি মরীয়া হয়ে বারান্দায় উঠল। হেগসাহেবের দরজার সামনে গিয়ে বলল, 'সাহাব!' দরজা বন্ধ। তিনবার ডাকার পর হেগসাহেবের সাড়া পাওয়া গেল। চিৎকার করে ধমকালেন, কী চাই, তাঁকে বিরক্ত করার সাহস হল কী করে!

'সাহাব, মেয়েটা একে নিতে চাইল না। এখন একে নিয়ে কী করব?'

দরজা খুলে গেল। হেগসাহেবের মুখ লাল, চোখ ছোট।

আলির দু'হাতে ধরা তোয়ালের ওপর যে শিশু শুয়ে আছে তার ওপর নজর পড়ল। চমকে উঠলেন তিনি। এ তাঁর নিজের সন্তান, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'কত লোক ওকে দেখেছে?'

'সেই মেয়েটা আর বাংলোর লোকজন।'

'তা হলে বাকি থাকল কে!' চোখ বন্ধ করলেন হেগসাহেব, সুসানের সঙ্গে এও যদি মরে যেত! একবার মনে হল হুকুম দেবেন, কিল হিম। বাচ্চাটা সেইসময় নড়ে উঠে আদুরে ভঙ্গি করল।

হেগসাহেব বললেন, 'ওকে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।'

একটাই পথ আছে। হেগসাহেব কোনও রকমে সোজা পা ফেলে গাড়িতে উঠে বসলেন। আলি বসল পেছনে। গাড়ি ছুটল একটু এঁকেবেঁকে।

এখন বিকেল। তাঁর বাগানের পাশের অস্থায়ী চার্চে ফাদার এই সময় আসেন না। আসেন প্রত্যেক ভোরে। বাকি দিন দরজা বন্ধ থাকে। বিনাগুড়ির কাছে বড় চার্চে ওঁকে পাওয়া যাবে। রবিবার ছাড়া সেখানেও ভিড় হয় না।

গাড়ি থামিয়ে আলিকে পেছনে নিয়ে হেগসাহেব চার্চে ঢুকলেন।

ফাদার দাঁড়িয়ে ছিলেন যিশুর মূর্তির সামনে। তখন মোমবাতির আলোয় যিশুকে আরও মহানুভব বলে মনে হচ্ছিল।

হেগসাহেব ডাকলেন, 'ফাদার!'

ফাদার ঘুরে দাঁড়ালেন, 'গুড ইভনিং মিস্টার হেগ।'

'গুড ইভনিং।'

'এই সময় আপনাকে চার্চে দেখে খুব ভাল লাগছে। ও হ্যাঁ, আপনার বাগানের দুটি ছেলেমেয়ে আমার কাছে ওই চার্চে এসে বিয়ে করেছিল। শুনেছিলাম ওদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখনও কি সন্ধান পাননি?' ফাদার জিজ্ঞাসা করলেন।

'না ফাদার। দে আর মিসিং।'

'ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী ছিল? কী অপরাধ করেছিল?'

'আমার অ্যাসিস্টেন্ট ছিল ম্যাথিউস। সে ওই মেয়েটির আমার বাগানে চলে এসে বিয়ে করা মেনে নিতে পারেনি। ধরা পড়লে ম্যাথিউস খুব শাস্তি দেবে এই ভয়ে হয়তো ওরা ভুটানের দিকে চলে গেছে।' হেগসাহেব বললেন।

'খুব খারাপ ব্যাপার। ফিরে এলে কি ওরা শাস্তি পাবে?'

'না ফাদার। ওরা যদি বাগানের কাজে যোগ দেয় তা হলে কোনও শাস্তি হবে না। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।' হেগসাহেব বললেন।

'তিনদিন আগে আমার কাছে দু'জন লোক এসেছিল। ওরা পাহাড়ের গ্রামে গ্রামে জিনিস বিক্রি করতে যায়। এখান থেকে কয়েকদিনের হাঁটা পথের একটা পাহাড়ি গ্রামের মানুষদের সঙ্গে ওরা দু'জন ছেলেমেয়েকে দেখেছে যাদের সঙ্গে পাহাড়ের মানুষের কোনও মিল নেই। ওরা জঙ্গলে থাকে। পাহাড়ের লোকদের প্রশ্ন করে ওরা কোনও উত্তর পায়নি। আমার সন্দেহ ওরাই এখান থেকে গিয়েছে। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে ওদের। আপনি যদি চান তা হলে ওই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে লোক পাঠাতে পারেন। ওরা সভ্য জগতে ফিরে আসুক, তাই না?' ফাদার হাসলেন।

'তাই হবে ফাদার। আমি কথা দিচ্ছি।' হেগসাহেব বললেন।

'হ্যাঁ, এবার বলুন, কী প্রয়োজন?'

'আলি!' হেগসাহেব ডাকলেন।

'জি সাহাব।' আলি এগিয়ে এল।

'একটি সদ্যোজাত শিশু, যার মা জন্ম দিয়েই মারা গিয়েছে, তাকে যদি আপনি আশ্রয় দেন তা হলেই ওর জীবন রক্ষা হবে।' হেগসাহেব আলিকে ইশারা করতে আলি তোয়ালের আড়াল সরাল।

ফাদার ঝুঁকে দেখলেন, তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'যেশাস।'

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, 'এর কোনও আইনসম্মত বাবা নেই। তাই তো?'

'হ্যাঁ ফাদার। এর মা বাগানের একজন কামিন। ছোটনাগপুর থেকে এসেছিল।'

'মুল্যাটো, মুল্যাটো।' বিড়বিড় করলেন ফাদার।

'মুল্যাটো?'

'হ্যাঁ। দুটো ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মিলনে এর জন্ম। ফলে না বাবা না মা, কারও শ্রেণীতে পড়বে না। কিন্তু—চোখ বন্ধ করলেন ফাদার।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন হেগসাহেব। তারপর বললেন, 'ওর জন্যে যা খরচ হবে তা আপনি প্রতি মাসে পেয়ে যাবেন ফাদার।'

'অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমার এখানে ওইটুকু শিশুকে পালন করার কোনও ব্যবস্থা নেই।' ফাদার কথা শেষ করতেই শিশু কেঁদে উঠল।

ফাদার বললেন, 'আহা, বেচারা খুব কষ্ট পাচ্ছে বোধহয়। মুশকিল হল, ও যেহেতু মুল্যাটো তাই যে কেউ ওকে দেখলেই বুঝতে পারবে ওর কোনও পরিচয় নেই।'

'হ্যাঁ। একমাত্র চার্চ পারে ওকে পরিচিতি দিতে।'

ফাদার হাত বাড়িয়ে শিশুটিকে নিয়ে যিশুর মূর্তির সামনে গেলেন, চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে কিছু বললেন। তারপর হেগসাহেবের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আপনারা এবার ফিরে যেতে পারেন।'

'অনেক ধন্যবাদ ফাদার।'

হেগসাহেবের গাড়ি চলে গেলে ফাদার পেছনের একটি ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'সিস্টার।'

একটি নেপালি মহিলা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ফাদার বললেন, 'যিশু বলেছিলেন তোমাদের যদি বিপদ আসে তা হলে আমাকে স্মরণ কোরো, আমি তোমাদের রক্ষা করব। তুমি স্বামী

সন্তানহারা হয়ে এখানে এসে যিশুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলে। তাই তাঁর ইচ্ছায় এই শিশুটিকে গ্রহণ করো। একে সন্তান হিসেবে পালন করো। আজ থেকে এ চার্চের সন্তান।'

স্ত্রীলোকটি হাত বাড়িয়ে শিশুটিকে গ্রহণ করল। তারপর চেহারা দেখে খুশিতে ঝলমল করে উঠল তার মুখ।

চা-গাছগুলো এখন সাবালক হয়েছে। শেড-ট্রির ছায়ায় তাদের সবুজ লালচে বলে মনে হয়। ফ্যাক্টরি তৈরি শেষ। কিছু পাতা তুলে পরীক্ষানিরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। এখন বাগানে কর্মচারীদের সংখ্যাও বেড়ে গেল। তাদের জন্যে কোয়ার্টার্স হয়েছে। ঝরনার জল খাল কেটে ফ্যাক্টরির গায়ে নিয়ে এসে তার স্রোতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের আয়োজনও সমাপ্ত। এ ছাড়া ডায়নামো তো রয়েছেই। সেটা চালু থাকলে সাহেবের বাংলোয় অফিসে আলো জ্বলে। অফিসবাড়ির চেহারাও বদলে গিয়েছে।

এখন একটা নয়, দু'-দুটো কুলিলাইন তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় দলটিকেও নিয়ে আসা হয়েছে ছোটনাগপুর থেকে। তারা প্রথম দলের চেয়ে একটু কম কষ্ট করেছে। এবং তাদের দেখে কীভাবে বাঁচতে হবে শিখে নিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই মাটিতে শ্রমিকদের ঘরে বেশ কয়েকটি সন্তান জন্ম নিয়েছে। ফলে সংখ্যা বাড়ছে তাদের কিন্তু অবস্থা বদলায়নি। এখনও দু'বেলা গুনতি হয়, অন্যায় মনে হলেই চাবুক খেতে হয়। রবিবারে চার্চে যেতে হয়।

আজ পাতা তোলা হবে। মিস্টার হেগের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সাতসকালে। পোশাক পালটে জিপ নিয়ে ছুটলেন চা-বাগানে। দুটো পাতা একটা কুঁড়ি চার পাশে ছড়িয়ে। ঠিক সাতটায় কুলি-কামিনরা আসবে লাইন থেকে টুকরি নিয়ে। এতদিন কোম্পানি শুধু খরচ করে গেছে, আজ থেকে উৎপাদনের প্রথম পর্যায় শুরু হলে টাকা ফেরত তার পথ খুলবে। গাছগুলোর কাছে গিয়ে পরম মমতায় হাত বোলালেন মিস্টার হেগ। তিনি মেনে

নেওয়ায় তাঁর স্ত্রী ডিভোর্স পেয়ে গেছেন। যতদিন চাকরি করবেন ততদিন মাইনের এক তৃতীয়াংশ স্ত্রীকে ভরণপোষণ হিসেবে দিতে হবে। হোক। আজ তাঁর মন আনন্দে ভরে যাচ্ছে। ঘন জঙ্গল ছিল যেখানে সেখানে আজ নতুন ফসল। এসবের পেছনে তাঁর অবদান কতখানি তা কোম্পানি স্বীকার করেছে।

ঠিক সাড়ে ছ'টায় চার্চে এলেন মিস্টার হেগ। চায়ের পাতা তোলার আগে একটু প্রার্থনা করবেন, যিশুর আশীর্বাদ চাইবেন।

দরজা খোলা। ফাদার এসে গেছেন, রোজ ভোরে যেমন আসেন। হাঁটু মুড়ে নিলডাউন হয়ে প্রার্থনা করলেন মিস্টার হেগ। তারপর ফাদারকে আমন্ত্রণ জানালেন প্রথম পাতা তোলার সকালে উপস্থিত থাকতে।

ফাদার বললেন, 'এ তো ভাল কথা। আমরা সবাই মিলে যাব। হ্যাঁ, আপনাকে একটা অনুরোধ করেছিলাম। ওদের সন্ধান পেয়েছিলেন?'

'না ফাদার। আমি আলিকে পাঠিয়েছিলাম। সে মিথ্যে বলবে না। ওরা ওই পাহাড়ি গুহার পাশে জঙ্গলে ছিল। কিন্তু আলি গিয়েছে জানতে পেরে তারা আরও গভীর জঙ্গলে চলে যায়। সম্ভবত ভুটানে। তবে একটা খবর এনেছে আলি। মিস্টার হেগ বললেন।

'কী খবর?'

'ওদের একটা বাচ্চা হয়েছে।' মিস্টার হেগ হেসে বললেন।

ফাদার মাথা নাড়লেন।

কোন কোন পাতা তুলতে হবে, কীভাবে তুলতে হবে তা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন মিস্টার হেগ আর জন। সর্দাররা তা শিখে বুঝিয়ে দিল কুলি-কামিনদের। তারপর টুকরি নিয়ে ওরা কাজে লেগে গেল। চটপট হাত চলছে। টুকরিতে পড়ছে চায়ের সবুজ পাতা।

মিস্টার হেগ বললেন, 'জন, কেমন লাগছে?'

জন বলল, 'দারুণ স্যার।'

এইসময়ে ফাদারের গাড়ি দেখা গেল। দূরের রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে তিনি নামলেন। সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক এবং শিশু। ফাদার হাত নাড়তেই মিস্টার হেগও হাত নাড়লেন। শিশুটি দৌড়াচ্ছে। তার পরনে সাদা শার্ট সাদা প্যান্ট, জুতো।

জন বলল, 'ওঃ, নো!'

মিস্টার হেগ বললেন, 'কী বলছ?'

'এখানে ওই মুল্যাটোকে নিয়ে এসে ঠিক করেননি ফাদার।'

মিস্টার হেগ দেখলেন ফাদারের সঙ্গে আসতে আসতে বাচ্চাটা চা-বাগানের মধ্যে ঢুকে গেল। কাছে এসে ফাদার বললেন, 'অভিনন্দন।'

'ধন্যবাদ।' মিস্টার হেগ বললেন।

জনের চোখ ছেলেটাকে খুঁজছিল। তিন বছরের সাদা চামড়ার ছেলেটা কুলিদের কাছে গিয়ে বায়না ধরেছে সে পাতা তুলবে। একটা কুলি তাকে ওপরে তুলে ধরতে সে মুঠো মুঠো পাতা তুলতে লাগল।

জন ছুটে গেল, 'অ্যাই! স্টপ। পাতা নষ্ট কোরো না।'

ছেলেটা অবাক হয়ে বলল, 'হু আর ইউ?'

জন ঘুরে দাঁড়াল। 'স্যার, ও আমাকে জিজ্ঞাসা করছে আমি কে?'

ছেলেটা নেমে পড়ল মাটিতে। তারপর দৌড়ে ফাদারের কাছে এসে জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

মিস্টার হেগের ছেলেবেলার ছবিটা যেন এখন জীবন্ত হয়ে সামনে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে?'

ছেলেটি বলল, 'ফাদার বলেছেন আমার বাবা ভগবান। যেশাস আমার দাদা ছিলেন। আমার নাম পল। পল ওঁরাও।'

জন চমকে উঠল, 'মাই গড! ইজ ইট ট্রু, ফাদার?'

'হ্যাঁ। ওয়েল জেন্টলমেন, তোমাদের কাউকে জানানো হয়নি,

আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি।'

মিস্টার হেগ ফাদারের দিকে তাকালেন, 'সে কী? কেন?'

'আর একজন তরুণ ফাদার এসে দায়িত্ব নেবেন। আজই তিনি আসছেন। আপনাদের সঙ্গে অনেকদিন চমৎকার কাটালাম। ঈশ্বর আপনাদের ভালভাবে রাখবেন। আচ্ছা—।' ফাদার পলের হাত ধরে গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

জন বলল, 'মাস্টার পল কি তা হলে চার্চেই থাকবে?'

'না। ওকে আমি ইংল্যান্ডে নিয়ে যাচ্ছি।' ফাদার পলের চুলে আঙুল বোলালেন।

'ইংল্যান্ডে? কী বলছেন ফাদার?' জন চেঁচিয়ে উঠল।

'মনে হচ্ছে তুমি খুব অবাক হয়েছ?'

'কিন্তু, কিন্তু ও তো একজন মুল্যাটো!'

'হয়তো। সেই দিন খুব বেশি দূরে নেই যেদিন পৃথিবীর গরিব কালো পীত মানুষের দেশে জন্ম নেওয়া মুল্যাটোদের ভিড়ে ইংল্যান্ড ভরে যাবে। প্রত্যেকে হাজির হবে শরীরে ব্রিটিশ রক্ত নিয়ে। তখন তুমি কাকে দেখে অবাক হবে? আচ্ছা, গুড বাই।' ফাদার পলকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন।

এবার জনের সংবিৎ ফিরল। কুলি-কামিনরা কাজ থামিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। সে চিৎকার করল। সর্দারদের হুকুম দিল কাজ না করলে চাবুক চালাতে। ব্যস্ততা আরম্ভ হয়ে গেল চা-গাছগুলোকে ঘিরে।

মিস্টার হেগ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন পলের দিকে। মনে হচ্ছিল তাঁর ছেলেবেলা ফাদারের হাত ধরে ইংল্যান্ডে ফিরে যাচ্ছে। যাক। ও যতদূরে যাবে তত তিনি স্বস্তিতে থাকবেন।

আঠারোশো পঁচানব্বই সাল। ডুয়ার্সের চা বাগান পত্তনের মাত্র কুড়ি বছর পর একটি সরকারি রিপোর্ট পাঠানো হল। রিপোর্টে লেখা হয়েছে, 'ডুয়ার্সের চা-মজুররা ক্রমেই তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। খেয়াল খুশিমতো কাজ করছে।

ম্যানেজার, সর্দারদের মানতে চাইছে না। একদল অন্যদলকে কাজ না করার প্ররোচনা দিচ্ছে। কোনও সংগঠিত ইউনিয়ন যদিও হয়নি কিন্তু তারা নিজেদের জানোয়ার বা ক্রীতদাস বলে ভাবতে চাইছে না। তারা মজুর। মেহনত বিক্রি করে খেতে চায়। এই প্রতিবাদী মানসিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মূলত মেয়েশ্রমিকরাই। সম্প্রতি এক চা-বাগানের সাদা ম্যানেজারকে কালো মেয়ের শ্লীলতাহানি করার অপরাধে মেয়েশ্রমিকরা দলবদ্ধ ভাবে শুধু প্রতিবাদ করে না, তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। কোদালের বাঁট দিয়ে মাথা থেঁতলে দিয়ে, গায়ে থুতু ছিটিয়েও তাদের ঘৃণা দূর হয়নি। মৃত সাহেবের সমস্ত শরীরে প্রস্রাব করেছে তারা।'

ব্রিটিশ সরকার কড়া হাতে বিদ্রোহীদের দমন করেছিল। যে মানুষগুলো ক্লীবের মতো তাঁদের আদেশ পালন করত তাদের কয়েকজন হঠাৎ এত সাহসী কী করে হল তা নিয়ে বিশ্লেষণ হল। আরও কঠোর হল তাদের মুঠো। আর যত সেটা কঠোর হচ্ছিল তত অত্যাচারিত মানুষেরা মাটি আঁকড়ে ধরছিল, 'বন্ধুগণ, এই হল আমাদের জায়গা, এখানে মানুষের মতো থাকব সবাই।'

গভীর জঙ্গলে তখনও যদি বুধনি বেঁচে থাকত তা হলে নিশ্চয়ই সে খুশি হত খবরটা পেলে। তারপর একশো বছর ধরে চলেছে সংগ্রাম। কখনও মৃদু, কখনও সোচ্চারে! ছোটনাগপুর নয়, ওই চায়ের পাতার শিরায় শিরায় ঠিকানার সন্ধান পেয়ে গেছে ওরা। ছিন্ন শেকড়ে পেয়েছে মৃত্তিকার রস।

একশো বছরের কিছু আগে ডুয়ার্সের চা-বাগান
পত্তনের পর এখানে কুলির কাজে
আদিবাসীদের নিয়ে আসা হয়েছিল ছোটনাগপুর
অঞ্চলের এক গ্রাম থেকে। সহজ সরল
দারিদ্র্যপীড়িত সেই মানুষগুলির অবর্ণনীয়
জীবনসংগ্রামের এই প্রথম মর্মন্তুদ বর্ণনালেখ্য
'উৎসারিত আলো'। চা-বাগানের পটভূমিকায়
এক অসামান্য উপন্যাস।